এখন যাঁদের দেখছি

এখন যাঁদের দেখছি

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

প্রথম
সংস্করণ
৭ই শ্রাবণ, ১৩৬২

চার টাকা
আট আনা

প্রচ্ছদশিল্পী
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি-এ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্কস্ লিমিটেড
৪৭, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩

উৎসর্গ

বাংলার বুধমণ্ডলের অন্যতম রত্ন

ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সুহৃদ্বরেষু

কথনীয়

১৩৫৮ সালে দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় আমার এই চরিত্রগুলি ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হ'তে থাকে। চার বৎসর আগেকার কথা। কিন্তু ইতিমধ্যেই আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীর নাট্যশালা থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, মোহিতলাল মজুমদার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁদের জীবিতকালে ঐ গুণীদের যে ভাবে দেখেছি, সেইটুকুই প্রকাশ করতে চেয়েছি এই রচনাবলীর ভিতর দিয়ে। তাঁদের পরলোকগমনের পর এর মধ্যে আর কোন রদবদল করা হ'ল না। ইতি—

গ্রন্থকার

১৩৬২ সাল

ভূমিকা

গ্রন্থাকারে "যাঁদের দেখেছি" শীর্ষক আমার যে স্মৃতিমূলক নিবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছে, পাঠকসমাজে তা সাদরে গৃহীত হওয়াতে আনন্দলাভ করেছি। লিখিয়েদের লিখে সুখ পড়ুয়ারা খুসি হ'লেই। অন্ততঃ আমার এই ধারণা। অপরের অন্য ধারণা থাকতে পারে। কারণ বাংলাদেশে আজকাল এমন একাধিক লেখক দেখা দিয়েছেন, যাঁদের রচনা পাঠ করলে সন্দেহ হয়, স্টিফেন ম্যালার্মি ও পল ভ্যালারি প্রমুখ ফরাসী লেখকদের মত তাঁরাও নিজেদের মনগড়া আভিজাত্য রক্ষার জন্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে রাজি নন্। কিন্তু আমি অভিজাত সাহিত্যিক হ'তে পারব না কস্মিনকালেও। লোকপ্রিয়তার উপরে যে আমার লোভ আছে, বড় গলায় তা বলতে পারি অসঙ্কোচে। মনের ভাব ফোটাতে চাই সরল প্রাণের সহজ ভাষায়, লোকের হয়তো তাই ভালো লাগে। সাহিত্যধর্মে আমি অবলম্বন করতে চাই সহজিয়া পদ্ধতি।

"যাঁদের দেখেছি"র মধ্যে ছিল আমার জীবনস্মৃতির সঙ্গে জড়িত এমন সব স্বর্গীয় সাহিত্যিক ও শিল্পীদের কাহিনী, যাঁরা সুদীর্ঘ চার যুগ ধ'রে বাংলাদেশে বিতরণ ক'রে গিয়েছেন আপন আপন প্রতিভা ও মনীষার দান। তাকে অর্ধ শতাব্দীর কলমের-ছবির অ্যালবাম বলা যায়। কিন্তু সে অ্যালবামে তাঁদের ছবি নেই, আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আজও যাঁরা মরজগতে বিদ্যমান। তাঁদেরও মধ্যে আছেন অতুলনীয় প্রতিভার বা প্রভূত শক্তির অধিকারী। তাঁদের নাম সবাই জানেন, গুণেরও পরিচয় সবাই পেয়েছেন, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্কের অভাবে আসল মানুষগুলিকে দূর থেকে কেহই দেখতে পান না। অথচ তা দেখবার আগ্রহ আছে সকলেরই।

কিছুদিন আগে একখানি মাসিক কাগজে আমি লিখেছিলুম—একজন বিখ্যাত বিলাতী লেখক বলেছেন:

"Yes, each successive generation regrets the past: It is a strange human penchant to suppose that the past is better. Perhaps it was."

এক এক বয়সে প্রত্যেক মানুষেরই মনের ধর্ম হয় ভিন্ন ভিন্ন রকম। নবীনের স্বধর্ম হচ্ছে ভবিষ্যতের উপরে নির্ভর করা, কারণ সংক্ষিপ্ত তার অতীতের ইতিহাস। কিন্তু প্রাচীনরা নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করতে চায় অতীতকেই, কারণ ম্লান তাদের ভবিষ্যতের আশার আলো।

অতি-প্রাচীন না হ'লেও আমি যে প্রাচীন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। আমাকেও অভিভূত করেছে প্রাচীনতার ধর্ম। হাতে কাজকর্ম না থাকলে ভবিষ্যৎ-চিন্তা করি না, মন ফিরে যায় অতীতের দিকে। স্মৃতির তপোবনে ব'সে ব'সে শুনি জীবনের ঝরাপাতার চির-সবুজ গান। পরে পরে কত মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সে এক বৃহতী জনতা।

সেই জনতায় যাঁদের দেখা পাই তাঁদের সঙ্গে অতি-আধুনিক সাহিত্যিক ও শিল্পীদের অনেক কিছুই মেলে না। তাঁরা যেমন ক'রে ভাবের আদান-প্রদান করতেন, আলাপ-পরিচয় করতেন, সামাজিকতার মর্যাদা রক্ষা করতেন, আজকাল তা আর হয় না। উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য-বৈঠক, যেখানে সর্বশ্রেণীর সাহিত্যিক ও শিল্পী আসন গ্রহণ ক'রে অসঙ্কোচে মতামত ব্যক্ত করবেন, তাও আজ পরিণত হয়েছে অতীত স্মৃতিতে। এখনো এখানে ওখানে কোন কোন ছোট ছোট ঘরোয়া বৈঠকের কথা শুনি—দু'-একটা বৈঠকে গিয়েছিও—কিন্তু তাদের ক্ষেত্র এমন সীমাবদ্ধ যে, আগেকার তুলনায় উল্লেখযোগ্যই নয়। রবীন্দ্রনাথের "বিচিত্রা সভা"র কথা না তোলাই ভালো, কারণ তেমন বৈঠক বাংলাদেশে আর কেউ কখনো দেখেনি এবং ভবিষ্যতেও আর কেউ দেখবে কিনা সন্দেহ। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতির ভবনে গিয়েও যে অপূর্ব বৈঠকী আনন্দ উপভোগ ক'রে আসতুম, তেমন সুযোগ আজ কোথায়?

গত যুগে যমুনা, মর্মবাণী, মানসী, সংকল্প ও ভারতী প্রভৃতি পত্রিকাগুলির কার্যালয়ে পরম উপভোগ্য সাহিত্য-বৈঠকের আয়োজন হ'ত। "যমুনা" কাগজখানি ছিল ছোট, কিন্তু তার বৈঠক ছিল মস্ত বড়। কত দলের সাহিত্যিক সেখানে আসতেন, কত রকম মতবাদ প্রচার করতেন!

এই সব বৈঠকের দ্বারা কেবল সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হ'ত না, সেগুলির সাহায্যে নূতন নূতন সাহিত্যিকও তৈরি হয়ে উঠত। সেখানে প্রবীণরা করতেন নবীনদের পথনির্দেশ —এখন দেখা যায় উল্টো দিকটাই। আজকাল ভূয়োদর্শনের কোন মূল্য নেই, প্রবীণদের পথনির্দেশ করতে উদ্যত হয় নিতান্ত বাল-খিল্যরাও। কিম্বা তারা চায় প্রবীণদের একেবারে নস্যাৎ ক'রে দিতে। ক্ষুদে ক্ষুদে কুবিখ্যাত সব ওঁচা পত্রিকা, সম্পাদক ও লেখকদের হয়তো গোঁফ-দাড়ি কামাবার বয়স হয়নি, কিন্তু তারাও বাপের বয়সী স্বনামধন্য ব্যক্তিদের লক্ষ্য ক'রে যে সব ন্যক্কারজনক ভাষা ব্যবহার করতে সুরু করেছে, তাতে মনে হয়, গুড়গুড়ে ভট্টাচার্যের যুগ আবার ফিরে আসছে। যাদের কাছে মানীর মান বা বয়সের খাতির থাকে না, তারা কোন বৈঠকেই বসবার অধিকারী নয়। আমাদের যৌবনকালে নবীন সাহিত্যিকরা পরম শ্রদ্ধা করতেন প্রাচীন সাহিত্যিকদের। এখানে শ্রদ্ধার অর্থ অবশ্য এ নয় যে, প্রাচীনরা জল উঁচু বললে নবীনদেরও তা বলতে হবে। ধরুন জলধর সেনের কথা। তিনি ছিলেন আমাদের অনেকেরই পিতার বয়সী। তাঁর মতামত ও রচনার সঙ্গে আমাদের মনের সুর মিলত না, কিন্তু তবু কোন দিনই তাঁকে আক্রমণ করবার সুযোগ খুঁজিনি, নতমস্তকে বার বার তাঁর কাছে গিয়েছি, তাঁর সঙ্গে গল্প ক'রে এসেছি।

এখনকার অনেক কাঁচা সাহিত্যিকদের মতামত শুনলে মনে হয়, যেন তাঁদের বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্যের জন্ম হয়েছে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে। পূর্ববর্তীরা কিছুই নন্, বড় জোর তাঁরা হাইফেনের সামিল। এঁদের লক্ষ্য ক'রেই সিস্‌লে হাড্‌ল্‌স্টোন লিখেছিলেনঃ

"The younger generation has been taught to despise the efforts of those who have gone before. In its own trivial way it sometimes discovers some small principle that the older men well knew, but which they put in its proper place in their system."

এই শ্রেণীর নতুন সাহিত্যিকদের নিয়ে কোন বৈঠক গঠন সম্ভবপর নয়। তাই হয়তো একালে সাহিত্য-বৈঠকের অভাব হয়েছে। এখনকার মাসিক পত্রিকাগুলির কার্যালয়ে গেলে যে বিভিন্ন সাহিত্যিকের দর্শনলাভ হয় না, এমন কথা বলি না। অনেককেই

তো দেখতে পাই, কিন্তু তাঁরা কাজের কথা বলেন, বড় জোর দুটো গালগল্প করেন, তারপর উঠে চ'লে যান। কোন বিষয় নিয়ে উচ্চতর আলোচনা করবার ইচ্ছা বা সুযোগ সেখানে নেই।

কলকাতার সর্বশেষের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-বৈঠক বসত "কল্লোল" কার্যালয়ে, যেখানে গিয়ে মন ও হাত পাকিয়েছেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি। "ভারতী" ও "কল্লোল" প্রভৃতি পত্রিকা এক এক দল শক্তিশালী ও নিজস্ব নূতন লেখক গঠন করেছিল। কিন্তু তারপর আর কোন পত্রিকার এমন সৌভাগ্য হয়েছে ব'লে মনে হয় না।

আমার বিশ্বাস, এরও অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে উপযোগী সাহিত্য-বৈঠকের অভাব। এক এক কাগজের সম্পাদক বা প্রধান লেখক যদি বেছে বেছে কয়েকজন আশাপ্রদ নূতন সাহিত্য-যশাকাঙ্ক্ষী নির্বাচন ক'রে একটি গোষ্ঠী গঠন করেন এবং নিয়মিতভাবে তাঁদের বৈঠকে আহ্বান ক'রে খানিকটা ক'রে সময় সাহিত্য ও আর্ট নিয়ে আলোচনায় নিযুক্ত থাকতে পারেন, তাহ'লে নিশ্চয়ই সত্যিকার সাহিত্যিক তৈরি ক'রে তোলা যায়। অবশ্য এ-রকম প্রচেষ্টার সাফল্য নির্ভর করে প্রধান বৈঠকধারীর ব্যক্তিত্ব, ধৈর্য ও অভিজ্ঞতার উপরেই।

এই লেখক তৈরির চেষ্টা ও গুরুগিরির প্রথা বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগ থেকেই দেখা যায়। ইংরেজ আমলে নতুন বাংলার প্রধান ও প্রথম কবিগুরু ছিলেন "সংবাদ প্রভাকর" সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত। তাঁর পত্রিকার কার্যালয় রীতিমত সাহিত্যের পাঠশালায় পরিণত হয়েছিল। সে যুগের নূতন লেখকরা তাঁর দিকে আকৃষ্ট না হয়ে পারতেন না,—এমনি ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব। নূতন লেখকদের উপদেশ দেবার জন্যে তিনি তাঁদের বাড়ীতেও গিয়ে হাজির হ'তেন। বঙ্কিম-সহোদর স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শুনেছি, ঈশ্বর গুপ্ত প্রায়ই কাঁটালপাড়ায় গিয়ে তরুণ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের মুখেই বলেছেনঃ "আর ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীর্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবীশদের একটা কীর্তি আছে। দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবীশ ছিলেন। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একজন। বাবু

দীনবন্ধু মিত্র আর একজন। শুনিয়াছি, বাবু মনোমোহন বসু আর একজন। ইহার জন্যও বাঙ্গালার সাহিত্য প্রভাকরের নিকট ঋণী। আমি নিজে প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন। * * * যাহার কিছু রচনাশক্তি আছে, এমন সকল যুবককে তিনি বিশেষ উৎসাহ দিতেন। * * * কবিতা রচনার জন্য দীনবন্ধুকে, দ্বারকানাথ অধিকারীকে এবং আমাকে একবার প্রাইজ দেওয়াইয়াছিলেন। দ্বারকানাথ অধিকারী কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র—তিনিই প্রথম প্রাইজ পান।”

ঈশ্বর গুপ্তের গুরুগিরি যে ব্যর্থ হয়নি, সাহিত্যাচার্য বঙ্কিমচন্দ্র, নাট্যকার দীনবন্ধু, কবি রঙ্গলাল ও নাট্যকার মনোমোহনের বিভিন্ন বিভাগে বিখ্যাত কীর্তিগুলিই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। দ্বারকানাথ অধিকারী সাহিত্যজগতে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেন নি, সম্ভবতঃ অকালেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন।

হ্যাঁ, বৈঠক চাই, গুরু বা উপদেষ্টা চাই। বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু প্রমুখ প্রতিভাবানদেরও গুরুর দরকার হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথও কবিবর বিহারীলালকে গুরুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তার উপরে নিজের পরিবারের মধ্যেও তিনি উপদেষ্টারূপে পেয়েছিলেন সাহিত্যিক অগ্রজদের এবং হাত মক্স করবার জন্যে পেয়েছিলেন নিজেদেরই “বালক” ও “ভারতী” পত্রিকা। স্বাধীন বাংলাদেশে এখন যে উচ্চশ্রেণীর লেখকের একান্ত অভাব হয়েছে, তার প্রধান কারণ, যে সব কচি ও কাঁচা সাদা কাগজকে লেখনীর দ্বারা কালিমালিপ্ত করছেন, তাঁরা গুরু ব'লে কারুকে মানতে নারাজ।

অতঃপর আমি একে একে যাঁদের আলেখ্য উপহার দেব, তাঁদের অধিকাংশই জীবন আরম্ভ করেছেন গত শতাব্দীর উত্তরার্ধে। তারপর “কল্লোলে”র যুগ পর্যন্ত এসে আমার ছবির খাতা মুড়ে তুলে রাখব। কেবল সাহিত্যিক নন, অন্যান্য শ্রেণীর গুণীদেরও মূর্তি আপনারা এই অ্যালবামের মধ্যে দেখতে পাবেন।

এক

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী

কলম নিয়ে বসেছিলুম বর্তমানের ছবি আঁকতে। কিন্তু কাগজে কালির আঁচড় পড়বার আগেই দেখি, মনের পটে স্মৃতিদেবী নতুন ক'রে আঁকতে সুরু ক'রে দিয়েছেন একখানি পুরাতন ছবি। তবে পুরাতন হ'লেও সে ছবি চিরনূতন।

ব্যক্তিত্বের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, মনুষ্যবিশেষের স্বাতন্ত্র্য। এক একখানি বাড়ীর ভিতরেও থাকে এমনি বিশেষ বিশেষ স্বাতন্ত্র্য। সহরে দেখতে পাওয়া যায় হাজার হাজার বাড়ী এবং তাদের প্রত্যেকেরই ভিতরে থাকে কিছু না কিছু পার্থক্য। এই পার্থক্য এতই সাধারণ যে, তার মধ্যে বিশেষ কোন স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করা যায় না।

কিন্তু এক একখানি বাড়ী অসাধারণ হয়ে ওঠে এক একজন মহামনা মহামানুষকে অঙ্কে ধারণ ক'রে। সেই মনস্বীদের ব্যক্তিত্বের স্মৃতি বহন ক'রে ইট-কাঠ-পাথর দিয়ে গড়া বাড়ীগুলিও হয় স্বাতন্ত্র্যে অনন্যসাধারণ। হয় যদি তা পর্ণকুটীর, সবাই রাজপ্রাসাদ ফেলে তাকে দেখতে ছোটে বিপুল আগ্রহে। এই জন্যেই দক্ষিণেশ্বর কালিবাড়ী, বেলুড় মঠ এবং মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির বাসভবন আকৃষ্ট করে বৃহতী জনতাকে।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী!

উত্তরে দক্ষিণে পশ্চিমে তিনটি সংকীর্ণ, নোংরা গলি এবং পূর্বদিকে একটি গণ্ডগোল-ভরা বাজার। এরই মাঝখানে অভিজাত পল্লী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী নিজের জন্যে রচনা ক'রে নিয়েছে অপূর্ব এক স্বাতন্ত্র্য, বিচিত্র এক প্রতিবেশ। আজ তার নূতন গৌরব করবার কিছুই নেই, কিন্তু তার প্রভূত পূর্বগৌরব তাকে এমন গরীয়ান, এমন অতুলনীয় ক'রে রেখেছে যে,

এখনো তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে মন হয়ে ওঠে শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ। সে হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতির প্রতীক, সে হচ্ছে সমগ্র দেশের শিল্পী ও সাহিত্যিকগণের প্রধান তীর্থ।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের ধর্মে, আমাদের সমাজে, আমাদের জাতীয় জীবনে যাঁরা নূতন রূপ ও নূতন আদর্শ এনেছেন, ঐখানেই তাঁরা প্রথম পৃথিবীর আলোক দেখেছেন, ঐখানেই তাঁরা লালিত-পালিত হয়েছেন এবং ঐখানেই তাঁরা দুনিয়ার পাট তুলে দিয়ে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ঐ বাড়ীর ঘরে ঘরে দিকে দিকে ছড়ানো আছে অসাধারণ মানুষদের পদরেণু।

এইজন্যে বিদেশীরাও কলকাতায় এলে ঠাকুরবাড়ীতে আসবার প্রলোভন সংবরণ করতে পারতেন না। কেবল সাহিত্যক্ষেত্রে নয়, চিত্রকলার ক্ষেত্রেও আত্মপ্রকাশ করেছেন ঠাকুরবাড়ীর যতগুলি সন্তান, বাংলাদেশে আর কোন পরিবারে তা দেখা যায় না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও সুনয়নী দেবী এবং এখনকার উদীয়মানদের মধ্যে সুভো ঠাকুর। যাঁরা ভিতরকার খবর রাখেন তাঁরাই জানেন, ঠাকুর পরিবারভুক্ত প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিরই মধ্যে আছে সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি সুগভীর অনুরাগ। তাঁরা ইচ্ছা করলেই লেখক বা শিল্পী হ'তে পারতেন, কিন্তু যে কারণেই হোক তাঁদের সে ইচ্ছা হয়নি।

নতুন বাংলার সঙ্গীতও জন্মলাভ করেছে ঠাকুরবাড়ীর মধ্যেই। বাঙালী হচ্ছে কাব্যপ্রিয় ভাবুক জাতি। গানে সুরের ঐশ্বর্যের সঙ্গে সে লাভ করতে চায় কথার সৌন্দর্যও। কথাকে নামমাত্র সার ক'রে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকরা যখন সুর ও তালের 'ব্যাকরণ' নিয়ে তাল-ঠোকাঠুকি করছে, বাংলাদেশের লোকসাধারণ তখন একান্ত প্রাণে উপভোগ করছে রামপ্রসাদের গীতাবলী, বাউল-সঙ্গীত ও কীর্তনে বৈষ্ণব-পদাবলী প্রভৃতি। যে সব গান সুরের সাহায্যে কথার ভাবকেই মর্যাদা দিতে চায়, আমাদের কাছে তাদেরই আদর বেশী। বাংলাদেশের মেঠো বা ভাটিয়ালী গানও কাব্যরসে বঞ্চিত নয়। নব্য বাংলার শিক্ষিতদের চিত্ত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভিন্নভাবাপন্ন হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁদের মনের ভিতরেও স্বাভাবিক

নিয়মেই থাকে খাঁটি বাঙালীর সহজাত সংস্কার। তাঁদের বৈঠক-খানায় বা ড্রয়িংরুমে বাংলার সেকেলে গানগুলি প্রবেশ করবার পথ খুঁজে পেত না, কিন্তু ওস্তাদী তানা-না-নাও সহ্য করতে তাঁরা ছিলেন নিতান্ত নারাজ। এই দোটানার মধ্যে দুই কূল রাখবার ব্যবস্থা করলেন ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গীতাচার্য। আধুনিক যুগের উপযোগী উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর কাব্যকথাকে ফুটিয়ে তোলা হ'তে লাগল এমন সব সুরের সংমিশ্রণে, যার মধ্যে আছে একাধারে মার্গ-সঙ্গীত, বাউল-সঙ্গীত, কীর্তন-সঙ্গীত ও লোক-সঙ্গীতের বিশেষত্ব। এই নতুন পদ্ধতিতে গায়ক কোথাও কথার গতিরোধ ক'রে অযথা দীর্ঘ তান ছাড়বার সুযোগ পান না এবং কবিও কোথাও সুরকে অবহেলা না ক'রে তার সাহায্যেই কথার ভাবকে উচিতমত প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন। আজ সর্বত্র প্রচারিত হয়ে গিয়েছে এই নূতন পদ্ধতির বাংলা গান এবং এ গান উপভোগ করতে পারেন উচ্চশিক্ষিতদের সঙ্গে অল্পশিক্ষিত শ্রোতারাও।

সাহিত্যকলা, চিত্রকলা ও সঙ্গীতকলার পরে আসে নাট্যকলার কথা। এ ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের অগ্রনায়কদের সঙ্গে দেখি ঠাকুর-বাড়ীর গুণিগণকে। যে কয়েকটি সৌখীন বাংলা রঙ্গালয়ের আদর্শে এদেশে সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীর রঙ্গালয় হচ্ছে তাদের মধ্যে অন্যতম। গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ছিলেন তার প্রধান কর্মী। তারপরেও ঠাকুরবাড়ীর সন্তানদের মধ্যে নাট্যকলার ধারা ছিল সমান অব্যাহত। অভিনেতারূপে দেখা দেন রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথ প্রভৃতি আরো অনেকেই। মধ্য যৌবন থেকেই দেখছি, ঠাকুরবাড়ী থেকে প্রায় প্রতি বৎসরেই এক বা একাধিক নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে আসছে। আজ রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও [illegible] পরলোকে। কিন্তু আজও রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ীর ধারা অক্ষুন্ন রেখেছেন; প্রায়ই এখানে ওখানে নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। নাট্য-জগতেও ঠাকুর পরিবারের তুলনা নেই।

আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা। আমার বোধ হয়, কলকাতা

সহরে সর্বপ্রথমে মহিলা নিয়ে অভিনয়ের প্রথা প্রবর্তিত হয় ঠাকুর-বাড়ীর রঙ্গমঞ্চেই। অভিনেয় নাটিকা ছিল "বাল্মীকি প্রতিভা"।

নৃত্য যে একটি নির্দোষ আর্ট এবং শিক্ষিত ও ভদ্র পুরুষ আর মহিলারা যে অম্লানবদনে নাচের আসরে যোগ দিতে পারেন, বাংলা-দেশে এ বাণী অসঙ্কোচে প্রথম প্রচার করেন ঠাকুরবাড়ীর রবীন্দ্র-নাথই। তিনি কেবল প্রচার ক'রেই ক্ষান্ত হননি, নিজে হাতে ধ'রে ছেলেমেয়েদের নামিয়েছিলেন নাচের আসরে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা নৃত্যকলা জাতে উঠল তাঁর হাতের পবিত্র স্পর্শে।

অলিগলির দ্বারা পরিবেষ্টিত বটে জোড়াসাঁকোর এই ঠাকুর-বাড়ী, কিন্তু তার ফটক পার হ'লেই সংকীর্ণতার কোন চিহ্নই আর নজরে পড়ে না। সামনেই প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, তারপর ত্রিতল অট্টালিকার ভিতরেও আর একটি বড় অঙ্গন। বামদিকে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রা-ভবন, তারও পশ্চিম দিকে আবার খানিকটা খোলা জমি। ডান দিকে গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথদের মস্ত বাড়ী, তার দক্ষিণে একটি নাতিবৃহৎ উদ্যানে ফুলগাছের চারা ও বড় বড় গাছের ভিড়। ধূলিমলিন অলিগলির ইট-কাঠের শুষ্কতার মাঝখানে একখানি জীবন্ত নিসর্গচিত্র—তৃণহরিৎ ক্ষেত্র, ফুলগাছের কেয়ারি, শ্যামলতার মর্মরসঙ্গীত। দখিনা বাতাস বয়, কুঁড়ি-ফোটার খবর আসে, জেগে ওঠে গানের পাখীরা।

ঠাকুরবাড়ী আজও জোড়াসাঁকোয় দাঁড়িয়ে অতীতের স্বপ্ন দেখছে, কিন্তু সে বাগান আর নেই। মরু-মুল্লুকের মারোয়াড়ী এসে তার বেদরদী হাত দিয়ে লুপ্ত করেছে সেই ধ্বনিময়, গন্ধময়, বর্ণময় স্বপ্ননীড়খানি। আর নেই সেই ফুল-ঝরা ঘাসের বিছানা, সবুজের মর্মর-ভাষা, গীতকারী বিহঙ্গদের আত্মনিবেদন।

মাইকেলের রাবণ বলেছিল, "কুসুমিত নাট্যশালাসম ছিল মম পুরী।" আগে ঠাকুরবাড়ীও ছিল তাই। কখনো পুরাতন বাড়ীর ভিতরে, কখনো রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রাভবনে, কখনো অবনীন্দ্রনাথদের মহলে বসত অভিনয়ের বা গানের বা নাচের বা কাব্যপাঠের আসর। বাংলার শিক্ষিত সমাজে নৃত্যকলা যখন অভিনন্দিত হয়নি, ঠাকুর-

বাড়ীতে এসে তখনও নাচ দেখিয়ে গিয়েছেন জাপানের সেরা নর্তকী তেঙ্কোয়া এবং স্বগীয় শিল্পী যতীন্দ্রনাথ বসু। "ফাল্গুনী" নাট্যাভিনয়েও আমাদের সামনে এসে নৃত্যচঞ্চল মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, অন্ধ বাউলের ভূমিকায়।

কলকাতায় গানের মালা গেঁথে রবীন্দ্রনাথ ঋতু-উৎসবও সুরু করেন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতেই। বিচিত্রা-ভবনের পশ্চিমদিকে খোলা জমির উপরে বৃহৎ পটমণ্ডপ বেঁধে আসরে বহু শ্রোতার জন্যে স্থান সংকুলান করা হয়েছিল। বহু গায়ক, গায়িকা ও যন্ত্রী সেই উৎসবে যোগদান করেছিলেন। সেটা বর্ষা কি বসন্ত ঋতুর পালা, তা আর স্মরণ হচ্ছে না, তবে জলসা যে রীতিমত জ'মে উঠেছিল, একথা বেশ মনে আছে। ঋতুর জন্যে এমন দল বেঁধে ঘটা ক'রে পার্বণের আয়োজন, এদেশে এটা ছিল তখন অভিনব ব্যাপার। কেবল দোলযাত্রায় এখানে রং ছুঁড়ে হৈ হৈ ক'রে হোলীর গান গেয়ে মাতামাতি হুড়োহুড়ি করা হয় বটে। কিন্তু সে হচ্ছে নিতান্ত প্রাকৃতজনদের উৎসব, ললিতকলাপ্রিয় শিক্ষিতদের প্রাণ তাতে সাড়া দেয় না।

নাচ-গান-অভিনয় বা কাব্যপাঠের আসর না বসলেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের অভাব হ'ত না। তখন বসত গল্প ও সংলাপের বৈঠক এবং সেখানে এসে সমবেত হতেন বাংলাদেশের বিদ্বজ্জনসমাজের বাছা-বাছা বিখ্যাত ব্যক্তিগণ, তাঁদের নামের সুদীর্ঘ ফর্দ এখানে দাখিল করা অসম্ভব। এমনি সব বৈঠকের আয়োজন করা ঠাকুরবাড়ীর চিরদিনের বিশেষত্ব। আমরা যখন ভূমিষ্ঠ হইনি, তখনও ঠাকুরবাড়ীর বৈঠকের শোভাবর্ধন ক'রে যেতেন দেশের যত পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিগণ। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে সুরু ক'রে প্রায় প্রত্যেক জ্ঞানী ও গুণী বাঙালী এখানে এসে ওঠা-বসা ক'রে গিয়েছেন। ঠাকুরদের এই প্রাচীন বাসভবনকে যে Historic বা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বাড়ী ব'লে গণ্য করা যায় সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। সারা কলকাতা সহরে এর চেয়ে গরিমাময় বাড়ী নেই আর একখানিও।

তখনকার সেই আনন্দ-সম্মিলনের দিনে প্রায়ই আমরা অবনীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে উপস্থিত হতুম। কখনো তাঁকে পেতুম দোতালার

সুপ্রশস্ত বৈঠকখানায়, কখনো বা পেতুম দক্ষিণের সুদীর্ঘ বারান্দা বা দরদালানে। সেখানকার ছবি মনের ভিতরে খুব স্পষ্ট। প্রায়ই গিয়ে দেখতুম, বাগানের দিকে মুখ ক'রে গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ তিন সহোদর ব'সে আছেন তিনখানি আরাম-আসনে। গগনেন্দ্রনাথ হয়তো কোন বিলাতী পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছেন, সমরেন্দ্রনাথ হয়তো কোন নাতি কি নাতিনীকে আদর করেছেন এবং অবনীন্দ্রনাথ পটের উপরে তুলিকা চালনায় নিযুক্ত। তারপর ছবি আঁকতে আঁকতেই আমাদের সঙ্গে আলাপ করতেন। একবার চোখ তুলে কথা বলেন, আবার চোখ নামিয়ে পটের উপরে বুলিয়ে যান তুলি। আলাপের সঙ্গে কলার কাজ।

ভেঙে গিয়েছে আজ ঠাকুরবাড়ীর সকল আনন্দের হাট। বুকের মধ্যে দীর্ঘশ্বাস পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে ব'লে সে বাড়ীর ভিতরে আর প্রবেশ করি না। ঠাকুরবাড়ী আজ নিরালা, নিস্তব্ধ।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেবল তুলি ধ'রে ছবি আঁকা নয়, কলম ধ'রেও ছবি আঁকা। এটি হচ্ছে অবনীন্দ্রনাথেরই শিল্পীমনের বিশেষত্ব। শব্দচিত্রাঙ্কনে তাঁর এই চমৎকার নৈপুণ্যের দিকে সমালোচকদের মধ্যে সর্বপ্রথমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বোধ হয় "সাহিত্য" সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। লেখকরূপে ও চিত্রকররূপে অবনীন্দ্রনাথ একই কর্তব্য পালন করেন। ছবিকার হয়েও তিনি যেমন লেখাকে ভুলতে পারেন নি, লেখক হয়েও তেমনি ভুলতে পারেন নি ছবিকে। পৃথিবীর আরো কোন কোন বড় চিত্রকর লেখনী ধারণ করেছেন, কিন্তু তাঁদের কারুর রচনায় এ বিশেষত্বটি লক্ষ্য করি নি।

লেখকরূপে ও চিত্রকররূপে অবনীন্দ্রনাথকে জেনেছি বাল্যকাল থেকেই। সে সময়ে এদেশে উচ্চশ্রেণীর বাল্যপাঠ্য পুস্তকের অভাব ছিল অত্যন্ত। বয়স্ক লিখিয়েরা মাথা ঘামাতেন কেবল বয়স্ক পড়ুয়াদের জন্যেই, কিংবা শিশুদের জন্যে বড় জোর লিখতেন পাঠশালার কেতাব। শিশুদের চিত্তরঞ্জন করবার ভার নিতেন ঠাকুমা-দিদিমার দল। কিন্তু শিশুরা যখন কৈশোরে গিয়ে উপস্থিত হ'ত, তখন বয়সগুণে অধিকতর বেড়ে উঠত তাদের মনের ক্ষুধা, অথচ তারা খোরাক সংগ্রহ করবার সুযোগ পেত না। সে বয়সে তাদের মনের উপরে রেখাপাত করতে পারত না শিশুভুলানো ছড়া ও রূপকথা। এই অভাব মোচন করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথও গোড়া থেকেই লেখনী ধারণ করেছিলেন। অবনীন্দ্র-নাথের "ক্ষীরের পুতুল"ও রূপকথা বটে, কিন্তু যে উচ্চশ্রেণীর লিপিকুশলতার গুণে রূপকথাও একসঙ্গে নাবালক ও সাবালকদের উপযোগী হয়ে ওঠে, ওর মধ্যে আছে সেই বিশেষ গুণটি। সেইজন্যে কিশোর বয়সে তা পাঠ ক'রে মুগ্ধ হতুম আমরা। তারপর তিনি বলতে সুরু করলেন "রাজকাহিনী"। কাহিনীগুলি প্রকাশিত হ'ত

বড়দের পত্রিকা "ভারতী"তে, কিন্তু ছোটরাও তা সাগ্রহে পাঠ করত এবং পড়ে আনন্দলাভ করত বড়দেরও চেয়ে বেশী। সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে আকৃষ্ট করেছিল এই "রাজকাহিনী"রই শব্দচিত্রগুলি। অবনীন্দ্রনাথের "ভূতপত্রীর দেশে"ও যেখানে-সেখানে পাওয়া যাবে অপূর্ব শব্দচিত্র, সেগুলি ভুলিয়ে দেয় ছেলে-বুড়ো সবাইকেই।

অবনীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনার বিস্তৃত সমালোচনা করবার জায়গা এখানে নেই। লিখেছেন তিনি অনেক ঃ গল্প, কাহিনী, নক্সা, হাস্যনাট্য, ছড়া এবং প্রবন্ধ প্রভৃতি। প্রত্যেক বিভাগেই আছে তাঁর বিশিষ্ট হাতের বিশদ ছাপ। তাঁর নাম না ব'লে তাঁর যে কোন রচনা অন্যান্য লেখকদের রচনাস্তূপের মধ্যে স্থাপন করলেও তাকে খুঁজে বার করা যেতে পারে অতিশয় অনায়াসেই,—এমনি স্বকীয় তাঁর রচনাভঙ্গি। সে ভঙ্গি অননুকরণীয়। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাভঙ্গি অনুকরণ ক'রে অনেকে অল্পবিস্তর সার্থকতা লাভ করেছেন, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের লিখন-পদ্ধতির নকল করবার সাহস কারুর হবে ব'লে মনে হয় না।

ছেলেবেলায় "সাধনা" পত্রিকায় অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির প্রতিলিপি দেখি সর্বপ্রথমে। ছবিগুলি মুদ্রিত হ'ত শিলাক্ষরে (লিথোগ্রাফ)। রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং তাই অবলম্বন ক'রে ছবি। আমাদের খুব ভালো লাগত। কিন্তু তাদের ভিতরে পরবর্তী যুগের অবনীন্দ্রনাথের সুপরিচিত চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি কেউ আবিষ্কার করতে পারবেন না। প্রথম জীবনে তিনি য়ুরোপীয় পদ্ধতিতেই চিত্রাঙ্কন করতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং শিক্ষা পেয়েছিলেন ইতালীয় শিল্পী গিলহার্ডি ও ইংরেজ শিল্পী পামারের কাছে। অবনীন্দ্রনাথের তখনকার আঁকা ছবি তাঁর বাড়ীতে এখনো রক্ষিত আছে।

প্রপিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুস্তকাগারে একখানি পুঁথির মধ্যে মোগল যুগের ছবি দেখে হঠাৎ তিনি দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন, তাঁর চোখ ফিরে আসে বিদেশ থেকে স্বদেশের দিকে। কিছুদিন ধ'রে চলে ভারতীয় শিল্পসম্পদ নিয়ে নাড়াচাড়া। প্রাচ্য চিত্রকলা পদ্ধতিতে "কৃষ্ণলীলা" অবলম্বন ক'রে এঁকে ফেললেন কয়েকখানি ছবি। সেগুলি দেখে শিক্ষক পামার চমৎকৃত হয়ে বললেন, "তোমার

শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে, আর তোমাকে কিছু শেখাবার নেই।" অবনীন্দ্রনাথ নিজের পথ নিজেই কেটে নিলেন। ভারত-শিল্পের নবজন্মের সূচনা হ'ল।

তারপর কেমন ক'রে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা-প্রসাদাৎ নবযুগের ভারত-শিল্প বাংলাদেশে প্রথম আত্মপ্রকাশ ক'রে বিশাল ভারতবর্ষে আপন বিজয়-পতাকা উত্তোলন করে, তা নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করতে চাই না, কারণ অবনীন্দ্রনাথের জীবনী বা ভারত-শিল্পের ইতিহাস রচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবেই তাঁকে দেখতে ও দেখাতে চেষ্টা করব।

সাল-তারিখ মনে নেই, তবে কলকাতার সরকারী চিত্র-বিদ্যালয়ে তখনও প্রাচ্য চিত্রকলা শেখাবার ব্যবস্থা হয় নি এবং তার সঙ্গে তখনও সংযুক্ত ছিল একটি আর্ট-গ্যালারি। সে সময়ে শ্রেষ্ঠ চিত্র বলতে আমরা বুঝতুম য়ুরোপীয় চিত্রই। ঐ আর্ট-গ্যালারির মধ্যে য়ুরোপীয় শিল্পীদের আঁকা অনেক ছবি সাজানো ছিল—এমন কি রাফাএলের পর্যন্ত (যদিও তা মূল ছবি নয়)। একদিন সেখানে ছবি দেখতে গিয়েছি। খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর সেই অসংখ্য বিলাতী ছবির ভিড়ের মধ্যে আচম্বিতে এক কোণে আবিষ্কার করলুম জলীয় রঙে আঁকা কয়েকখানি অভাবিত ছবি। সেগুলি হচ্ছে অবনীন্দ্রনাথের আঁকা মেঘদূত-চিত্রাবলী। একসঙ্গে সচকিত হয়ে উঠল আমার চোখ আর মন। প্রত্যেকখানি ছবি আকারে একরত্তি, সেখানে রক্ষিত ঢাউস ঢাউস বিলাতী ছবি ছেড়ে লোকের চোখ হয়তো তাদের দিকে ফিরতেই চাইত না, কারণ তারা কেবল আকারেই এতটুকু নয়, তাদের মধ্যে ছিল না পাশ্চাত্য বর্ণ-বৈচিত্র্য এবং ঐশ্বর্যের বাহুল্যও। তবু কিন্তু তাদের দেখে আমি একেবারে অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার সামনে খুলে গেল যেন এক অজানা সৌন্দর্যলোকের বন্ধ দরজা। মন সবিস্ময়ে ব'লে উঠল, যে অচিন সুন্দরকে দেখবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এখানে আসি নি, অকস্মাৎ সে নিজেই এসে আমার কাছে ধরা দিল!

আজকের দর্শকরা হয়তো ঐ ছবিগুলি দেখে আমার মতন অত বেশী অভিভূত হবেন না। কারণ বহুকাল ধ'রে অসংখ্য দেশী ছবি

নিয়ে অনুশীলন ক'রে চক্ষু তাঁদের অনেকটা শিক্ষিত হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু আমি তখন ছিলুম সম্পূর্ণরূপে বিলাতী ছবি দেখতেই অভ্যস্ত, এমন কি য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে চিত্রবিদ্যা শেখবার জন্যে সরকারি আর্ট স্কুলে ছাত্ররূপে যোগদানও করেছি। কাজেই ছবিগুলি আমার কাছে এনে দিলে নূতন আবিষ্কারের বার্তা। সেইদিন থেকেই আমি হয়ে পড়লুম অবনীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত।

মানুষটিকে চোখে দেখবার সাধ হ'ল এবং সুযোগও মিলল অনতি-বিলম্বেই। খবর পেলাম, অবনীন্দ্রনাথদের ভবনে শিল্প-সম্পর্কীয় এক সভার অধিবেশন হবে। যথাসময়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলুম। অবনীন্দ্রনাথকে দেখলুম। শান্ত, মিষ্ট মুখ। সহজ সরল ভাব, কোন রকম ভঙ্গি নেই। ভালো লাগল মানুষটিকে।

সভায় বউবাজার চিত্র-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ (তাঁর নাম কি মন্মথ-বাবু?) বক্তৃতা দিতে উঠে অবনীন্দ্রনাথের গুণগ্রামের পরিচয় দিলেন। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীও (ইউ রায়) দু-চার কথা বললেন। শুনলুম ওঁরা একটি শিল্প-সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করতে চান এবং রবীন্দ্রনাথ তার নামকরণ করেছেন "কলা-সংসদ"। কিন্তু তারপর কি হয়েছিল জানি না, তবে "কলা-সংসদ" সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য শুনতে পাই নি।

তারপর কিছুদিন যায়। "প্রবাসী" ও "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশিত হ'তে লাগল অবনীন্দ্রনাথের ছবির পর ছবি। অনেককে তারা করলে আনন্দিত। এবং অনেককে আবার ক'রে তুললে দস্তুরমত ক্রুদ্ধ; বিলাতী শিক্ষাগুণে তাঁরা এমন মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে, ঘরের ছেলে হয়েও ঘরোয়া রূপের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারলেন না। যে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি অবনীন্দ্রনাথের রচনার শব্দচিত্রগুলি দেখে প্রশংসা করেছিলেন, অবনীন্দ্রনাথের আঁকা প্রত্যেক চিত্রই যেন তাঁর চোখের বালি হয়ে উঠল। তিনি প্রথম শ্রেণীর চিত্র-সমালোচক (যা তিনি ছিলেন না) সেজে বারংবার উষ্মা প্রকাশ ও ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। গালিগালাজ যাদের পেশার মত, এমন আরো বহু ব্যক্তি যোগদান করলে সুরেশচন্দ্রের দলে। বাজার হ'য়ে উঠল সরগরম।

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন "যোগাসনে লীন যোগীবরে"র মত—নিন্দা-প্রশংসায় সমান অটল। ঐ সব আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁর মুখে ছিল না কোন প্রতিবাদ। তরঙ্গের ধারাবাহিক প্রহার চিরদিনই নিশ্চল ও নিস্তব্ধ হয়ে সহ্য করতে পারে সাগরশৈল। তিনি আত্ম-গত হয়ে বাস করতে লাগলেন নিজের পরিকল্পনার জগতে। দিনে দিনে নব নব রূপ সৃষ্টি ক'রে ভরিয়ে তুলতে লাগলেন রসজ্ঞ [illegible] চিত্ত।

মাঝে মাঝে তুলি ছেড়ে কলম ধরেন, যাদের অনুসন্ধিৎসু মন জানতে চায়, বুঝতে চায়, তাদের জানাতে এবং বোঝাতে ললিতকলার আদর্শ ও গুপ্তকথা। তাঁর সেই প্রবন্ধগুলিও প্রাচ্য চিত্রকলার রহস্যোদ্ঘাটনের পক্ষে অল্প সাহায্য করে নি। গঠন করলেন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্টস নামে একটি প্রতিষ্ঠান। সেখানে দেশীয় চিত্র সম্বন্ধে লোকসাধারণের চিত্তকে সচেতন ও শিক্ষিত ক'রে তোলবার জন্যে বাৎসরিক ছবির মেলা বসাবার ব্যবস্থা করা হ'ল। ওদিকে গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের আসরে আসীন হয়ে তিনি তৈরি ক'রে তুলতে লাগলেন দলে দলে নূতন শিল্পী। ফল যা হয়েছে তা সর্বজনবিদিত। তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা বাংলার জমিতে যে বাক্যবিষবৃক্ষ রোপণ করেছিলেন, তা কোন ফলই প্রসব করতে পারে নি। জয় হয়েছে অবনীন্দ্রনাথেরই।

অবনীন্দ্রনাথের বিজয়গৌরব কেবল ভারতে নয়, স্বীকৃত হয়েছে ভারতের বাইরেও। কিন্তু যেখানে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত বাধে এবং পরস্পরবিরোধী আদর্শ দুটি সমান্তরাল রেখার মত থেকে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হ'তে নারাজ হয়, সেখানে অপ্রীতিকর দৃশ্যের অবতারণা অবশ্যম্ভাবী।

ভারতবর্ষে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর শিল্পীর প্রভাব দেখা গিয়েছে। একদল কলকাতা চিত্র-বিদ্যালয়ের অনুগামী, আর একদল হচ্ছে বোম্বাই আর্ট স্কুলে শিক্ষিত। হ্যাভেল সাহেব ও অবনীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে আসবার আগে কলকাতার সরকারী চিত্র-বিদ্যালয়ের ছাত্ররা যে রকম শিক্ষালাভ ক'রে বেরিয়ে আসত, বোম্বাইয়ের শিল্পীদের দৌড় তার চেয়ে বেশী ছিল না। তাঁদের আর্ট পাশ্চাত্য আদর্শে

অনুপ্রাণিত হয়ে চেষ্টা করত (এবং এখনো করছে) ভারতবর্ষকে প্রকাশ করতে। এই বর্ণসঙ্কর বা দোআঁশলা আর্ট সৃষ্টি করতে পারে বড় জোর রবি বর্মা বা ধুরন্ধরের মত শিল্পীকে। রবি বর্মার ছবিতে যে মানুষগুলি দেখা যায়, তাদের প্রত্যেকেরই ভাবভঙ্গি দস্তুরমত থিয়েটারি। তাঁর "গঙ্গাবতরণ" নামে জনপ্রিয় চিত্রে হিন্দুদের পৌরাণিক দেবতা মহাদেবের যে ভঙ্গিবিশিষ্ট মূর্তি দেখি, সাজপোষাক পরিবর্তন করতে পারলে অনায়াসে তিনি বিলাতী সাহেবে পরিণত হ'তে পারেন। আগে একাধিক বাঙালী শিল্পীও এই শ্রেণীর ছবি এঁকেছেন, তাদের কিছু কিছু নমুনা আজও বাজারে দুর্লভ নয়।

কিন্তু হ্যাভেল সাহেব ও অবনীন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার পদ্ধতি যখন বাঙলার বাইরেও সাগ্রহে অবলম্বিত হ'তে লাগল এবং নন্দলাল বসু প্রমুখ অসাধারণ শিল্পীর প্রভাব যখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগল, বোম্বাইয়ের শিল্পীদের অবস্থা হয়ে পড়ল তখন নিতান্ত অসহায়ের মত। বোম্বাই স্কুল অফ আর্টের ভূতপূর্ব পরিচালক গ্লাডস্টোন সলোমন বাংলা পদ্ধতির সেই অগ্রগতি সহ্য করতে পারেন নি। প্রায় ঊনিশ বৎসর আগে "Essays on Mogul Art" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ ক'রে তিনি হ্যাভেল সাহেব, অবনীন্দ্রনাথ ও বাংলার পদ্ধতির বিরুদ্ধে করেছিলেন প্রভূত বিষোদ্গার। তবু বাতাসের গতি ফিরল না দেখে অল্পকাল আগেও আবার তিনি তর্জন-গর্জন (বা অরণ্যে রোদন) করতে ছাড়েন নি। কিন্তু বৃথা এ সব চেষ্টা! যে ঘুমিয়ে পড়েছে তাকে জোর ক'রে আবার জাগানো যায়, কিন্তু যে জেগে উঠেছে তাকে জোর ক'রে আবার ঘুম পাড়ানো সম্ভবপর নয়।

এখন অবনীন্দ্রনাথের জীবনের সন্ধ্যাকাল। দিনের কাজ তাঁর ফুরিয়ে গিয়েছে, বেলা-শেষের কর্মশ্রান্ত বিহঙ্গের মত বিশ্রাম গ্রহণের জন্যে তিনি ফিরে এসেছেন নিজের নীড়ে। একান্তে ব'সে স্বপ্ন দেখেন,—গত জীবনের সার্থক স্বপ্ন। তাঁর পায়ের তলায় গিয়ে বসলে আমাদেরও মনে আবার জেগে ওঠে অতীতের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া কত দিনের স্মৃতি, কত আনন্দময় মুহূর্ত, কত বিচিত্র রসালাপ!

মানুষ অবনীন্দ্রনাথ

প্রসিদ্ধ লেখক ও "ভারতী"-সম্পাদক স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের মধ্যম জামাতা। তাঁর মুখে শুনেছি, গভর্নমেণ্ট স্কুল অফ আর্টসের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব একবার কি কারণে অবনীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, "তুমি বড় সেণ্টিমেণ্টাল।"

অবনীন্দ্রনাথ জবাব দিয়েছিলেন, "আমি আর্টিষ্ট, সেণ্টিমেণ্ট নিয়েই আমার কারবার। আমাকে তো সেণ্টিমেণ্টাল হ'তেই হবে।"

এই সেণ্টিমেণ্টালিটি বা ভাবপ্রবণতাই অবনীন্দ্রনাথকে চিরদিন চালিত করেছে ললিতকলার নানা দিকে, নানা ক্ষেত্রে। যখনই তাঁর কাছে গিয়েছি, তাঁর কথা শুনেছি, তখনই উপলব্ধি করেছি, তাঁর মন সর্বদাই আনাগোনা করতে চায় ভাব থেকে ভাবান্তরে, রূপ থেকে রূপান্তরে। অলসভাবে ব'সে ব'সে দিবাস্বপ্নে মশগুল হয়ে থাকা, এ হচ্ছে তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সর্বদাই তিনি কোন না কোন রূপসৃষ্টির কাজ নিয়ে নিযুক্ত হয়ে থাকতে ভালোবাসেন। নিরালায় একলা ব'সে ছবি তো আঁকেনই, এমন কি যখন বাইরেকার আর পাঁচজন এসে তাঁকে ঘিরে বসেন তখনও তাঁর কাজে কামাই নেই, গল্প করতে করতেই পটের উপরে এঁকে যান রেখার পর রেখা। যখন ছবির পাট তুলে দেন তখন নিয়ে বসেন কাগজ ও কলম। খাতার উপরে ঝ'রে পড়ে রঙের বদলে সাহিত্যরসের ধারা। তারপর খাতা মুড়লেও কাজ বন্ধ হয় না। ছোট ছোট ভাস্কর্যের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকেন। তারও উপরে আছে অন্যরকম কাজ বা শিল্পীসুলভ খেলা। বাগানে বেড়াতে বেড়াতেও দৃষ্টি তাঁর লক্ষ্য করে, প্রকৃতি দেবী সেখানে নিজের হাতে তৈরি ক'রে রেখেছেন কত সব মূর্তি বা বস্তু। হয়তো এক টুক্‌রো শুকনো ডাল বা পালাকে দেখাচ্ছে ঠিক ডিঙার মত। অমনি সেটি সংগ্রহ করা হ'ল এবং আর একটি গাছ থেকে সংগৃহীত হ'ল মানুষের মত দেখতে একটি পালা। অমনি অবনীন্দ্র-

নাথের পরিকল্পনায় তারা পরিণত হ'ল অপূর্ব একটি প্রাকৃতিক ভাস্কর্য-কার্যে। যেন রূপকথায় বর্ণিত নদনদীর মধ্যে জলযাত্রা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে ছোট্ট একখানি তরণী ও তার কর্ণধার। এ তাঁর হেলাফেলার খেলা নয়, এ শ্রেণীর অনেক কাজ তাঁর সংগ্রহ-শালায় সাদরে সুরক্ষিত হয়েছে। তিনি এর কি একটি নাম দিয়েছিলেন ব'লে স্মরণ হচ্ছে—বোধ হয় "কাটুম-কুটুম খেলা।"

বৈষ্ণব কবি গেয়েছেন, "জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।" অবনীন্দ্রনাথও ঐ দলের মানুষ। রূপ আর রূপ—তিনি সারাক্ষণই সমাহিত হয়ে আছেন আপন রূপলোকে। মনে মনে সর্বদা এঁকে যান ছবি আর ছবি—সে সব ছবি হয়তো কোন দিন পটেও উঠবে না, কলমেও ফুটবে না, তবু পরিপূর্ণ হয়ে থাকে তাঁর মানস-চিত্রশালা।

চার-পাঁচ বৎসর আগে একদিন অবনীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছি। কথাবার্তা কইতে কইতে হঠাৎ বললুম, "একটুখানি লেখা দিন।"

তিনি বললেন, "কাগজ-কলম নিয়ে বোসো। আমি বলি, তুমি লিখে নাও।"

তারপর এক সেকেণ্ডও চিন্তা না ক'রেই এবং একবারও না থেমে তিনি মুখে মুখে যে শব্দচিত্রখানি রচনা করলেন, এখানে তা তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারলুম নাঃ

"ময়না বললে দাদামশা ছবি আঁকবো, বেশ কথা—সবাই ঐ কথাই বলেঃ ছবি যে আঁকে সেই জানে ছবি আঁকা সহজ নয়, কিন্তু যারা দেখে তারা ভাবে এ তো বেশ সহজ কাজ! ঐ হ'ল মজা ছবি লেখার।

ময়না রং তুলি নিয়ে আঁকতে বসলো হিজিবিজি কাগের ছা—

আমি সেই হিজিবিজি থেকে কখনো কাগের ছা, কখনো বগের ছা বানিয়ে দিই, আর ছবি আঁকার প্রথম পাঠ দি ময়নাকে, যথা—

হিজিবিজি কাগের ছা
লিখে চল যা তা
লিখতে লিখতে পাকলে হাত
লেখার হবে ধারাপাত—

সেই সময় ধারা দিয়ে বৃষ্টি নামে, লেখা মুছে যায় জলের ছাটে, ভাত আসে, দুপুর বাজে, পুকুরঘাটে নাইতে চলে ময়না—দুপুরের ঘুমের আগে প্রথম পাঠ শেষ কোরে।”

রচনারীতি সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের একটি নিজস্ব মত আছে। প্রত্যেক বিখ্যাত লেখকই নিজের জন্যে একটি বিশিষ্ট রচনাপদ্ধতি নির্বাচন ক'রে নেন। ফ্রান্সের সাহিত্যগুরু ফ্লবেয়ার একটানা লিখে যেতে পারতেন না, একটিমাত্র শব্দ নির্বাচনের জন্যে কখনো কখনো তিনি কাটিয়ে দিতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা—এমন কি এক বা একাধিক দিবস!

ঔপন্যাসিক বালজাক প্রথম যে পাণ্ডুলিপি ছাপাখানায় পাঠিয়ে দিতেন, তার বাক্যাংশ বা বিষয়বস্তু বা আখ্যানভাগ পাঠ ক'রেও কেউ কিছু বুঝতে পারত না। পরে পরে সাত-আটবার প্রুফ দেখার এবং পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধনের পর তবেই তা পাঠকদের উপযোগী হয়ে উঠত।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রচনার পাণ্ডুলিপি দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে। সেগুলির মধ্যে যথেষ্ট কাটাকুটির চিহ্ন আছে। পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পরও তিনি নিশ্চিন্ত হ'তে পারতেন না, নব নব সংস্করণের সময়ে বার বার চলত তাঁর অদল-বদলের কাজ।

রচনাকার্যে নিযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেও আমি দেখেছি। তিনিও অনায়াসে রচনা করতে পারতেন না। যথেষ্ট ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে তিনি লেখনীচালনা করতেন। একবার যা লিখতেন আবার তা কেটে দিয়ে নতুন ক'রে লিখতেন দ্বিতীয়বার।

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের রচনাপদ্ধতি স্বতন্ত্র। আমি যখন “রংমশাল” পত্রিকার সম্পাদক, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁকে কিছু লেখবার জন্যে অনুরোধ করেছিলুম। সেবারেও তিনি মুখে মুখে ব'লে গেলেন এবং আমি লিখে নিলুম। লেখাটি সম্পূর্ণ হ'লে আমি তাঁকে প'ড়ে শোনালুম, যদি কিছু অদলবদলের দরকার হয়। কিন্তু সে দরকার আর হ'ল না। মনে আছে, সেই দিনই তিনি

আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, "হেমেন্দ্র, প্রথমে যা মনে আসবে, তাই লিখো। তবেই লেখা হবে স্বাভাবিক।"

বিখ্যাত লেখক ও নানা সংবাদপত্রের সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলতেন, "একটা বাক্য (sentence) খানিকটা লিখে মনের মনের মত হ'ল না ব'লে কেটে দেওয়া ঠিক নয়। সেই বাক্যটাই চটপট সম্পূর্ণ ক'রে ফেলা উচিত, কারণ সাংবাদিকের কাজ শেষ করতে হয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।"

কিন্তু এ রীতি সাংবাদিকের উপযোগী হ'লেও সাহিত্যিকের নয়। অবনীন্দ্রনাথের কাছে যে পদ্ধতি সহজ এবং যা অবলম্বন ক'রে তিনি রাশি রাশি সোনা ফলাতে পারেন, অধিকাংশ সাহিত্যিকের পক্ষে তা অকেজো হয়ে পড়বার সম্ভাবনা। তবে এখানেও একটা মধ্য-পন্থা আছে। মনের ভিতরে প্রথমেই যে বাক্য আসবে, মনে মনেই তা অদলবদল ক'রে নিয়ে তারপর কাগজ-কলমের সাহায্য গ্রহণ করলে রচনায় বিশেষ কাটাকুটির দরকার হয় না।

অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা বলি। সে বোধ করি তেতাল্লিশ কি চুয়াল্লিশ বৎসর আগেকার কথা।

"ভারতী" পত্রিকার জন্যে রচনা করেছিলুম প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ। সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী বললেন, "এ লেখার সঙ্গে অজন্তার দুই একখানা ছবি দেওয়া দরকার। তুমি অবনীন্দ্রনাথের কাছে যাও, আমার নাম করলে সেখান থেকেই ছবি পাবে।"

সরাসরি অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করবার ভরসা আমার হ'ল না। কিন্তু ঠাকুরবাড়ীর অন্যতম বিখ্যাত লেখক সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন আমার পরিচিত, তিনি আমাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখতেন, মাঝে মাঝে আমার বাড়ীতেও পদার্পণ করতেন। আমি তাঁকেই গিয়ে ধরলুম, অবনীন্দ্রনাথের কাছে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে।

সুধীন্দ্রনাথের পিছনে পিছনে অবনীন্দ্রনাথদের বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করলুম। দ্বারবানদের দ্বারা রক্ষিত দরজা পার হয়েই এক-

খানি ঘর, সেখানে দেওয়ালের গায়ে হাতে আঁকা ছবি। একখানি বড় ছবির কথা মনে আছে, তাতে ছিল একটি কলাগাছের ঝাড়। দেশীয় পদ্ধতিতে আঁকা নয়। চিত্রকার অবনীন্দ্রনাথ স্বয়ং।

সামনেই প্রশস্ত সোপানশ্রেণী—সেখানেও রয়েছে বিলাতী পদ্ধতিতে আঁকা প্রকাণ্ড একখানি তৈলচিত্র—"শূদ্রকের রাজসভা", চিত্রকর যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। ছবিখানি প্রভূত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

দোতালার মস্তবড় বৈঠকখানা, সাজানো গুছানো, শিল্পসম্ভারে পরিপূর্ণ। ঘরের মাঝখানে ব'সে আছেন অবনীন্দ্রনাথ, পরনে পায়জামা ও পাঞ্জাবী। তাঁর সামনে উপবিষ্ট একটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গোছের লোক। তাঁর সঙ্গে কথা কইতে কইতে অবনীন্দ্রনাথ একবার মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন, তারপর আবার পণ্ডিত গোছের লোকটির দিকে ফিরে বললেন, "লাইনগুলি একবার বলুন তো!"

তিনি বললেন, "বৈষ্ণব কাব্যের রাধা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে বলছেন—

'রন্ধনশালায় যাই
তুঁয়া বঁধু গুণ গাই,
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।'

অর্থাৎ শাশুড়ী-ননদী কোন সন্দেহ করতে পারবে না, ভাববে চোখে ধোঁয়া লেগেছে ব'লে আমি কাঁদছি!"

অবনীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, "বাঃ, বেড়ে তো! ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি'! এ লাইন নিয়ে খাসা একখানি ছবি আঁকা যায়।"

সুধীন্দ্রনাথ আমার পরিচয় দিলেন। আমিও আমার আগমনের উদ্দেশ্য বললুম।

তিনি বললেন, "বেশ, অজন্তার ছবির ব্যবস্থা আমি ক'রে দেব। আপনার ঠিকানা রেখে যান।"

সেইখানেই সেদিন প্রথম মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখেছিলুম, পরে যাঁর সঙ্গে আবদ্ধ হয়েছিলুম ঘনিষ্ঠতম বন্ধুত্ববন্ধনে।

দিন দুই পরেই একটি সাহেবের মত ফরসা যুবক আমার বাড়ীতে

এসে উপস্থিত, হাতে তাঁর অজন্তার দুইখানি ছবির প্রতিলিপি। তাঁর নাম শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, গত যুগের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের পুত্র। অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা ক'রে তিনি পরে হ'য়েছিলেন লাহোরের সরকারি চিত্র-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

এর পর অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে একাধিকবার দেখা হয় গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলে প্রাচ্য-চিত্রকলার প্রদর্শনীতে। সেখানে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর বড়দাদা গগনেন্দ্রনাথ নিয়মিতভাবে হাজির থেকে তখনকার আনাড়ী দর্শকদের কাছে ব্যাখ্যা করতেন দেশী ছবির গুণের কথা। প্রাকৃতজনদের কাছে জাতীয় শিল্পকে লোকপ্রিয় ক'রে তোলবার জন্যে সে সময়ে দেখতুম তাঁদের কি অসাধারণ প্রচেষ্টা ও আগ্রহ!

ঐ প্রদর্শনী-গৃহেই একদিন অবনীন্দ্রনাথের কাছে ভয়ে ভয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করলুম, আমিও প্রাচ্য চিত্রকলার শিক্ষার্থী হ'তে চাই।

খুব সম্ভব "ভারতী" ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত আমার কোন কোন শিল্প সম্পর্কীয় রচনা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি বললেন, "এখন আপনার মত ছাত্রই আমার দরকার—যারা একসঙ্গে তুলি আর কলম চালাতে পারবে। আঁকুন দেখি একটি পদ্মফুল।"

হঠাৎ এভাবে আঁকতে অভ্যস্ত ছিলুম না, বিশেষ তাঁর সামনে দস্তুরমত 'নার্ভাস' হয়ে গেলুম।

যে কিম্ভূতকিমাকার পদ্ম এঁকে দেখালুম, তা দেখে তিনি হতাশ হলেন না, বললেন, "আপনার চেয়েও যারা খারাপ আঁকত, তারাও আমার হাতে এসে উৎরে গেছে। আপনার হবে।" বোধ করি সেদিনও তাঁর মত ছিল—

"হিজিবিজি কাগের ছা
লিখে চল যা তা—
লিখতে লিখতে পাকলে হাত
লেখার হবে ধারাপাত।"

কিন্তু হায় রে, ছবি আঁকায় হাত আর আমার পাকলো না। এমনভাবে প'ড়ে গেলুম সাহিত্যের আবর্তে, নজর দেবার অবসরই পেলুম না অন্য কোন দিকে।

অবনীন্দ্রনাথ ভাবুক, কিন্তু ভারিক্কে মেজাজের মানুষ নন। এমন সব বিখ্যাত গুণী ব্যক্তি আছেন, অত্যন্ত সাবধানে তাঁদের কাছে গিয়ে বসতে হয়। এমনি তাঁরা রাশভারী যে তাঁদের সামনে মন খুলে কথা কইতেও ভরসা হয় না। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ রাশভারীও নন, রাশহাল্কাও নন, তিনি একেবারে সহজ মানুষ। কোন রকম ছাবলামি না ক'রেও যে-কোন প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি আর পাঁচজনের সঙ্গে যোগ দিয়ে গল্পসল্প, হাসি-তামাসা বা রঙ্গভঙ্গ করতে পারেন। তাঁর সরস সংলাপ গুরুতর বিষয়কেও ক'রে তোলে সহজসরল।

পরম উপভোগ্য তাঁর মজলিস। সেখানে কারুকেই মুখে চাবিতালা দিয়ে ব'সে থাকতে হয় না, সবাই অসঙ্কোচে বলতে পারেন তাঁদের প্রাণের কথা। অনেক জ্ঞানী ও গুণী চমৎকার বৈঠকী আলাপ করেন বটে, কিন্তু সমগ্র বৈঠকটিকে একাই এমনভাবে সমাচ্ছন্ন ক'রে রাখেন যে, আর কেউ সেখানে মুখ খোলবার ফুরসৎ পান না। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের বৈঠক Soliloquy বা আত্ম-ভাষণের বৈঠক নয়। সেখানে সবাই তাঁর কথা শোনবার ও নিজেদের কথা শোনাবার অবসর পান। সেখানে কখনো কখনো কারুকে কারুকে মুখরতা প্রকাশ করতেও দেখেছি কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ অধীরতা প্রকাশ করেন নি।

তাঁর ভাবপ্রবণ মনে মাঝে মাঝে জাগে এমন সব অদ্ভুত খেয়াল, ভারিক্কে ব্যক্তিদের কাছে যা ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছুই নয়। কলকাতায় বর্ষা নামে, বিদ্যুৎ জ্বলে, বাজ হাঁকে, আকাশে মেঘের মিছিল চলে, দিকে দিকে ছায়ার মায়া দোলে, ঠাকুরবাড়ীর দক্ষিণের বাগানে বাদলের ঝর ঝর ধারা ঝরে, গাছপালার পাতায় পাতায় মর্মরবাণী জাগে, বাতাসের নিঃশ্বাসে ফুলের ও সোঁদা মাটির গন্ধ ভেসে আসে, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের মনে ফোটে না বর্ষার পুরন্ত রূপখানি। বৈষ্ণব কবিদের মত তাঁরও বিশ্বাস, বর্ষার জলসার সঙ্গে

দর্দুর বা ভেকের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। বলেন, "এখানে ব্যাং কই, ব্যাং না ডাকলে কি বর্ষা জমে?"

তখনই হুকুম হয়, "যেখান থেকে পারো কতকগুলো ব্যাং ধ'রে নিয়ে এস।"

লোকজন ঝুলি নিয়ে ছোটে। হেদুয়া না গোলদিঘির পুকুর-পাড়ে নিরাপদে ও নির্ভাবনায় দল বেঁধে ব'সে যে সব দর্দুরনন্দন কাব্যে বর্ণিত মকধ্বনিতে পরিপূর্ণ করে তুলছিল চতুর্দিক, হানা-দাররা হঠাৎ গিয়ে পড়ে তাদের উপরে, টপাটপ ক'রে ধ'রে পুরে ফেলে ঝুলির ভিতরে। তারপর ঝুলিভর্তি ব্যাং এনে ঠাকুরবাড়ীর বাগানে ছেড়ে দেয়। বাস্তুহারা হয়েও ভেকের দল ভড়কে যায় না, গ্যাঙর গ্যাঙর তানে সম্মিলিত কণ্ঠে চলতে থাকে তাদের গানের আলাপ। অবনীন্দ্রনাথের মনে বর্ষার ঠিক রূপটি ফোটে। কিন্তু অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে হয়তো বাড়ীর লোকের কাণ আর প্রাণ।

এ গল্পটি আমার কাছে বলেছিলেন অবনীন্দ্রনাথের জামাতা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

ঠাকুরবাড়ীর প্রত্যেকেরই একটি শিষ্ট আচরণ লক্ষ্য করেছি। সর্ব-প্রথম যখন রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছি তখন তিনি ছিলেন প্রৌঢ়, আর আমি ছিলুম প্রায় বালক। কিন্তু তখনও এবং তারপরও অনেক দিন পর্যন্ত তিনি আমাকে "তুমি" ব'লে সম্বোধন করতে পারেন নি। গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথও আমাকে "বাবু" ব'লে সম্বোধন করতেন, এটা আমার মোটেই ভালো লাগত না। অবশেষে আমার অত্যন্ত আপত্তি দেখে অবনীন্দ্রনাথ আমাকে "বাবু" ও "আপনি" প্রভৃতি বলা ছেড়ে দেন। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরও আমার পিতার বয়সী হয়েও আমার সঙ্গে ব্যবহার করতেন সমবয়সী বন্ধুর মত, তবু কিন্তু তিনি আমাকে কোনদিনই "তুমি" ব'লে ডাকতে পারেন নি, আমি আপত্তি করলে খালি মুখ টিপে হাসতেন। এ শ্রেণীর শিষ্টাচার দুর্লভ।

"আনন্দবাজার পত্রিকা"র সম্পাদক স্বর্গীয় প্রফুল্ল সরকারকে অবনীন্দ্রনাথ একদিন অতিশয় অবাক ক'রে দিয়েছিলেন। ১৩৩১

কি ৩২ সালের কথা। আমি তখন আনন্দবাজারের নাট্য-বিভাগের ভার গ্রহণ করেছি।

প্রফুল্লবাবু একদিন বললেন, "হেমেন্দ্রবাবু, দোলযাত্রার জন্যে আনন্দবাজারের একটি বিশেষ সংখ্যা বেরুবে। অবনীন্দ্রনাথের একটি লেখা চাই। আপনার সঙ্গে তো তাঁর আলাপ আছে. আমাকে একদিন তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন?"

বললুম, "বেশ তো, কাল সকালেই চলুন।"

পরদিন যথাসময়ে অবনীন্দ্রনাথের বাড়ীতে গিয়ে দেখলুম, বাগানের দিকে মুখ ক'রে তিনি ব'সে আছেন একলা।

তাঁর সঙ্গে প্রফুল্লবাবুকে পরিচিত করবার জন্যে বললুম, "ইনি দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে আসছেন।"

অবনীন্দ্রনাথ সুধোলেন, "সে আবার কোন্ কাগজ?"

প্রফুল্লবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। সবিস্ময়ে বললেন, "আপনি আনন্দবাজারের নাম শোনেন নি?"

অবনীন্দ্রনাথ মাথা নেড়ে বললেন, "না। খবরের কাগজ আমি পড়ি না।"

প্রফুল্লবাবু দ'মে গিয়ে একেবারে নির্বাক।

আমি বললুম, "আনন্দবাজারের দোল-সংখ্যার জন্যে উনি আপনার একটি লেখা চাইতে এসেছেন।"

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, "বেশ, লেখা আমি দেব।"

অবনীন্দ্রনাথ মজার মানুষ। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে আগে খুব ঘটা ক'রে মাঘোৎসব হ'ত। বিশেষ ক'রে জ'মে উঠত ব্রহ্ম-সঙ্গীতের আসর। রবীন্দ্রনাথ বহু সঙ্গীত রচনা করতেন। সেই সব গান শোনবার জন্যে যাঁরা ব্রাহ্ম নন তাঁরাও সেখানে গিয়ে সৃষ্টি করতেন বিপুল জনতা। নিমন্ত্রিতদের জন্যে জলখাবারেরও ব্যবস্থা থাকত। এখনকার ব্যবস্থার কথা জানি না। একবার আমার বড় ছেলে (এখন ফুটবল খেলার মাঠে রেফারি অলক রায় নামে সুপরিচিত) আবদার ধরলে, আমার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর মাঘোৎসব দেখতে যাবে। তাকে নিয়ে গেলুম। বাইরেকার প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে-

ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। আমার ছেলের দিকে তাকিয়ে সুধোলেন, "তোমার সঙ্গে এটি কে?"

বললুম, "আমার ছেলে।"

অবনীন্দ্রনাথ তো হেসেই অস্থির। বললেন, "হেমেন্দ্র, তুমি আমার চোখে ধুলো দেবে ভেবেছ? ভাইকে ছেলে ব'লে চালিয়ে দিতে এসেছ?"

আমি যতই বলি, "না, এ সত্যিই আমার ছেলে". তিনি কিছুতেই সে-কথা মানতে রাজি হলেন না, কারণ আমার নাকি অত বড় ছেলে হ'তেই পারে না!

তিনি আমাকে তরুণ বয়স থেকে দেখেছেন। সেই তারুণ্যকেই তিনি মনে ক'রে রেখেছেন, আমি যে তখন প্রৌঢ় সেটা তাঁর চোখে ধরা পড়ে নি। কেবল প্রৌঢ় নই, আমি তখন ছয়টি সন্তানের পিতা।

অবনীন্দ্রনাথ কেবল তুলি ও কলমের ওস্তাদ নন, তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্যও অসাধারণ। এটা নিশ্চয়ই সহজাত সংস্কারের ফল। তাঁর পিতামহ গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেছিলেন "বাবুবিলাস" নাটক এবং নিজের বাড়ীতেই করেছিলেন তার অভিনয়ের আয়োজন। তাঁর পিতা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন প্রথম যুগের বাংলা রঙ্গালয়ের একজন বিখ্যাত নাট্য-ধুরন্ধর। তিনি ছেলেবেলা থেকেই নিজের বাড়ীতে নাট্যোৎসব দেখে এসেছেন, সুতরাং পাদপ্রদীপের মায়ার দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন স্বাভাবিকভাবেই। রবীন্দ্রনাথ সাধারণতঃ ভারিক্কে ভূমিকা নিয়েই রঙ্গমঞ্চে দেখা দিতেন, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন হাল্কা কৌতুকরসের ভূমিকা। তাঁর এই শ্রেণীর কয়েকটি অভিনয় আমি দেখেছি এবং মুগ্ধ হয়েছি। তিনি নিজে যেমন সহজ-সরল মানুষ, নাট্যমঞ্চের উপরেও দেখা দিয়েছেন ঠিক সেইভাবেই, একবারও মনে হয়নি কৃত্রিম অভিনয় দেখছি।

সাধারণ রঙ্গালয়েও মাঝে মাঝে তিনি অভিনয় দেখতে গিয়েছেন। "সীতা" নাট্যাভিনয়ে বাংলা নাট্যজগতে দৃশ্য-পরিকল্পনায় যুগান্তর এনেছিলেন তাঁরই এক শিষ্য শ্রীচারুচন্দ্র রায়। "মিশরকুমারী" নাট্যাভিনয়ে দৃশ্য-পরিকল্পক স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়ের কাজ দেখে খুসি হয়ে তিনি প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন ব'লে মনে হচ্ছে।

আর একজন নামকরা দৃশ্য-পরিকল্পক স্বর্গীয় পটলবাবুও তাঁর কাছে উপদেশ নিয়ে মিনার্ভা থিয়েটারের যবনিকার সম্মুখ অংশে (Proscenium) যে কারুকার্য দেখিয়েছিলেন, সকলেই তার প্রশংসা না ক'রে পারে নি।

আজ উদয়শঙ্করের নাম সকলের মুখে মুখে। কিন্তু প্রথম যখন তিনি কলকাতায় আসেন, দেশের কেউ তাঁর নাম জানত না এবং কোথাও তিনি আমল পান নি। সে এক যুগ গিয়েছে। পুরুষের নাচ ছিল থিয়েটারের বকাটে ছেলেদের নিজস্ব, শিক্ষিত ভদ্রঘরের ছেলে নাচবে, এটা ছিল লোকের কল্পনারও অগোচর। উদয়শঙ্কর দস্তুরমত হতাশ হ'য়ে প'ড়েছিলেন। শেষটা তিনি একদিন আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলেন। আমি বললুম, "আপনি অবনীন্দ্র-নাথের কাছে যান। তিনি শিল্পী, তাঁর মন গণ্ডী মানে না। নিশ্চয় তিনি কোন পথ বাৎলে দিতে পারবেন।"

আমার পরামর্শ ব্যর্থ হয় নি। উদয়শঙ্কর নাচবেন শুনে অবনীন্দ্রনাথ বিস্মিত হন নি বা তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চান নি, পরম উৎসাহিত হয়ে সুধীসমাজে তাঁকে পরিচিত করবার জন্যে প্রাচ্য চিত্র কলাভবনের সুবৃহৎ হলঘরে একদিন তাঁর নাচ দেখাবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। তারপর থেকেই সুগম হয়ে গেল উদয়শঙ্করের পথ। বিদ্বজ্জনগণ তাঁকে দিলেন জয়মাল্য, সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত হ'য়ে গেল জনসাধারণের বদ্ধ মন ও দৃষ্টি।

এক সন্ধ্যায় পুরাতন ঠাকুরবাড়ীর উঠানে রবীন্দ্রনাথের কি একটি নাচ-গানের আসর বসেছে, পালাটির নাম আর মনে পড়ছে না। উঠানের দক্ষিণ দিকে রঙ্গমঞ্চ, উত্তরে ঠাকুরদালানে ওঠবার সোপানের উপরে অবনীন্দ্রনাথের পাশে ব'সে আছি আমি। মঞ্চের উপরে কয়েকটি ছোট ছোট মেয়ে নাচতে নাচতে গান গাইছে। অবনীন্দ্রনাথ বললেন, "দেখ হেমেন্দ্র, আমাদের নাচের একটা বিষয় আমার মনে ধরে না। গানের কথায় যা যা থাকবে, নাচের ভঙ্গিতেও যে তা ফুটিয়ে তুলতে হবেই, এমন কোন বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত নয়। নাচ হচ্ছে একটা স্বতন্ত্র আর্ট, গানের কথাকে সে নকল করবে

কেন? সুরের তালের সঙ্গে নিজের ছন্দ মিলিয়ে তাকে স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করতে হবে নূতন নূতন সৌন্দর্য।"

"ভারতী" পত্রিকার কার্যালয়ে বসত আমাদের একটি সাহিত্যিক বৈঠক। এই মজলিসে পদার্পণ করতেন প্রবীণ ও নবীন বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক। অবনীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে শুনিয়ে আসতেন স্বরচিত ছোট ছোট হাস্যনাট্য বা নক্সা। তাঁর পাঠ হ'ত একসঙ্গে আবৃত্তি ও অভিনয়। লেখার ভিতরে যেখানে গান থাকত, নিজেই গুনগুন ক'রে গেয়ে আমাদের শুনিয়ে দিতেন, গানে সুর সংযোগও করতেন নিজেই। শুনেছি কোন কোন যন্ত্রও তিনি বাজাতে পারেন।

চলমান জল দেখতে তিনি ভালোবাসতেন। পুরীতে সাগরসৈকতে একখানি বাড়ী করেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন "পাথারপুরী"। মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে কিছুকাল কাটিয়ে আসতেন। কলকাতাতেও এক সময়ে প্রত্যহ সকালে গঙ্গাবক্ষে স্টিমারে চ'ড়ে বেড়িয়ে আসতেন বহুদূর পর্যন্ত। সেই গঙ্গাভ্রমণ উপলক্ষ্যে তাঁর কয়েকটি চমৎকার রচনা আছে।

আমিও কলকাতার গঙ্গার ধারে বাড়ী করেছি শুনে তিনি ভারি খুসি। উৎসাহিত হয়ে বললেন, "আমাকেও গঙ্গার ধারে একখানা বাড়ী দেখে দাও না!"

কিন্তু তাঁর গঙ্গার ধারে থাকা আর হয় নি। তবে এখন তিনি যেখানে বাস করছেন, সেও মনোরম ঠাঁই। নেই সহরের গণ্ডগোল, নিরিবিলি মস্ত বাগান। গাছে গাছে বসে পাখীদের গানের সভা, দিকে দিকে নাচে সবুজ সুষমা, ফুলে ফুলে পাখনা দুলিয়ে যায় প্রজাপতিরা, সরোবরে ঢল ঢল করে রোদে সোনালী জ্যোৎস্নায় রূপালী জল। জোড়াসাঁকোর বাড়ীর মত দক্ষিণ দিকে তেমনি প্রশস্ত দরদালান, আবার তিনিও সেখানে আগেকার মতই তেমনি বাগানের দিকে মুখ ক'রে আসনে আসীন হয়ে থাকেন। কিছুদিন আগে গিয়েও দেখেছি, ব'সে ব'সে কাগজের উপরে আঁকছেন একটি ছেলেখেলার কাঠের ঘোড়া।

কিন্তু আজ ব্যাধি ও বার্ধক্য তাঁর হাত করেছে অচল। একদিন

আমাকে কাতর স্বরে বললেন, "হেমেন্দ্র, বড় কষ্ট। আঁকতে চাই আঁকতে পারি না, লিখতে চাই লিখতে পারি না।" স্রষ্টা সৃষ্টি করতে পারছেন না ইচ্ছা সত্ত্বেও, মন তাঁর জাগ্রত, কিন্তু দেহ অন্তরায়, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য কল্পনা করা যায় না। পৃথিবীর জীবনযাত্রা, আলোছায়া রঙের খেলা তেমনি চলছে, শিল্পীই আজ কেবল নীরব, নিশ্চল দর্শক মাত্র।

অবনীন্দ্রনাথ এখন দূরে গিয়ে পড়েছেন, জীবন-সংগ্রামে আমারও অবসর হয়েছে বিরল, তাঁর কাছে গিয়ে প্রণাম করবার সৌভাগ্য হয় কালেভদ্রে কদাচ। সাহিত্যক্ষেত্রে চরণস্পর্শ ক'রে প্রণাম করেছি মাত্র দুইজন লোককে। তাঁরা হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ।

দুই

স্যর যদুনাথ সরকার

ভারতবাসীরা ইতিহাস রচনার জন্যে খ্যাতিলাভ করেনি। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস দুর্লভ। মুসলমানরা এদেশে এসে ইতিহাস রচনার দিকে দৃষ্টিপাত করেন বটে এবং তাঁদের দেখাদেখি অল্প কয়েকজন হিন্দুও কিছু কিছু ঐতিহাসিক রচনা রেখে গিয়েছেন। কিন্তু সে রচনাগুলি প্রায়ই নির্ভরযোগ্য ব'লে বিবেচিত হয় না।

এদেশে নিয়মিতভাবে ইতিহাস রচনার সূত্রপাত করেন পাশ্চাত্য লেখকরাই। যদিও সে সব হচ্ছে বিজেতার লিখিত বিজিত দেশের ইতিহাস, তবু তাদের মধ্যে পাওয়া যায় অল্পবিস্তর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং প্রচুর মূল্যবান তথ্য। এবং এ কথা বললেও ভুল বলা হবে না যে, বাঙালীরা ইতিহাস রচনা করতে শিখেছে ইংরেজদের কাছ থেকেই।

বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রথম গুরু বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের দিকে বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁর যুগেই বাঙালী লেখকরা বিশেষভাবে ইতিহাস রচনায় নিযুক্ত হন। কিন্তু আমাদের ইতিহাস রচনার প্রাথমিক প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য হয়েছিল ব'লে মনে হয় না। অনেকেরই সম্বল ছিল কেবল ইংরেজদের লিখিত ইতিহাস। অনেকের রচনা হচ্ছে অনুবাদ। অনেকে স্বাধীন চিন্তাশক্তির পরিচয় দিতে পারেন নি। অনেকের ভিতরে ছিল না সত্যকার ঐতিহাসিকসুলভ মনোবৃত্তি। অনেকে নন নিরপেক্ষ সমালোচক। অনেকে বিনা বা অল্প পরিশ্রমেই হ'তে চাইতেন ঐতিহাসিক।

বঙ্কিমোত্তর যুগে বাংলার ঐতিহাসিক সাহিত্য ধীরে ধীরে উন্নত হ'তে লাগল। কিন্তু সে উন্নতিকেও সর্বতোভাবে আশাপ্রদ বলা যায় না। সে সময়েও এমন ঐতিহাসিক ছিলেন, যিনি মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত ও গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে অভিন্ন ব্যক্তি ব'লে মনে করেছেন। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের নাম সুপরিচিত, কিন্তু

তিনি ইতিহাস রচনায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন নি এবং তাঁর রচনাও ভূরি ভূরি ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ। তাঁর সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয়ের নাম, কারণ মৌলিক গবেষণা করবার যথেষ্ট শক্তি তাঁর ছিল। কিন্তু সময়ে সময়ে তিনিও পরস্পরবিরোধী তথ্যগুলি ওজন ক'রে নিজের মত গঠন করতেন না; আগে একটি বিশেষ মত খাড়া ক'রে তার স্বপক্ষেই তথ্যের পর তথ্য সংগ্রহ ক'রে যেতেন, "সিরাজদ্দৌলা" গ্রন্থে তার একাধিক প্রমাণ আছে। । [illegible]লা চরিত্রের কালো দিকটা সাদা ক'রে দেখাবার জন্যে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। এমন একদেশদর্শিতা ঐতিহাসিকের পক্ষে অশোভন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাঙলার ইতিহাস" একখানি মূল্যবান গ্রন্থ বটে, কিন্তু তার মধ্যে প্রত্নতত্ত্বের প্রাধান্য আছে ব'লে সাধারণ পাঠকের পক্ষে তা সুখপাঠ্য হয় না। কেবল রাশি রাশি সাল-তারিখ, মুদ্রা, শিলা বা তাম্রলিপির মধ্যে প'ড়ে পাঠকের মন দিশাহারা হয়ে ওঠে, আখ্যানবস্তু খুঁজে পাওয়া যায় না। সত্য কথা বলতে কি, আমাদের মাতৃভাষায় আজ পর্যন্ত নিখুঁত ইতিহাস রচিত হয় নি।

মাতৃভাষায় যা হয় নি, ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে একজন বাঙালী ঐতিহাসিকের দ্বারা সেই দুরূহ কার্যটি সম্পাদিত হয়েছে। স্যর যদুনাথ সরকার হচ্ছেন বাংলা দেশের প্রথম ঐতিহাসিক, যিনি কেবল স্তূপীকৃত, রসহীন প্রমাণপঞ্জীর মধ্যে ছুটোছুটি করতে চান নি, কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর শিল্পীর মত সব রকম তথ্যই সংগ্রহ ক'রে এমন এক অপূর্ব রূপ দিয়েছেন যা একাধারে নিরপেক্ষ সমালোচনা এবং ইতিহাস এবং প্রামাণিক কথা-সাহিত্য। তিনি অলঙ্কারবহুল পল্লবিত ভাষা পরিহার ক'রেও রচনাকে নিরতিশয় সরস ক'রে তুলতে পারেন। বিস্ময়কর তাঁর সংযম। ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে এমন-ভাবে তিনি নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন, মন চমৎকৃত না হয়ে পারে না। কল্পনার সাহায্যে ঔপন্যাসিক করেন চরিত্র সৃষ্টি, তাঁর চরিত্র সৃষ্ট হয় বাস্তব ঘটনা অবলম্বন ক'রে। তাঁর পরিকল্পনার ইন্দ্রজালে ইতিহাসের মানুষগুলি বহু যুগের ওপার হ'তে আবার

জীবন্ত মূর্তি ধারণ ক'রে ফিরে এসে দাঁড়ায় বর্তমান কালে। তাঁর ইতিহাস-গ্রন্থাবলীর মধ্যে পাওয়া যায় কত উপন্যাস, কত নাটক ও কত গাথার উপাদান।

অদ্ভুত কর্মী পুরুষ এই স্যর যদুনাথ। তাঁর ধৈর্য, পরিশ্রম ও অনুসন্ধিৎসা সত্য সত্যই অসাধারণ। মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের ইতিহাস রচনা করতে কেটে গিয়েছে তাঁর পঞ্চাশ বৎসর। এই কাজে তাঁকে ইংরেজী, ফরাসী, পার্সী, সংস্কৃত, হিন্দী ও মারাঠী ভাষা থেকে অসংখ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে হয়েছে। এ সম্বন্ধে আর কোন ঐতিহাসিকই এমন বিপুল পরিশ্রম স্বীকার করেন নি। মোগল সাম্রাজ্যের বিশেষজ্ঞ হিসাবে ভারতে তিনি অদ্বিতীয়।

কিন্তু ঐতিহাসিক কেবল পরিশ্রমী হ'লেই চলে না। মুটের মত গলদঘর্ম হয়ে খাটবার লোকের অভাব হয় না। ঐতিহাসিককে তথ্য সংগ্রহের সঙ্গে করতে হয় গভীরভাবে মস্তিষ্কচালনা। রীতি-মত মাথা খাটিয়ে সংগৃহীত তথ্যগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে না পারলে ব্যর্থ হয় সমস্ত পরিশ্রম। তথ্যের থাকে দুটি দিক—স্বপক্ষে ও বিপক্ষে। এই দুটি দিক দিয়ে তথ্যগুলিকে ওজন ক'রে দেখতে হয়—এখানে ঐতিহাসিককে হ'তে হবে প্রথম শ্রেণীর অনপেক্ষ সমালোচক। অ্যাবট সাহেব ছিলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পক্ষপাতী জীবনীকার। কিন্তু তাঁর লিখিত বিশাল গ্রন্থের মধ্যে প্রকৃত নেপোলিয়নকে দেখতে পাওয়া যায় না। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ও সিরাজ-জীবনী রচনা করেছেন সিরাজের বিরুদ্ধে যে-সব ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়, সে দিকে না তাকিয়েই। কিন্তু স্যর যদুনাথ এ শ্রেণীর ঐতিহাসিক নন। তাঁর প্রকাণ্ড গ্রন্থ "ঔরংজেবের ইতিহাস" ও শিবাজীর জীবনচরিত পাঠ করলেই সকলে বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন, প্রত্যেক ঐতিহাসিক চরিত্রকেই তিনি চারিদিক থেকে দেখতে চেষ্টা করেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। তিনি কোন তথ্য ব্যবহার করেছেন গুণ দেখাবার জন্যে এবং দোষ দেখাবার জন্য ব্যবহার করেছেন কোন তথ্য। আবার বহু তথ্যকে পরিত্যাগ করেছেন। লোভনীয় হ'লেও অবিশ্বাস্য ব'লে।

স্যর যদুনাথের সমগ্র জীবন কেটে গিয়েছে শিক্ষাব্রত ও

ইতিহাস-চর্চার ভিতর দিয়ে। রাজসাহী জেলায় ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। বাইশ বৎসর বয়সে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে তিনি ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষা দেন এবং সর্বপ্রথম স্থান অধিকার ক'রে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। লাভ করেন সুবর্ণ পদক ও বৃত্তি। তারপর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ ক'রে কলকাতায়, পাটনায়, বেনারসে ও কটকে বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস-চ্যান্সেলারের পদে অধিষ্ঠিত হন।

অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে ঐতিহাসিক সাধনা। ছাত্র-জীবন সাঙ্গ ক'রেই সর্বপ্রথমে রচনা করেন টিপু সুলতান সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর আরো অনেক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর সর্বপ্রথম স্মরণীয় দান হচ্ছে পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত "ঔরংজেবের ইতিহাস"। এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে সাজাহানের অর্ধেক রাজত্বকালের ও ঔরংজেবের সমগ্র জীবনকালের কথা। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে আছে সাজাহানের রাজত্বকাল ও উত্তরাধিকারের জন্যে যুদ্ধ। তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে ১৬৫৮ থেকে ১৬৮১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর ভারতের কথা। চতুর্থ খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে ১৬৪৪ থেকে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের কথা। পঞ্চম খণ্ড ঔরংজেবের শেষজীবন নিয়ে রচিত হয়। ঐ গ্রন্থ পাঠ ক'রে ঐতিহাসিক বেভারিজ সাহেব তাঁকে "বাঙালী গিবন" ব'লে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি "শিবাজী ও তাঁর যুগ" রচনা ক'রে পেয়েছিলেন বোম্বাইয়ের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি থেকে স্যার জেমস ক্যাম্পবেল সুবর্ণ পদক। "মোগল সাম্রাজ্যের নিম্নগতি ও পতন" হচ্ছে তাঁর আর একখানি বিরাট গ্রন্থ। এছাড়া তিনি আরো কয়েকখানি উপভোগ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে আরভিনের "লেটার মোগলস" (দুই খণ্ড), "হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল" (দ্বিতীয় খণ্ড) ও "আইন-ই-আকবরি"। তাঁর রচিত বাংলা প্রবন্ধও আছে, তবে সংখ্যায় সেগুলি বেশী নয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ইংরেজীতে তিনি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রচনা ভাষান্তরিত করেছেন। তাঁর ইংরেজী রচনা সমালোচকদের প্রশংসা পেয়েছে। আজ

তাঁর বয়স তিরাশী বৎসর। কিন্তু আজও তাঁর মনীষা, মস্তিষ্ক চালনার শক্তি ও কর্মতৎপরতা অটুট আছে। চিরদিনই তিনি মৌলিক গবেষণার পক্ষপাতী। বয়স হয়েছে ব'লে অলস হয়ে বসে থাকতে ভালোবাসেন না। এখন গত ষাট-বাষট্টি বৎসরের ঐতিহাসিক গবেষণা নিয়ে তুলনামূলক আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে আছেন।

আমাদের অধিকাংশ ঐতিহাসিক টেবিলের সামনে চেয়ারাসীন হয়ে পুঁথিপত্রের মধ্যেই কালযাপন করেন। কিন্তু যে যে দেশের ইতিহাস বা ঐতিহাসিক ঘটনার কথা বলবেন, স্যর যদুনাথ স্বয়ং বার বার সেই সব দেশে গিয়ে স্বচক্ষে ঘটনাস্থল পরিদর্শন না করলে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন না। মহারাষ্ট্র প্রদেশে গিয়েছেন উপর উপরি পঞ্চাশবার। ঔরংজেব যেখানে যেখানে গিয়ে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়েছেন, বার বার সেই সব স্থান নিজের চোখে দেখে এসেছেন। এই রকম দেশভ্রমণের ফলে তাঁর দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছে বহু নূতন নূতন তথ্য। নানা জায়গা থেকে তিনি সংগ্রহ ক'রে এনেছেন ঔরংজেব ও তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিদের পাঁচ হাজার পত্র।

যাঁরা সস্তায় কিস্তিমাৎ ক'রে নাম কিনতে চান, তাঁদের উপরে স্যর যদুনাথের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। গায়ে হাওয়া লাগিয়ে দুই-চারখানা ইংরেজী কেতাব প'ড়ে যা হোক কিছু একটা খাড়া ক'রে দিলেই চলে না। তিনি জীবনব্যাপী সাধনা করেছেন হঠযোগীর মত। মাত্র দুই তিনটি পংক্তির জন্যে তাঁকে রাশি রাশি প্রমাণ সংগ্রহ করতে হয়েছে, হয়েতো কেটে গিয়েছে দিনের পর দিন। যত দিন না নিজের ধারণা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, ততদিন গভীর চিন্তায় নিযুক্ত থাকতে হয়েছে। লোকপ্রিয়তা অর্জন করবার জন্যে কোনদিন তিনি সত্যকে বিকৃত বা অতিরঞ্জিত করতে যাননি। অথচ যা করেছেন, সহানুভূতির সঙ্গেই করেছেন, কোনরকম বিরুদ্ধ ভাবের আশ্রয় নেননি।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দ। মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাবের আমন্ত্রণে সে বৎসরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশন হয় বর্ধমানে। সাহিত্য সম্মিলনীতে এত ঘটা আর কখনো দেখিনি। এই রেশনের ও দুর্ভিক্ষের যুগে সেদিনকার রাজকীয় ভূরিভোজনের আয়োজনকে গতজন্মের স্বপ্ন ব'লে মনে হয়। সে রকম সব খাবারও আর তৈরি

হয় না এবং সে রকম সব খাবার খাওয়াবার শক্তি বা সুযোগও আজ আর কারুর নেই। *সম্মিলনীর প্রধান সভাপতি ছিলেন হরপ্রসাদ* শাস্ত্রী এবং ইতিহাস শাখায় সভাপতিত্ব করেছিলেন স্যার যদুনাথ সরকার। তাঁর সঙ্গে প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় হয় সেইখানেই। স্যার যদুনাথ বাংলা ভাষায় একটি অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন। তাঁর বাংলা রচনা তাঁর ইংরেজীর মত চোস্ত ও মধুর না হ'লেও প্রাঞ্জল।

তারপর তাঁর সঙ্গে বার বার দেখা হয়েছে এম. সি. সরকার এণ্ড সন্সের পুস্তকালয়ে। ও'রা তাঁর প্রকাশক ও আত্মীয়। অল্পস্বল্প আলাপও করেছি মাঝে মাঝে। মৃদুভাষী মানুষ তিনি, প্রকৃতি গম্ভীর ব'লে মনে হয়। কোন রকম "পোজ" বা ভঙ্গিধারণের চেষ্টা নেই। চেহারা ও সাজপোষাক এত সাদাসিদা যে, কেউ বুঝতেই পারে না তিনি কত বড় পণ্ডিত ও অনন্যসাধারণ মানুষ। জনতার ভিতরে তিনি অনায়াসেই হারিয়ে যেতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলাপ করলে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনুভব করা যায়।

প্রাচীন বয়সে নিয়তির কাছ থেকে তিনি সদয় ব্যবহার লাভ করেন নি। তাঁর চার পুত্র, ছয় কন্যা। তাঁদের মধ্যে বর্তমান আছেন কেবল তিনটি মেয়ে, একটি ছেলে। একটি মেয়ে বিলাতে পড়তে গিয়ে অজ্ঞাত কারণে আত্মঘাতী হন এবং তার কিছুকাল পরেই কলকাতার গত দাঙ্গার সময়ে তাঁর এক পুত্র আততায়ীর হস্তে মারা পড়েন। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও এবং মাথার উপরে কিঞ্চিদধিক আশী বৎসরের ভার নিয়েও স্যার যদুনাথ ভেঙে পড়েন নি, অবিচল ভাবে সহ্য করেছেন এই সব চরম দুর্ভাগ্যের আঘাত।

তিন

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনসন্ধ্যায় কবি করুণানিধান লাভ করেছেন জগত্তারিণী পদক। পদক বা উপাধি দিয়ে প্রমাণিত করা যায় না কোন কবির শ্রেষ্ঠতা। তবে রসিকজনসমাজে কবি যে উপেক্ষিত হননি, এইটুকুই বোঝা যেতে পারে। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও একাধিক কবি ঐ পদক লাভ না ক'রেই ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন। এজন্যে তাঁদের উচ্চাসনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়নি, কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে আমাদের গুণগ্রাহিতারই অভাব।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট অবজ্ঞাপ্রকাশ ক'রে বলেছিলেন, "ইংরেজরা হচ্ছে দোকানদারের জাত।" কিন্তু একসময়ে ইংলণ্ড ছিল কবিদের দেশ ব'লে বিখ্যাত। নেপোলিয়নের যুগে ফরাসীদেশে যে সব কবি ছিলেন, তাঁদের নাম আর শোনা যায় না। কিন্তু ইংলণ্ডের কাব্যকুঞ্জ মুখরিত হয়ে উঠেছিল (বার্ণস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, সাদে, ব্লেক, বাইরণ, শেলি ও কীটস প্রভৃতি) কবিদের কলসঙ্গীতে।

ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশও বরাবর কবিদের দেশ ব'লে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। রাজ্যবিপ্লব বা রাজনৈতিক পরিবর্তনের যুগেও বাঙালী কবিদের গান স্তব্ধ হয় নি। বাংলা দেশের শেষ স্বাধীন রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভায় সর্বদাই শোনা যেত কাব্যগুঞ্জন। বাংলার উপরে যখন ইসলামের পূর্ণ-প্রভাব, তখনও বাংলার আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল বৈষ্ণব কবিদের বীণার ঝঙ্কারে। তারপর আবার পলাশীর প্রান্তরে হ'ল যখন আর এক বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয়, তখনও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় কবিদের আসন শূন্য থাকে নি।

ইংরেজ আমলের নূতন বাংলায় দেখি কবি ঈশ্বর গুপ্তকে। তাঁর আগেই কবি রামনিধি গুপ্ত কাব্যসঙ্গীত রচনায় নিযুক্ত

হয়েছিলেন এবং কবিত্বের দিক দিয়ে তা ছিল ঈশ্বর গুপ্তের রচনার চেয়ে উচ্চতর। কিন্তু কেবল কবিরূপে নয়, সাহিত্যাচার্যরূপেই ঈশ্বর গুপ্ত অর্জন করেছিলেন সমধিক খ্যাতি। বিলাতে লেখক জনসনকে নিয়ে কেউ আজ মাথা ঘামায় না, কিন্তু সাহিত্যাচার্য ডাঃ জনসন হয়েছেন অক্ষয় যশের অধিকারী। ঈশ্বর গুপ্তও ঐ কারণেই অমর হয়ে থাকবেন। কেবল বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু মিত্র নয়, সে যুগের সমস্ত নবীন কবিদের উপরেই যে তাঁর প্রভাব ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি থেকেই এটা আমরা জানতে পারি। তারপর একে একে দেখা দিলেন মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার—বিহারীলাল চক্রবর্তী ও কামিনী রায় প্রভৃতি।

এল গৌরবময় রবীন্দ্র-যুগ। কিন্তু এ-যুগে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলেও আরো যে-সব উচ্চশ্রেণীর কবির নাম করা যায়, তাঁদের মধ্যে প্রধান তিনজন হচ্ছেন দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। সেইসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, গোবিন্দচন্দ্র দাস, রমণীমোহন ঘোষ, প্রমথনাথ রায় চৌধুরী ও রজনীকান্ত সেন প্রভৃতিকেও ভুললে চলবে না এবং বলা বাহুল্য, এই ফর্দ সম্পূর্ণ নয়; উল্লেখযোগ্য পুরুষ ও মহিলা কবি ছিলেন আরো কয়েকজন।

তারপরেও ধারা ঠিক বজায় রইল। পূর্ববর্তী কবিদের জীবদ্দশাতেই রবীন্দ্রনাথকে গুরুর আসনে বসিয়ে দেখা দিলেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীকালিদাস রায় ও শ্রীমোহিতলাল মজুমদারও তাঁদের সমসাময়িক—দেখা দিয়েছেন কেউ কিছু আগে বা কেউ কিছু পরে। আসল কথা, বাঙালী কবিদের শোভাযাত্রা অব্যাহত হয়েই আছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা!
শত শত গীত-মুখরিত বন-বীথিকা।"

করুণানিধান সম্বন্ধে একজন লিখেছেনঃ "ইনি পঞ্চকোট পাহাড়ের উপরে আদরা ষ্টেশনের কাছে 'শৈলকুটীর' নামে একটি আশ্রম নির্মাণ করেন। এইখানেই ইঁহার কবিতার প্রথম বিকাশ।"

শৈল সানুদেশে অনন্ত নীলিমার তলায় নিরালা পর্ণকুটীর, চোখের সামনে হয়তো জাগত প্রান্তরবাহিনী রবিকরোজ্জ্বলা নটিনী তটিনী, শ্রবণে হয়তো ভেসে আসত বিজন কান্তারের অশ্রান্ত মর্মরসঙ্গীত। এই প্রাকৃতিক পটভূমিকার উপরে তরুণ কবির চিত্ত-শতদল ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে ওঠবারই কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় করুণানিধানের প্রথম জীবনের কোন খবরই আমি রাখি না, কারণ আমি ভূমিষ্ঠ হবার প্রায় এক যুগ আগেই তিনি দেখেছিলেন পৃথিবীর আলোক। পরে কবির সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছিলুম বটে, কিন্তু তিনি তাঁর পূর্বজীবনের কথা নিয়ে কোনদিন আমার সঙ্গে ঘুণাক্ষরেও আলোচনা করেন নি। এমন অনেক কবি ও লেখক দেখেছি, যাঁদের কাছে হচ্ছে নিজের কথাই পাঁচ কাহন। তাঁদের এই অশোভন আত্মপ্রকাশের অতি-আগ্রহ যে শ্রোতাদের শ্রবণ-যন্ত্রকে উত্যক্ত ক'রে তুলছে, এটা উপলব্ধি করলেও তাঁরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না। করুণানিধান এ দলের লোক নন। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হয়, তিনি যেন নিজেকে একজন উঁচু দরের কবি ব'লেই জানেন না। বীণা তো জানে না, সে হচ্ছে স্বর্গীয় সঙ্গীতের স্রষ্টা, সে কথা জানে কেবল বীণাবাদক। কবি করুণা-নিধানও হচ্ছেন বাণীর হাতের বীণাযন্ত্রের মত।

যতদূর স্মরণ হয়, করুণানিধান যখন উদীয়মান, সত্যেন্দ্রনাথ তখনও কাব্যজগতে প্রকাশ্যভাবে দেখা দেন নি। তবে যতীন্দ্রমোহন বাগচী সুপরিচিত হয়েছিলেন তাঁর আগেই। সর্বপ্রথমে 'বঙ্গমঙ্গল" নামে একখানি ছোট কবিতার বই প'ড়ে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় করুণানিধানের দিকে। রবীন্দ্রনাথের নব পর্যায়ের "বঙ্গদর্শন" তখনও বোধ হয় চলছিল। তারপর "প্রসাদী" (সে বইখানিও আকারে বড় নয়) পাঠ ক'রে আমি তাঁর ভক্ত হয়ে পড়লুম।

মৃত্যুশয্যাশায়ী কবি রজনীকান্ত যখন রোগযন্ত্রণাগ্রস্ত দেহ

থেকে নিজের চিত্তকে বিযুক্ত ক'রে অতুলনীয় কাব্যসাধনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন, সেই সময়েই একদিন কবি মোহিতলালের সঙ্গে গিয়ে করুণানিধানের সঙ্গে পরিচিত হলুম। সে হচ্ছে ১৩১৬ কি ১৩১৭ সালের কথা। হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ দিকে ছিল স্বর্গীয় পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এডওয়ার্ড ইনষ্টিটিউশনের বাড়ী—স্কুলের অস্তিত্ব তখন ছিল কি ছিল না বলতে পারি না। দোতালার বারান্দায় হুঁকো নিয়ে উবু হয়ে ব'সে করুণানিধান ধূমপান করছিলেন। বয়সে তখন তিনি যৌবনসীমা পার হননি, কিন্তু বয়সোচিত কোন সৌখীনতার লক্ষণই তাঁর মধ্যে খুঁজে পেলুম না। শ্যামবর্ণ দীর্ঘ একহারা দেহ, পরনে ইস্ত্রিহীন ছিটের কোট ও আধময়লা কাপড়। মাথায় অযত্ন বিন্যস্ত চুল, মুখে দাড়ী-গোঁফের ভিতর দিয়ে থেকে থেকে ফুটে ওঠে সরল, মিষ্ট, মৃদু হাসি। দৃষ্টি ও চেহারা অত্যন্ত নিরভিমান। কবি নয়, নিরীহ ও সাধারণ স্কুলমাষ্টারের চেহারা এবং কলকাতার সহরতলীতে তখন তিনি সত্য সত্যই কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদে বাহাল ছিলেন।

এমন মানুষের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুলতে বিলম্ব হয় না। তারপর তাঁর সঙ্গে দেখা হ'তে লাগল ঘন ঘন। কখনো অমূল্যবাবুর বাড়ীতে, কখনো তাঁর নিজের বাড়ীতে। দু-একবার তিনি আমার বাড়ীতেও এসে হাজির হয়েছেন। সর্বদাই আত্মভোলা ভাবুকের ভাব, অথচ দৃষ্টি দেখলে মনে হয় যেন তা অন্তর্মুখী, যেন তিনি মনে মনে খুঁজে বেড়াচ্ছেন কোন হারিয়ে-যাওয়া রূপের স্বপ্ন। তাঁর কবিতাগুলিই প্রমাণিত করবে, তিনি ছিলেন নিছক সৌন্দর্যের পূজারী, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দারিদ্র্য ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ করতে পারতেন না। কেবল তাঁর জামাকাপড়ই অত্যন্ত স্থূল ও আটপৌরে ছিল না, তাঁর বসতবাড়ীতেও ছিল না সাজসজ্জা বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কোন বালাই। কিন্তু চিত্ত যার রূপগ্রাহী, ধূলিশয্যায় শয়ন ক'রেও সে দৃষ্টি নিবন্ধ ক'রে রাখতে পারে উদার আকাশের নির্মল নীলিমার দিকে।

করুণানিধানের সঙ্গে মন খুলে মেলামেশা করেছি যে কতদিন, তার আর সংখ্যা হয় না। তিনি কেবল নির্বিরোধী ও কোনরকম

দলাদলির বাইরে ছিলেন না, তাঁর মনও ছিল ঈর্ষা থেকে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত। একদিনও তাঁকে অন্য কবির বিরুদ্ধে একটিমাত্র কথা বলতে শুনি নি, অধিকাংশ কবিই যে দুর্বলতা দমন করতে পারেন না।

করুণানিধানের প্রথম জীবনের বন্ধু স্বর্গীয় সাহিত্যিক চারুচন্দ্র মিত্র একদিন আমাকে বললেন, "করুণার কাছ থেকে বাংলাদেশের এক বিখ্যাত কবি (তাঁর নাম এখানে করলুম না) তাঁর নূতন কবিতার খাতা পড়বার জন্যে চেয়ে নিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে খাতাখানা আবার ফিরে এল বটে, কিন্তু তাঁর রচনাগুলি ছাপা হবার আগেই দেখা গেল, সেই বিখ্যাত কবির নবপ্রকাশিত কবিতাগুলির মধ্যে রয়েছে করুণার নিজের উদ্ভাবিত সব বাক্য।" সাহিত্যক্ষেত্রে রচনাচৌর্যের দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। আমাকেও এজন্যে একাধিকবার বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়েছে, কিন্তু তবু আমি উচ্চবাচ্য করিনি এবং এ শিক্ষা লাভ করেছি আমি করুণানিধানের কাছ থেকেই। ঐ বিখ্যাত কবি ছিলেন আমাদের দুজনেরই বন্ধু। কিন্তু করুণানিধানের নিজের মুখ থেকে তাঁর ঐ কবিবন্ধুর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই শ্রবণ করি নি।

করুণানিধান কবিতা, তার আদর্শ বা তার রচনা-পদ্ধতি প্রভৃতি নিয়ে বড় বড় ও ভারি ভারি বচন আউড়ে কোনদিন আসর গরম করবার চেষ্টা করেন নি। ও-সব বিষয়ে তাঁর একান্ত মৌনব্রত দেখে যে কোন ব্যক্তি সন্দেহ করতে পারত যে, উচ্চশ্রেণীর কাব্যকলা সম্বন্ধে হয়তো তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁকে একান্তে পেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠের কাছে তরুণ শিক্ষার্থীর মত আমি কাব্যকলা-কৌশল সম্বন্ধে যখন প্রশ্ন করতুম, তখন তিনি সে সব প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পারিতেন না এবং সেই সব উত্তরের মধ্যেই থাকত কবিতার আর্ট ও ছন্দ সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য। এইজন্যে আজও তাঁর কাছে আমার ঋণ স্বীকার করতে পারি অকুণ্ঠ কণ্ঠেই।

এবং তিনি যে কত বড় কাব্যকলাবিদ, তাঁর কবিতাবলীর মধ্যেই আছে তার অজস্র প্রমাণ। "প্রসাদী"র পর যখন তাঁর নূতন কবিতার পুঁথি "ঝরাফুল" প্রকাশিত হ'ল, রসিকসমাজ তখনই পেলেন

করুণানিধানের প্রতিভার প্রকৃত হদিস। তখনকার সাহিত্যিকদের মধ্যে রীতিমত সাড়া প'ড়ে গিয়েছিল। সেটা বোধ করি ১৩১৮ সাল। "ঝরাফুল" পাঠ ক'রে ধুরন্ধর কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন মতপ্রকাশ করেছিলেনঃ

"অমর কবি মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্যের মত এ কাব্যখানি মাধুর্যে পরিপূর্ণ। কবির যেমন শব্দসম্পদ, তেমনই ভাববৈভব। কবি প্রকৃতি দেবীর অপূর্ব উপাসক। এ পূজায় কৃত্রিমতা নাই। মাতাল যেমন মদিরা পানে উন্মত্ত হইলে নিজ শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখে না, এ কবিও তেমনি প্রকৃতি-দেবীর সৌন্দর্যসুধা পান করিয়া বিভোর হইয়া যান—প্রকৃত সাধক-জনোচিত তন্ময়তা লাভ করেন। এই আত্মবিস্মৃতিই উচ্চ অঙ্গের কাব্যের একটি অপরিহার্য লক্ষণ। এইজন্যই কোন সুবিখ্যাত মহাত্মা বলিয়াছেন— "Oratory is heard, but Poetry is overheard." * * এ কবিতাসুন্দরী দর্শন দিবামাত্রই চিত্ত হরণ করে। ইহাকে দেখিলেই হৃদয়ে এক অননুভূত আনন্দের উদয় হয়। এ মোহিনী আদিনারী Eve সুন্দরীর মত লাবণ্যবতী। প্রথম দর্শনে চিত্ত বিস্ময়ে অভিভূত হয়। 'মহিলা' কাব্যের কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মত বলিয়া উঠিতে ইচ্ছা করে—

এলোকেশে কে এল রূপসী?
কোন্ বনফুল, কোন গগনের শশী?"

"ঝরাফুলে"র মালা শুকিয়ে যায় নি, সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পরে আজও তা নিয়ে নাড়াচাড়া করলে চিত্ত পরিপূর্ণ হয়ে যায় সৌরভের গৌরবে। এই কাব্যগ্রন্থখানিই নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন করলে যে, বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে করুণানিধানও হচ্ছেন অন্যতম। তারপর প্রকাশিত হয় তাঁর "শান্তিজল", "ধানদুর্বা" ও "রবীন্দ্র-আরতি" প্রভৃতি। এগুলি তাঁর কণ্ঠহারের আরো কয়েকটি রত্ন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠিকই ধরেছেন। করুণানিধান হচ্ছেন "প্রকৃতিদেবীর অপূর্ব উপাসক। এ পূজায় কৃত্রিমতা নাই।" প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে প্রত্যেক কবিই আকৃষ্ট হন অল্পবিস্তর মাত্রায়। কিন্তু সে আকর্ষণের মধ্যে আছে যথেষ্ট পার্থক্য। অনেকেই আর্টের কৃত্রিমতা

দ্বারা স্বভাবকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেন, স্বভাব হয় না স্বতঃস্ফূর্ত। এখানে স্বভাব বলতে আমি বোঝাতে চাই নিসর্গকেই। করুণানিধানের কাব্যে যে নিসর্গ-শোভা ফুটে ওঠে, তার মধ্যে পাওয়া যায় কবির স্বাভাবিক রক্তের টান ও নাড়ীর স্পন্দন। তাঁকেই বলি সত্যিকার স্বভাবকবি। এবং ছোটখাটো খুঁটিনাটির ভিতর দিয়ে বৃহত্তর প্রকৃতির শব্দস্পর্শগন্ধ ও রূপরসছন্দ প্রকাশ করবার জন্যে তিনি ভাবুকের মত বেছে বেছে যে সব শব্দ উদ্ভাবন করেন, তার মধ্যেও থাকে খাঁটি কলাবিদের হাতের ছাপ। বাংলার কাব্যজগতে তাঁর মত নিসর্গ-চিত্রকর সুলভ নয়।

কবিবর দেবেন্দ্রনাথ আত্মবিস্মৃতিকে উচ্চাঙ্গ কাব্যের অপরিহার্য লক্ষণ বলেছেন। কিন্তু কেবল কাব্যে নয়, করুণানিধানের ব্যক্তিগত জীবনেও যে আত্মবিস্মৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, সাধারণের কাছে তা কৌতুকপ্রদ ব'লে মনে হ'তে পারে। কবির (এবং আমারও) বন্ধু পূর্বোক্ত চারুবাবু আর একদিন আমাকে বলেছিলেন, "করুণার কাণ্ডের কথা শুনেছেন? সেদিন দেখি সে আনমনার মত হেদোর চারিদিকে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর মাঝে মাঝে হেঁট হয়ে রাস্তা থেকে কি সব কুড়িয়ে নিচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখলুম তার কোটের পকেট রীতিমত ফুলে উঠেছে। পকেট হাতড়ে পাওয়া গেল একরাশ ঢিল, পাটকেল, নুড়ি।" এমন অবোধ শিশুর মত সরলতা বোধ হয় আর কোন বাঙালী কবির মধ্যে আবিষ্কার করা যাবে না।

করুণানিধানের সঙ্গে দেখা হয়নি সুদীর্ঘকাল। কার্য থেকে অবসর নিয়ে তিনি চ'লে গিয়েছিলেন স্বগ্রাম শান্তিপুরে, তাঁর প্রিয় মুখ দেখবার সৌভাগ্য থেকে আমাদের বঞ্চিত ক'রে এবং ততোধিক দুঃখের বিষয় এই যে, জরাজর্জর হবার আগেই ক্রমে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়েছে তাঁর কাব্যরচনার প্রেরণা। পনেরো কি বিশ বৎসরের মধ্যে কদাচিৎ তাঁর দু-একটি রচনা চোখে পড়েছে, কিন্তু সেগুলির মধ্যে "ঝরাফুল" প্রণেতার শীলমোহর খুঁজে পাই নি। কবি আছেন, কিন্তু কবিতা নেই। দুর্ভাগ্য।

চার

গামা, হাসানবক্স, ছোট গামা

এবার আমরা প্রবেশ করব মল্লসভার মধ্যে। কিন্তু মাভৈঃ, আপনাদের কারুকে আমি 'বীরমাটি' মাখবার জন্যে আহ্বান করব না। 'বীরমাটি' কাকে বলে জানেন তো? আখড়ায় যে-মৃত্তিকাচূর্ণের উপরে দাঁড়িয়ে পালোয়ানেরা কুস্তি লড়ে। সেই মাটি গায়ে মর্দন করে যোদ্ধারাই।

স্রষ্টা আমার দেহখানিকে যৎপরোনাস্তি একহারা ক'রে গ'ড়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন পৃথিবীতে। কিন্তু ভ্রমক্রমে আমার মনকে দেহের উপযোগী ক'রে গঠন করেন নি। শেষ পর্যন্ত মসীজীবী লেখক হয়েই জীবনসন্ধ্যায় বিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করতে বাধ্য হয়েছি বটে, কিন্তু আমার বুকের মধ্যে যে মনের মানুষটি বাস করে সকলের অগোচরে, চিরদিনই সে আসীন হ'তে চেয়েছে কাপালিকের বীরাসনে। সত্য বলছি, অত্যুক্তি নয়।

অবশ্য তালপাতার সেপাইরাও দিবাস্বপ্ন দেখে এবং পুরু গদীর উপরে নিশ্চেষ্টভাবে তাকিয়া আঁকড়ে ব'সে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করে। আমি কিন্তু কোনকালেই তাদের দলের লোক নই। ছেলেবেলা থেকেই নামজাদা ক্লাবের হয়ে ক্রিকেট-হকি-ফুটবল খেলেছি, সাঁতার দিয়ে গঙ্গার এপার-ওপার হয়েছি, জিমনাষ্টিক নিয়ে মেতেছি, 'গ্রিপ-ডাম্বেল' ও মুগুর ভেঁজেছি, 'চেষ্ট-এক্সপ্যাণ্ডার' ও 'বার-বেল' ব্যবহার করেছি এবং ডন-বৈঠক দিয়েছি। অর্থাৎ বলীদের মধ্যে একটা কেও-কেটা হবার জন্যে চেষ্টার কোন ত্রুটিই করি নি। চোখের সামনেই ব্যায়াম ক'রে কত একহারা ছোকরা দেখতে দেখতে দোহারা, তারপর তেহারা হেয় উঠল, আমি কিন্তু বরাবরই হয়ে রইলুম মূর্তিমান ভদ্রলোকের-এককথার মত একেবারেই একহারা। নাট্যকার অমৃতলাল যাকে "ভীম ভবানী" উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন, বাল্যকালে বিদ্যালয়ে সে আমার সহপাঠী ছিল। সে তখনও আমার মত একহারা

ছিল না বটে কিন্তু সেই দেহের তুলনায় পরে তার যে চেহারা হয়েছিল, তা অবিশ্বাস্য বলা যেতেও পারে। তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালে নিজেকে মনে হ'ত যেন মাতঙ্গের পাশে পতঙ্গ।

বলবান লোকদের দেখবার জন্যে বরাবরই আমার মনের ভিতরে আছে উদগ্র আগ্রহ। বাল্যকাল থেকেই এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় নানা আখড়ায় কুস্তি লড়া দেখতে যেতুম। কোথাও দঙ্গলের ব্যবস্থা হয়েছে শুনলে সেখানে যাবার প্রলোভন কিছুতেই সংবরণ করতে পারতুম না। বহুকাল (অর্দ্ধ শতাব্দীরও) আগে কলকাতার মার্কাস স্কোয়ারে কাল্লুর সঙ্গে কিঙ্কর সিংয়ের কুস্তি প্রতিযোগিতা হয়। তখন গামার নাম কেউ জানত না, কিন্তু কাল্লু ও কিঙ্কর ছিলেন ভারতবিখ্যাত। টিপে টিপে মায়ের পা ব্যথা ক'রে দিয়ে কত খোসামোদের ও অশ্রুত্যাগের পর যে সেই কুস্তি দেখবার জন্যে অর্থ সংগ্রহ করেছিলুম, তা আজও আমার স্মরণ আছে।

কিঙ্করের চেহারা ছিল যেমন কুৎসিত, তেমনি ভয়াবহ। মাথায় তিনি সাড়ে ছয় ফুটের চেয়ে কম উঁচু ছিলেন না এবং চওড়াতেও তাঁর দেহ ছিল যে কতখানি, বললে সে কথা কেউ বোধ হয় বিশ্বাস করবেন না (বিশেষজ্ঞের মুখে শুনেছি, তাঁর বুকের ছাতির মাপ ছিল আশী ইঞ্চি—যে কথা শুনলে স্যাণ্ডো সাহেবও নিশ্চয় বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে পারতেন না)। আমি অনেক বড় বড় পালোয়ান দেখেছি, কিন্তু লম্বায়-চওড়ায় তাঁদের কেউই কিঙ্কর সিংয়ের সমকক্ষ নন। কাল্লুও ছিলেন বিপুলবপু, কিন্তু তাঁর বিপুলতা কিঙ্করের সামনে মোটেই দৃষ্টি আকর্ষণ করত না। কাল্লু যে কিঙ্করকে হারাতে পারবেন, দেখলে তা কিছুতেই মনে করা যেত না। বর্তমান নিবন্ধমালায় স্বর্গীয় গুণীদের নিয়ে আলোচনা করবার কথা নয়, অতএব আমি সে মল্লযুদ্ধের বর্ণনা দিতে চাই না। কেবল এইটুকুই ব'লে রাখলেই যথেষ্ট হবে যে, ডেভিডের কাছে গোলিয়াথের মত কাল্লুর কাছে কিঙ্করও হয়েছিলেন পরাভূত।

তার কয়েক বৎসর পরে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চের উপরে আমি যে মহাবলবান মানুষটিকে দেখি, বিশেষ কারণে এখানে তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। কারণ তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা লাভ ক'রেই ভারতের

দেশে দেশে—এমন কি বাংলাতেও শত শত যুবক দৈহিক শক্তিচর্চায় একান্তভাবে অবহিত হয়েছে। আমি রামমূর্তির কথা বলছি। তিনি শারীরিক শক্তির যে সব অভাবিত পরিচয় দিয়েছিলেন, সেদিন সকলেরই কাছে তা ইন্দ্রজালের মতই আশ্চর্য ব'লে মনে হয়েছিল। তারপরে অনেকেই তাঁর কয়েকটি খেলার নকল ক'রে নাম কিনেছেন ও কিনছেন বটে, কিন্তু তাঁর অধিকতর দুরূহ কয়েকটি খেলা আজও কেউ চেষ্টা ক'রেও আয়ত্তে আনতে পারেন নি। কারণ সে খেলাগুলির মধ্যে ফাঁকি বা প্যাঁচ ছিল না. রামমূর্তির মত অমিত শক্তির অধিকারী না হ'লে কারুরই সে সব খেলা দেখাবার সাধ্য হবে না। রামমূর্তির প্রদর্শনী ছিল কেবল বাহুবল দেখাবার জন্যে নয়, অর্থ উপার্জনের জন্যেও বটে। তাই কোন কোন খেলাতে তিনি দর্শকদের চমকে অভিভূত ক'রে দিতেন। কিন্তু যেখানে কৌশলের উপর থাকে প্রকৃত শক্তির প্রাধান্য, সেখানে রামমূর্তি আজও অদ্বিতীয় হয়ে আছেন।

আমি বাল্যকালেও দেখেছি, কলকাতার বহু বনিয়াদী ধনীর বাড়ীতে ছিল স্থায়ী কুস্তির আখড়া। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সম্পদের জন্যে বিখ্যাত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতেও ছিল পরিবারের ছেলেদের জন্যে নিয়মিত কুস্তি লড়বার ব্যবস্থা এবং কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকেও কুস্তি লড়ার অভ্যাস করতে হ'ত। হয়তো সেইজন্যেই তিনি লাভ করেছিলেন অমন সুগঠিত পুরুষোচিত দেহ। তাঁর পিতামহ "প্রিন্স" দ্বারকানাথ ছিলেন সৌখীন কুস্তিগীর।

কিন্তু বাঙালী নিজেকে যতই সভ্য ও শিক্ষিত ব'লে ভাবতে শিখলে, ব্যায়াম ও কুস্তি প্রভৃতিকে ততই ঘৃণা করতে লাগল। তার ধারণা হ'ল, ও-সব হচ্ছে নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর ব্যক্তির ও ছোটলোকের কাজ। অথচ যে-দেশ থেকে সে লাভ করেছে আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতা, সেই প্রতীচ্যের উচ্চ-নীচ সর্বসাধারণের মধ্যে পুরুষোচিত ব্যায়াম ও খেলাধুলার লোকপ্রিয়তা যে কত বেশী, সেদিকে একবারও দৃষ্টিপাত করা দরকার মনে করে নি। সবল ইংরেজের কাছে দুর্বল বাঙালী প'ড়ে প'ড়ে মার খেত, তবু তার হুঁশ হ'ত না।

কিন্তু তারও ভিতরে ছিল যে একটা subconscious বা

অব্যক্তচেতন মন, সেটা টের পাওয়া গিয়েছিল মোহনবাগান যেদিন ফুটবল খেলার মাঠে "শীল্ড ফাইন্যালে" প্রথম গোরার দলকে হারিয়ে দেয়। শত শত জ্বালাময়ী বক্তৃতাও যে বাঙালীর প্রাণে প্রেরণা সঞ্চার করতে পারে নি, একটি দিনের একটি মাত্র ঘটনায় তা হয়ে উঠল আশ্চর্যভাবে অতিশয় জাগ্রত। ইংরেজী সংবাদপত্রে সেই সময়ে এই গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ঃ মোহনবাগানের বিজয়-গৌরবে চারদিকে যখন সাড়া প'ড়ে গিয়েছে, তখন চৌরঙ্গীর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল দুই ব্যক্তি, তাদের একজন বাঙালী, আর একজন ইংরেজ। তারা পরস্পরের বন্ধু। বাঙালী পথিকটি বার বার এগিয়ে যাচ্ছে দেখে ইংরেজ সঙ্গীটি জিজ্ঞাসা করে, "তোমার আজ এ কি হ'ল বলতো? তুমি আমাকে বার বার পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছ কেন?" বাঙালী জবাব দেয়, "দেখছ না, আজ আমাদের জাতিই যে এগিয়ে চলেছে।" কথাগুলি আমার এতই ভালো লেগেছিল যে আজ পর্যন্ত ভুলতে পারিনি।

আজকাল বাতাস কিছু বদলেছে। কিছুকাল থেকে দেখছি বাঙালী যুবকরাও দেহচর্চায় মন দিয়েছে এবং ব্যায়ামের নানা বিভাগে দেখাচ্ছে অল্পবিস্তর পারদর্শিতা। আদর্শ দেহ গঠনে, পেশী শাসনে, ভারোত্তোলনে, মুষ্টিযুদ্ধে ও বাৎসরিক কুস্তি-প্রতিযোগিতায় বাঙালী যুবকদের কৃতিত্বের কথা শুনে এই প্রাচীন বয়সেও আমি তরুণের মত উৎফুল্ল হয়ে উঠি। কিন্তু এইখানেই যথেষ্ট হয়েছে ভেবে থামলে চলবে না—অগ্রসর হ'তে হবে, আরো অনেক দূরে অগ্রসর হ'তে হবে, শক্ত জাতি হিসাবে আমাদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে বিশ্বসভার মাঝখানে।

জ্ঞানে নয়, বিদ্যায় নয়, সভ্যতায় নয়, সংস্কৃতিতে নয়, কেবলমাত্র পশুশক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষের উপরে প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল মুসলমানরা। এবং আজ পর্যন্ত নিরক্ষর মুসলমানরাও কেবল দৈহিক শক্তিসাধনারই দ্বারা ভারতের অন্যান্য জাতিদের পিছনে ঠেলে শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে আছে। আজ ভারতের তথা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মল্ল কে? গামা এবং তার ছোট ভাই ইমাম বক্স। গামার বয়স বোধ করি এখন সত্তরের উপরে এবং

ইমামেরও ধাটের উপরে। কিন্তু এখনো গামা যে-কোন যুবক প্রতিদ্বন্দ্বীরও সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা করতে প্রস্তুত। বলেছেন, "যে আমার ছোট ভাই ইমামকে হারাতে পারবে, তার সঙ্গেই আমি লড়তে রাজি আছি।" কিন্তু ভারত বা য়ুরোপের কোন মল্লই তাঁর এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সাহসী নয়। গামা অপরাজেয় হয়েই রইলেন। তাঁর আগে গোলাম পালোয়ানও ছিলেন এমনি অতুলনীয়।

কেবলই কি গামা ও ইমাম? তাঁদের ঠিক নীচের থাকেই যাঁরা আছেন—যেমন হামিদা, গুঙ্গা, হরবন্স সিং, সাহেবুদ্দীন ও ছোট গামা প্রভৃতি আরো অনেকে (এখানে অকারণে সকলের নাম ক'রে লাভ নেই), তাঁদের মধ্যে এক হরবন্স সিং ছাড়া আর সকলেই মুসলমান।

সেটা ১৯১৬ কি ১৯১৭ খৃস্টাব্দ আমার ঠিক মনে নেই। আমি তখন কাশীধামে। গামা তখন ইংলণ্ডে গিয়ে জন লেম ও বড় বিস্কো প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশের শীর্ষস্থানীয় পালোয়ানদের হারিয়ে পৃথিবীজোড়া উত্তেজনা সৃষ্টি ক'রে দেশে ফিরে এসেছেন। দুইজন স্থানীয় বন্ধুর সঙ্গে দশাশ্বমেধ ঘাটে যাবার বড় রাস্তায় ভ্রমণ করছি, হঠাৎ বন্ধুদের একজন বললেন, "ঐ দেখুন, গামা পালোয়ান যাচ্ছেন।"

সাগ্রহে তাকিয়ে দেখলুম। পথ দিয়ে যাচ্ছেন কয়েকজন লোক, সকলেরই চেহারা বলিষ্ঠ। কিন্তু তাঁদের মধ্যে একজন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন মধ্যমণির মত। মাথায় পাগড়ী, গায়ে চুড়ীদার পাঞ্জাবী, পরনে লুঙ্গি, পায়ে নাগরা জুতো—পোষাকে আছে রং-বেরঙের বাহর। দাড়ী কামানো, মস্ত গোঁফ। দেহ অনাবৃত নয় বটে, কিন্তু বস্ত্রাবরণ ঠেলে তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে আসছে যেন একটা প্রবল শক্তির উচ্ছ্বাস। ভাবভঙ্গিও প্রকাশ করছে তাঁর বিশেষ বীর্যবত্তা। অসাধারণ চোখের দৃষ্টি ফুটিয়ে তোলে ব্যক্তিত্বকে। গামা চ'লে গেলেন, আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলুম। মন বললে, দেখলুম বটে এক পুরুষসিংহকে।

তার কয়েক বৎসর পরে গামাকে দেখি কলকাতায়। তারিখ সম্বন্ধে আমার একটা দুর্বলতা আছে। আমি বাল্যকালের সব কথাও হুবহু মনে রাখতে পারি, কিন্তু দশ-পনেরো বৎসর আগেকার কোন

বিশেষ তারিখ স্মরণ করতে পারি না। তবে মনে হচ্ছে অন্ততঃ বত্রিশ বৎসর আগে কলকাতায় গড়ের মাঠে তাঁবু ফেলে মস্ত এক কুস্তি-প্রতিযোগিতা হয়েছিল। ভারতের নানা প্রদেশ থেকে এসেছিলেন নামজাদা পালোয়ানরা—কেউ কুস্তি লড়তে, কেউ কুস্তি দেখতে। আমি একদিন সেই কুস্তির আসরে গিয়েছিলুম, গামার সঙ্গে হাসান বক্সের প্রতিযোগিতা দেখবার জন্যে। কিন্তু স্মরণ হচ্ছে অন্যান্য পালোয়ানদের কুস্তি হয়েছিল একাধিক দিবস ধ'রে।

আমি যেদিন যাই, সেদিন আমার সঙ্গে ছিলেন স্বর্গত বন্ধুবর শ্রীশচন্দ্র গুহ। তিনি ছিলেন কেম্ব্রিজের বক্সিং-এ "হাফ-ব্লু", পরে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে কিছুকাল প্র্যাকটিস ক'রে মালয়ে গিয়ে আইন ব্যবসায়ে যথেষ্ট নাম কেনেন এবং নেতাজীর "আই-এন-এ"র এক পদস্থ কর্মচারী হন। সেই অপরাধে ইংরেজরা তাঁকে বন্দী করে। পরে তিনি মুক্তিলাভ ক'রে আবার দেশে ফিরে আসেন। এই সেদিন তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

তাঁবুর ভিতরে বৃহতী জনতা। তার মধ্যে বাঙালী খুব কম, অধিকাংশই মুসলমান ও হিন্দুস্থানী—তারা চারিধারের গ্যালারি দখল ক'রে ব'সে হাটবাজারের সোরগোল তুলেছে। রাজ্যের পালোয়ান সেখানে এসে জুটেছেন, তাঁদের মধ্যে দেখলুম বন্ধুবর শ্রীযতীন্দ্র গুহ বা গোবরবাবুকেও। সেদিনকার কুস্তির বিচারক ছিলেন মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর।

প্রথম দুই-তিনটি কুস্তির পরেই শুনলুম এইবার হবে ভীম ভবানীর সঙ্গে ছোট গামার প্রতিযোগিতা। এই গামা হচ্ছেন প্রখ্যাত কাল্লু পালোয়ানের ছেলে। তিনি তখন সবে যৌবনে পা দিয়েছেন, দেহ রীতিমত তৈরি, তার কোথাও মেদবাহুল্য নেই। কুস্তির খানিক আগে থাকতেই তিনি একটা কাঠের থাম ধ'রে দেহকে গরম করবার জন্যে খুব স্ফূর্তির সঙ্গে ক্রমাগত বৈঠক দিতে সুরু করলেন।

তারপর ভীম ভবানীর সঙ্গে ছোট গামার কুস্তি আরম্ভ হ'ল। ভবানী বয়সেও বড় এবং তাঁর বিপুল দেহও অত্যন্ত গুরুভার,— চটপটে ছোট গামাকে দাঁড়িয়ে এঁটে উঠতে না পেরে তিনি নিলেন মাটি—অর্থাৎ আখড়ার উপরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। ছোট

গামা বহুক্ষণ ধ'রে প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও এবং অনেক প্যাঁচ কষেও তাঁকে চিৎ করতে পারলেন না, তবু বিচারকের অদ্ভুত রায়ে সাব্যস্ত হ'ল, জয়লাভ করেছেন ছোট গামাই! মল্লযুদ্ধে চিরকালই মাটি নেওয়ার রীতি আছে এবং ভূপাতিত প্রতিযোগীকে চিৎ করতে না পারলে কুস্তি হয় সমান সমান। মাটি নেওয়া কুস্তির অন্যতম প্যাঁচ ছাড়া আর কিছুই নয়।

তারপর যুদ্ধস্থলে এসে দাঁড়ালেন মহামল্ল গামা এবং হাসান বক্স। আজ পর্যন্ত আমি অনেক বড় পালোয়ান দেখেছি, কিন্তু দৈহিক সৌন্দর্যে হাসান বক্সের কাছে তাঁদের সকলকেই হার মানতে হবে। সেই দেববাঞ্ছিত সুঠাম ও পরম সুন্দর দেহ একাধারে সুকুমার ও শক্তিদ্যোতক। নিখুঁত তাঁর মুখশ্রী। মুগ্ধ চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়—যেন গ্রীক ভাস্করের গড়া আদর্শ পুরুষমূর্তি।

সেদিন গামার নগ্ন দেহও দেখলুম। যেমন বিরাট কবাট-বক্ষ, তেমনি পেশীবহুল বাহু, তেমনি বলিষ্ঠ ও অপূর্ব উরু। যেন মূর্তি-মন্ত শক্তিমন্ত্র—তার চেয়ে বলীর মূর্তি কল্পনাতেও আনা যায় না।

হাসান বক্স যে একজন প্রথম শ্রেণীর [illegible] য়ান, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কারণ তা নইলে তিনিও গামাকে চ্যালেঞ্জ করতে সাহস করতেন না এবং গামাও তাঁর সঙ্গে লড়তে রাজি হতেন না। হাসান বক্স ও গামার প্রতিযোগিতা একটা অত্যন্ত স্মরণীয় ও দর্শনীয় দৃশ্য ব'লেই সেদিন সেখানে অমন বিপুল জনসমাগম হয়েছিল।

কিন্তু গামা হচ্ছেন গামা, তাঁকে বোঝাতে হ'লে অন্য কোন উপমা ব্যবহার করা চলে না। পৃথিবীর অধিকাংশ প্রথম শ্রেণীর মল্ল তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে দুই-চার মিনিটের বেশী দাঁড়াতে পারেন নি। হাসান বক্স তবু তাঁর সঙ্গে খানিকক্ষণ যুঝলেন বটে, কিন্তু শেষ রাখতে পারলেন না। জয়ী হলেন গামাই।

সেই দিনই সেখানে দেখেছিলুম ভারতের আর এক অপরাজেয় মল্ল ইমান বক্সকে, যাঁর আসন গামার পরেই। অতি দীর্ঘ মূর্তি, অতি বলিষ্ঠ দেহ, হাতে প্রকাণ্ড একটি রুপোর গদা। তবু তাঁর দেহ উল্লেখযোগ্য নয় গামার মত।

পাঁচ

যামিনী রায়

লোকসাহিত্য, লোকশিল্প, লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য প্রভৃতির মধ্যে যে স্বাভাবিক সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য থাকে, উচ্চশিক্ষিতদের দৃষ্টি প্রায়ই তার দিকে আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু মাঝে মাঝে এক-একজন সত্যদ্রষ্টা কলাবিদ যখন সেই সব নিত্যদৃষ্ট ব্যাপারের ভিতর থেকেই অদৃষ্টপূর্ব সুষমা আবিষ্কার ক'রে তুলে ধরেন সকলের চোখের সামনে, তখন আমাদের বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না।

নিরক্ষর গেঁয়ো কবির বাঁধা একটি গান শুনুনঃ

"যা রে কোকিলা তুই,
আমার প্রাণপতি গেছে যে দেশে।
এমন ক'রে জ্বালাতন
করিস্ নে আর নিত্যি এসে।
শুনে তোর কুহুস্বর
উসকে ওঠে পরাণ আমার,
প্রাণপতি মোর গেছে গাঙের পার,
তুই ছাড়্গে তথা কুহুস্বর।"

এ হচ্ছে আকাটা হীরার মত। শিক্ষিত কারিকর একেই মেজে ঘ'ষে ক'রে তুলতে পারেন অত্যন্ত অসাধারণ।

লোকসাহিত্যের দিকে রবীন্দ্রনাথ বহুকাল পূর্বেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এবং তারপর লোকসঙ্গীতও যে কি বিচিত্র সৌন্দর্যের খনি, সুরকার রবীন্দ্রনাথ তারও উজ্জ্বল প্রমাণ দিতে বাকি রাখেন নি। আগে যে সব সুর হেটো বা মেঠো ব'লে শিক্ষিতদের গানের বৈঠকে ঠাঁই পেত না, তিনি সেইগুলিকেই এমন সুকৌশলে ব্যবহার ক'রে জাতে তুলে নিয়েছেন যে, [illegible]রও মনের প্রত্যেক ভাব তারা ব্যক্ত করতে পারে

অনায়াসেই। কেবল তাই নয়। মার্গসঙ্গীতের যে সব রাগ-রাগিণী আগে নিজেদের কৌলীন্যগর্ব বজায় রাখবার জন্যে লোক-সাধারণের পথ মাড়াতে রাজি হ'ত না, তিনি তাদেরই ধ'রে মেঠো ভাটিয়ালী ও বাউল প্রভৃতি চল্‌তি সুরের সঙ্গে মিলিয়ে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে সৃষ্টি ক'রে গিয়েছেন অপূর্ব সৌন্দর্যলোক।

নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর বলেছেন, "Everything is Folk!" তাঁর মতে, ভারতের মত লোকনৃত্যের বিপুল ভাণ্ডার পৃথিবীর আর কোথাও নেই। যথার্থ গুণীর হাতে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হ'লে লোকনৃত্যও অনন্যসাধারণ হয়ে উচ্চশ্রেণীর রূপরসিকদেরও আনন্দ বিধান করতে পারে। উদয়শঙ্করের এই মত যে অভ্রান্ত, তাঁর দ্বারা পরিকল্পিত গ্রাম্য উৎসব. ঘেসেড়া, ভীল, বিদায়ী ও রাসলীলা প্রভৃতি নৃত্য দেখলেই বুঝতে বিলম্ব হয় না।

দরিদ্ররা ধনপতি হ'লে পূর্ব-দারিদ্র্যের কথা ভুলে যায়, নিজেদের উচ্চতর শ্রেণীর লোক ব'লে মনে করে। তাদের বংশধররা আবার আরো উঁচু ধাপে উঠে নিজেদের অভিজাত ব'লে ভাবতে থাকে এবং জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক পর্যন্ত তুলে দিতে চায়। সকল শ্রেণীর শিল্পই ছিল আগে লোকশিল্প। কবিতা, গান, নাচ ও ছবির জন্ম হয় লোকসাধারণের মধ্যেই। তারপর সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আর্ট ভুলে যায় নিজের শৈশবের কথা, লোকসাধারণের ধারণার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে সগর্বে প্রচার করে—আমি অভিজ্ঞ, আমি বড়লোক, আমি ছোটলোকের খেলনা নই।

দশ হাজার বৎসর আগে ফ্রান্স ও স্পেন ছিল অসভ্য। কিন্তু তখনকার শিল্পীরা গিরিগুহার দেওয়ালে যে সব ছবি এঁকে রেখে-ছিল, বর্তমান যুগের মানুষরাও তা দেখে অবাক হয়ে যায়। তারপর যুগে যুগে চিত্রকলা যাত্রা করেছে বিভিন্ন পথে, নিজেকে আবদ্ধ করেছে নানা বিধিবিধানের বন্ধনে, আদিম স্বাভাবিকতা হারিয়ে হরেক রকম 'ইজম্'-এর দাসত্ব ক'রে হ'তে চেয়েছে বিচিত্র, হ'তে চেয়েছে লোকসাধারণের পক্ষে দুর্বোধ।

কিন্তু আজও পৃথিবীর যেখানে যেখানে অসভ্য জাতিরা আদিম মানুষদের মত জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, সেখানকার শিল্পীরা কাজ

করে, ছবি আঁকে সেই দশ হাজার বৎসর আগেকার পদ্ধতিতেই। কাল হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকার 'বুসম্যান'রা আধুনিক যুগেরই লোক। কিন্তু তাদের আঁকা ছবি দেখলে মনে পড়বে সেই দশ হাজার বৎসর আগেকার শিল্পীদেরই কাজ—কি রেখায়, কি বর্ণে, কি পরিকল্পনায়। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের আধুনিক বংশধরদের দ্বারা অঙ্কিত চিত্র সম্বন্ধেও প্রায় ঐ কথাই বলা যায়।

পাশ্চাত্য দেশের একাধিক অতি-আধুনিক শিল্পী ফিরে যেতে চাইছেন আবার প্রাগৈতিহাসিক যুগের দিকে। ফোর্ড ম্যাডক্স ব্রাউন, হোলম্যান হাণ্ট ও রোসেটি প্রভৃতি ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন চিত্রকরের দৃষ্টি ছিল যেমন রাফাএল প্রভৃতির পূর্ববর্তী যুগের দিকে, এঁরাও তেমনি আকৃষ্ট হয়েছেন দশ হাজার বৎসর আগেকার শিল্পীদের দ্বারা। তাই এঁদের হাতের কাজে খুঁজে পাওয়া যায় আদিম শিল্পের প্রভাব। হয়তো এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সার্বজনীন হবে না এবং হয়তো দীর্ঘস্থায়ী হবে না চলমান মেঘের ছায়ার মত এই সাময়িক রেওয়াজ, তবু আদিম কালের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিকতা যে আকৃষ্ট করেছে অতি-আধুনিকদেরও, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কেবল আদিম ছবি কেন, শিশুদের আঁকা যে সব ছবি দেখলে আগে আমাদের কাকের ছানা বকের ছানার কথা স্মরণ হ'ত, তার ভিতরেও এঁরা পাচ্ছেন নূতন নূতন সৌন্দর্যের সন্ধান।

আমাদের দেশেও প্রকাশ পাচ্ছে একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গি।

ছেলেবেলায় যখন গুরুজনদের সঙ্গে কালীঘাটে যেতুম এবং চিত্রকলার ভালো-মন্দ কিছুই বুঝতুম না, তখন আমাকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করত সেখানকার পটুয়ারা। তাদের কর্মশালার প্রান্তে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী ও বিস্মিত চোখে নিরীক্ষণ করতুম পটুয়াদের হাতের কাজ। নিজের মনে তারা এঁকে যেত ছবির পর ছবি, কেমন নিশ্চিত হাতে রেখার পর রেখা টেনে, কত অবলীলাক্রমে। অধিকাংশই ছিল গার্হস্থ্য ছবি, লোকে হেলাভরে বলত কালীঘাটের পট। সেগুলিকে কেউ আর্টের নিদর্শন ব'লে গ্রহণ করত না এবং তাদের ক্রেতাও ছিল না শিক্ষিত ভদ্রলোকরা। কিন্তু আজ উচ্চশ্রেণীর রূপ-

রসিকদের মুখেও তাদের প্রশংসা শোনা যায় এবং ঘটা ক'রে কালীঘাটের পটের প্রদর্শনী খুললে তা দেখবার জন্যে মনীষীরাও আগ্রহ প্রকাশ করেন। আগে আমরা যাদের তাচ্ছিল্য ক'রে 'পোটো' ব'লে ডাকতুম, আজ তাদের শিল্পী ব'লে স্বীকার করতেও আমরা নারাজ নই। দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছে বৈ কি। আর তা বদলাচ্ছে ব'লেই আজ শিল্পী যামিনী রায় পেয়েছেন অসংখ্য সমঝদার।

কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি সহজে বা অকারণে বদলায় না, তা পরিবর্তিত হ'তে পারে প্রতিভার প্রভাবেই। অনেকদিন আগে থেকেই বাংলা দেশে সচিত্র প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়ে আসছে, সেই সব পটের সঙ্গে আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিরা ছিলেন সুপরিচিত। তাদের বিষয়বস্তু, তুলির লিখন এবং পরিকল্পনা কালীঘাটের পটের চেয়ে যথেষ্ট উন্নত হ'লেও তা দেখে কারুর মনে জাগেনি কোন সম্ভাবনার ইঙ্গিত। সংস্কৃত ভাষারও চেয়ে সে সব ছবির ভাষা ছিল অধিকতর মৃত। তা দেখে পরিতৃপ্ত হ'ত নয়নমন, ঐ পর্যন্ত। বাউল বা মেঠো সুর শুনেও আমাদের মন নাড়া পেয়েছে, কিন্তু তবু তাদের মুখ-নাড়া খেতে হয়েছে উপেক্ষণীয় লোকসঙ্গীত ব'লে এবং বৈঠকী ওস্তাদরাও দিতেন না তাদের পাত্তা। তাদের উচ্চাসনে তুলে পঙ্‌ক্তিভুক্ত করার জন্যে দরকার হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মত সরস্বতীর বরপুত্রকে।

বাংলা দেশে বড় বড় শিল্পীর অভাব ছিল না, কিন্তু প্রাচীন বাংলার ঘরোয়া পট রচনা পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে যে বর্তমান কালেও যুগোপযোগী উচ্চশ্রেণীর কলাবস্তু প্রস্তুত করা যেতে পারে, এটা দেখবার মত দৃষ্টিশক্তির অভাব ছিল যথেষ্ট। আমাদের শিল্পীরা যখন প্রতীচ্যের নানাবিধ "ইজম্"-এর দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে আত্ম-প্রকাশের পথ খুঁজে পাচ্ছেন না, যামিনী রায় তখন রূপলক্ষ্মীর মূর্তি গঠনের জন্যে উপকরণ সংগ্রহে নিযুক্ত হলেন গৌড় বাংলার নিজস্ব ঐশ্বর্য-ভাণ্ডারে। কিন্তু তিনিও একেবারে নিজের পথ কেটে নিতে পারেন নি। প্রথম প্রথম তিনিও এমন সব ছবি এঁকে-ছিলেন, যাদের ভিতর থেকে আবিষ্কার করা যায় পাশ্চাত্য প্রভাব, চৈনিক প্রভাব বা অন্য কোন প্রভাব। তারপর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বদলে

গেল কেন জানি না; হয়তো বঙ্গকুললক্ষ্মী মাইকেলের মত তাঁকেও স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেনঃ

"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে।"

শিল্পী যামিনী রায়ের অপরূপ রেখাকাব্যগুলি বাংলার খাঁটি প্রাণপদার্থ দিয়ে গড়া। তার মধ্যে "বহু যুগের ওপার থেকে" ভেসে আসে সাবেক বাংলার সোঁদা মাটির গন্ধ এবং সেই সঙ্গে পাওয়া যায় হাল বাংলার পরিচিত প্রাণের ছন্দ। নব নব পরিকল্পনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে রসরূপের যে নির্মল আনন্দ, কোথাও কোন বিজাতীয় মনোবৃত্তির এতটুকু ছোঁয়া করতে পারে না তাকে পরিম্লান। নিশ্চিত হাতের টানে আঁকা চিত্রার্পিত ও লীলায়িত রেখার সমারোহের মধ্যে সর্বত্রই অনুভব করা যায় ভাবসাধক শিল্পীর মনের গভীর নিষ্ঠা। এই বিকৃত ও অধঃপতিত অতিসভ্য যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে লালিতপালিত হয়েও. নব্য বাংলার এক শিল্পী ঠাকুরঘরে ঢুকে ইষ্টদেবীর গঙ্গোদকে ধোয়া পূজাবেদীর শুচিশুভ্রতা এমনভাবে রক্ষা করতে পেরেছেন দেখে মনে জাগে চরম বিস্ময়ের সঙ্গে পরম পুলক।

পথ ঠিক হয়ে গেল—সে পথের শেষ নেই। জীবন সংক্ষিপ্ত, কিন্তু আর্ট অনন্ত। শিল্পী যামিনী রায় সাধনমার্গে অগ্রসর হলেন এবং এখনো অগ্রসর হচ্ছেন। হালে "মাসিক বসুমতী"তে তাঁর আঁকা "বাঙলায় দুর্ভিক্ষ" নামে ছবির প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়েছে। একটি মাত্র কঙ্কালসার মূর্তি বা অন্য কোন মর্মন্তুদ বীভৎস দৃশ্য নেই। অত্যন্ত সহজ প্রতীকের সাহায্যে নিরন্ন গৃহস্থবাড়ীর অরন্ধনের কথা বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিছুকাল আগে তাঁর চিত্রশালায় গিয়েছিলুম। দেখলুম তিনি এক অভিনব বিষয়বস্তু নিয়ে পরীক্ষায় নিযুক্ত হয়েছেন।

স্বর্গীয় গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিউবিষ্টদের পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে কয়েকখানি ছবি এঁকেছেন। সেই সব ছবি দেখে বিখ্যাত রূপরসিক ডক্টর এইচ্ কজিন্স মতপ্রকাশ করেছিলেন, যে দেশে

কিউবিজমের জন্ম সেই য়ুরোপের শিল্পীরাও তেমন চমৎকার ছবি আঁকতে পারেন না। তার কারণ, গগনেন্দ্রনাথ নকলিয়ার কর্তব্য পালন করেন নি। প্রতিভাবান ভারতীয় শিল্পীর হাতে এসে রূপান্তর গ্রহণ করেছিল য়ুরোপীয় পদ্ধতি।

কলকাতায় বড়দিনের মরশুমে চিত্র-প্রদর্শনী খোলা হয়। গত তিন চার বৎসরের প্রদর্শনী দেখে মনে ধারণা হয়, বাংলার অতি-আধুনিক চিত্রকলা ক্ষীয়মাণ হয়ে পড়ছে দিনে দিনে। শিল্পীর পর শিল্পী পাশ্চাত্য সব 'ইজম' নিয়ে প্রমত্ত হয়ে উঠেছেন, কিন্তু তা পরিপাক করতে পারেন নি একেবারেই। ফলে সে সব উদ্ভট ছবি পাশ্চাত্য "ইজম"-এর ব্যর্থ ও নিরর্থক অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই হয়নি। প্রাচ্যে বা প্রতীচ্যে কোথাও তাদের ঠাঁই নেই।

এখন যামিনী রায়ের নূতন পরীক্ষার কথা বলি। য়ুরোপের মধ্যযুগের ধুরন্ধর চিত্রকররা খৃষ্টের জীবনীমূলক অজস্র ছবি এঁকেছেন। খৃষ্টধর্ম সম্পর্কীয় সেই সব নরনারীর মূর্তিকে যামিনী রায় এঁকে দেখিয়েছেন বাংলার নিজস্ব পটরচনাপদ্ধতিতে। শিল্পী নকল বা প্রভাবের ধার ধারেন নি, দেখাতে চেয়েছেন দেশী পদ্ধতিতে বিদেশী মানুষদের। বাংলার পটশিল্পে খৃষ্টদেব ও মেরী মাতা! শিল্পী অসঙ্গতির মধ্যেই অন্বেষণ করেছেন সঙ্গতির ছন্দ। প্রাচীনকালে গান্ধারের ভারতীয় ভাস্কররাও বুদ্ধদেবের মূর্তি গড়বার সময়ে এই রকম চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা গ্রীক প্রভাব থেকে মুক্ত হ'তে পারে নি।

যামিনী রায় একাধিকবার বাংলা রঙ্গালয়ের দৃশ্য-পরিকল্পকের কার্যভার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও তিনি বাংলার পট-পদ্ধতি বর্জন করেন নি। বাংলার পট হচ্ছে প্রধানতঃ আলঙ্কারিক আর্ট। তাই রঙ্গমঞ্চের উপরেও তার মধ্যে হয়নি ছন্দঃপাত।

শিল্পী যামিনী রায় আজ হয়েছেন যশস্বী। কেবল স্বদেশী বিদেশী বহু প্রখ্যাত রূপরসিকের অভিনন্দন নয়, লক্ষ্মীলাভও করেছেন। কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত তাঁর যাত্রাপথ হয়নি কুসুমাস্তৃত। তাঁর রেখায় লেখা কবিতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু অনেক সময়েই তাঁর আর্ট হয় Abstract, তিনি প্রকাশ করতে চান

অমূর্তকে, দৃষ্টান্তস্বরূপ পূর্বকথিত "বাংলায় দুর্ভিক্ষ" ছবিখানির উল্লেখ করতে পারি। ওর মধ্যে চিন্তাশীলতা থাকতে পারে, কিন্তু জনসাধারণ অমূর্ত শিল্প নিয়ে মস্তক ঘর্মাক্ত করতে প্রস্তুত নয়। বহু শিক্ষিত ব্যক্তি আমার বাড়ীতে তাঁর আঁকা চিত্রাবলী দেখে সেগুলির সার্থকতা সম্বন্ধে প্রচুর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আমি সাধ্যমত তাঁদের বোঝাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়েছে ব'লে মনে হয় না। সেই জন্যেই বহুকাল পর্যন্ত তিনি অর্থকর লোকপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন নি।

তিনি আমার দীর্ঘকালের বন্ধু, তাঁকে জানি ঘনিষ্ঠভাবেই। সময়ে সময়ে তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে দারুণ অর্থকষ্ট। দারিদ্র্য অপমানকর নয় বটে, কিন্তু বহু শিল্পীর পক্ষেই মারাত্মক। শিল্পী যামিনী রায় বিনা অভিযোগে মৌনমুখে এই দারিদ্র্য-জ্বালা সহ্য করেছেন, তবু নিজের পদ্ধতি ছেড়ে অন্য কোন লোকপ্রিয় পদ্ধতি গ্রহণ করেন নি, কলালক্ষ্মীর আশীর্বাদ পেয়েই পরিতুষ্ট ছিলেন। অবশেষে জয়লাভ করেছে প্রতিভাই। যে লক্ষ্মীদেবীর হাতে থাকে ঝাঁপি আর পায়ের তলায় থাকে পেচক, অবশেষে তাঁরও মুখ হয়েছে প্রসন্ন।

ছয়

পরিচালক প্রবোধচন্দ্র গুহ

নট না হয়েও নাট্য-পরিচালনার দ্বারা অক্ষয় যশ অর্জন করা যায়। প্রমাণ, য়ুরোপের রাইনহার্ড সাহেব। বাংলাদেশেও এই বিভাগে দুজন লোক প্রভূত খ্যাতি লাভ করেছেন। স্বর্গীয় মহেন্দ্র-কুমার মিত্র ও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহ।

মিনার্ভা থিয়েটার গৌরবের উচ্চশিখরে উঠেছিল মহেন্দ্রকুমারের পরিচালনাগুণে। গিরিশচন্দ্রের শেষ বয়সের সমস্ত বিখ্যাত নাটকই (বলিদান, সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, ছত্রপতি শিবাজী, শাস্তি কি শান্তি, শঙ্করাচার্য, অশোক, তপোবল ও গৃহলক্ষ্মী প্রভৃতি) মহেন্দ্র-কুমারের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের দুর্গাদাস, নুর-জাহান, সোরাব-রুস্তম, মেবার পতন, সাজাহান ও চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধেও ঐ কথাই বলা যায়। সেই সময়েই দানীবাবুর নাট্যপ্রতিভা যতটা চরমে উঠতে পেরেছিল, আর কখনো তা পারেনি। গিরিশচন্দ্র যখন দানীবাবু এবং মিনার্ভার অধিকাংশ প্রখ্যাত শিল্পীদের নিয়ে কোহিনুর থিয়েটারে চ'লে যান, তখন সকলেই মনে করেছিলেন, অতঃপর মিনার্ভা থিয়েটারের পতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মহেন্দ্রকুমার পরিচালিত মিনার্ভার প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হয়নি। এখেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে, কোন রঙ্গালয়ের পক্ষে শ্রেষ্ঠ নাটক ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতার মত শ্রেষ্ঠ পরিচালকেরও প্রয়োজনীয়তাও কতখানি।

প্রবোধচন্দ্র রঙ্গালয়ের সংস্রব ত্যাগ করেছেন অনেক দিন আগেই, কিন্তু এখনো নাট্যজগতের সকলেরই মুখে মুখে ফেরে তাঁর নাম। মহেন্দ্রকুমারের মত তিনিও নটও নন, নাট্যকারও নন। মহেন্দ্রকুমার ছিলেন হাইকোর্টের উকিল এবং তিনি ছিলেন ডাক-বিভাগের পদস্থ কর্মচারী। কিন্তু দুইজনেরই নাট্যানুরাগ ছিল এমন প্রবল যে, নাট্যজগতে প্রবেশ না ক'রে থাকতে পারেননি এবং এই নাট্যানুরাগের

ফলেই প্রবোধচন্দ্রকে শেষ পর্যন্ত সরকারি আপিসের সম্পর্ক পর্যন্ত ত্যাগ করতে হয়েছিল। তারপর থেকে নাট্যসাধনাই হয়ে উঠেছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত।

প্রথমে তিনি স্টার থিয়েটারে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতা করেন। তারপর হন আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা। সেই সময়ে "কর্ণার্জ্জুনে"র অভাবিত জনপ্রিয়তার জন্যে তিনি নিজেও দাবি করতে পারেন অনেকখানি প্রশংসাই। ১৩৩৬ সালে তিনি হন মনোমোহন থিয়েটারের মালিক ও পরিচালক। ওখানে তাঁর পরিচালনায় দুইখানি নাটক ("গৈরিক পতাকা" ও "কারাগার") আশ্চর্য সাফল্য লাভ করে। তারপর তাঁর হাতেই গ'ড়ে ওঠে নূতন রঙ্গালয় "নাট্য-নিকেতন"। এখানেও বিক্রীর দিক দিয়ে সবচেয়ে স্মরণীয় নাটক হচ্ছে শচীন্দ্রনাথের "সিরাজদ্দৌলা", যার জনপ্রিয়তা গিরিশচন্দ্রের "সিরাজদ্দৌলা"কেও ছাড়িয়ে উঠেছে বললে অত্যুক্তি হবে না।

তাঁর কর্মকুশলতাকে অদ্ভুত বলা যেতেও পারে। এ সম্বন্ধে একটি গল্প শুনেছি। যখন তিনি আর্ট থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁর আর্থিক অবস্থা তখন ভালো ছিল না। একদিন তাঁর পকেটে আছে মাত্র কয়েক গণ্ডা পয়সা, তিনি "আজ একটা কিছু করব"ই ব'লে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বেরিয়ে পড়েন। তারপর বাসায় যখন ফিরলেন, তখন তিনি মনোমোহন থিয়েটারের মালিক।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দ। স্টার থিয়েটারে প্রায়ই অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতুম। সেই সময়েই প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। কিন্তু সে আলাপ তখনও বন্ধুত্বে পরিণত হয়নি। দেখতুম একটি সুশ্রী যুবককে, দুই হাত তাঁর কাজে জোড়া, মুখ কিন্তু মুখর। সর্বদাই কর্মে ব্যস্ত এবং কাজ করতে করতে সর্বদাই মিষ্টমুখে সকলের সঙ্গে গল্প করতে প্রস্তুত। লাট্টুর মত সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু হাতেরও কামাই নেই, মুখেরও কামাই নেই। এই হলেন প্রবোধচন্দ্র। আজ বৃদ্ধ হয়েছেন বটে, কিন্তু স্বভাব তাঁর বদলায়নি। কর্মতৎপরতাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। আলস্য

তাঁকে আক্রমণ করতে পারে না। কাজ, কাজ, সর্বদাই কাজ চাই। একাই হ'তে চান একশো।

শিশিরকুমার নিজের সম্প্রদায় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন। আমরাও সবান্ধবে যোগ দিলুম তাঁর সঙ্গে। ফলে স্টার থিয়েটারে আমাদের যাতায়াত প্রায় বন্ধ হয়ে গেল, কারণ ওখানকার আর্ট সম্প্রদায় প্রতিযোগী শিশির-সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখতেন না। আমরা প্রকাশ করলুম সাপ্তাহিক "নাচঘর" পত্রিকা, তার পাতায় থাকত শিশিরকুমারের গুণপনার পরিচয়। স্টার থিয়েটারের অনুগত ছিল আর একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা, সে নিয়মিতভাবে আমাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করত; এবং তাকে যে উৎসাহিত করতেন প্রবোধচন্দ্রই, মনে মনে আমি এই সন্দেহ পোষণ করতুম। কাজেই আমার মন যে তাঁর প্রতি অল্পবিস্তর বিরূপ হয়ে উঠেছিল, এ কথা অস্বীকার করব না।

তারপর কয়েক বৎসর কেটে যায়। কিছুদিনের জন্যে রঙ্গালয়ের একঘেয়ে প্রতিবেশ আর ভালো লাগে না, বাড়িতে একান্তে ব'সে সাহিত্যচর্চা করি। সেই সময়েই প্রবোধচন্দ্র নিয়েছেন মনোমোহন থিয়েটারের ভার।

এক সকালে বৈঠকখানায় ব'সে খবরের কাগজ পড়ছি, হঠাৎ কণ্ঠস্বর শুনলুম—"চলুন"।

মুখ তুলে দেখি, সামনে দাঁড়িয়ে আছে স্বর্গীয় অভিনেতা সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তার বালক বয়স থেকেই তাকে আমি চিনতুম। গোবরবাবুর আখড়ায় কুস্তি ল'ড়ে বপুখানি তার বিপুল হয়ে ওঠে। তারপর কুস্তি ছেড়ে থিয়েটারে ঢোকে। বুদ্ধি কিছু মোটা, কতকটা গোঁয়ার-গোবিন্দ মানুষ।

সতীশ আবার বললে, "চলুন।"

আমি বললুম, "চলুন মানে? কোথায় যাব?"

সতীশ বললে, "মনোমোহন থিয়েটারে। আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে প্রবোধবাবু আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

বললুম, "আমি যাব না। আমার আর থিয়েটার ভালো লাগে না।"

সতীশ চোখ পাকিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বললে, "যাবেন না কি, আপনাকে যেতেই হবে। প্রবোধবাবু ব'লে দিয়েছেন, আপনি যেতে না চাইলে আপনাকে যেন কোলে ক'রে তুলে নিয়ে আসা হয়।"

বুঝলুম ষণ্ডামার্ক সতীশের সঙ্গে বেশী কথা কাটাকাটি ক'রে লাভ নেই। আমাকে কোলে তুলে নিতে তাকে একটুও বেগ পেতে হবে না এবং সে দৃশ্য হবে দশজনের পক্ষে যথেষ্ট হাস্যকর। অতএব গেলুম তার সঙ্গেই।

প্রবোধবাবুকে বললুম, "আচ্ছা চ্যালাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন যা হোক, একেবারে নাছোড়বান্দা।"

তিনি হাসতে হাসতে বললেন, "সতীশ যখন গিয়েছে, তখন যে তোমাকে আসতে হবেই, এ আমি জানতুম।"

—"কিন্তু ব্যাপার কি? হঠাৎ আমাকে স্মরণ করেছেন কেন?"

—"জানো তো, এখানকার ভার নিয়েছি আমি। উপর-উপরি দু'খানা বই খুলতে হবে—"জাহাঙ্গীর" আর "মহুয়া"। নজরুল গান লিখছে। তোমাকে দিতে হবে নাচ। 'না' বললে চলবে না।"

তাই হ'ল। 'না' বলা চলল না। আবার থিয়েটার বাঁধলে মায়ার বাঁধনে। এ আনন্দের বটে, কিন্তু সাহিত্যচর্চার পক্ষে সুবিধাজনক নয়। আর্টের সেবা করছি ব'লে মনকে প্রবোধ দিয়েছি, কিন্তু ক্ষুণ্ণ হয়েছে সাহিত্যচর্চা।

তারই কয়েক বৎসর আগে শিশিরকুমারের অনুরোধে "বসন্ত-লীলা", "সীতা" ও "হাসনুহানা" পালার জন্যে কয়েকটি গান রচনা করেছিলুম বটে, কিন্তু তারপর অনেককাল পর্যন্ত থিয়েটারের জন্যে আর কোন গান বাঁধিনি। কিন্তু এখন থেকে প্রবোধচন্দ্র আমার উপরে দিতে লাগলেন গানের পর গানের বরাত। যতদিন তিনি রঙ্গালয়ের সম্পর্কে ছিলেন, ততদিন ধ'রেই কত নাট্যকারের কত নাটকের জন্যে রাশি রাশি কত যে গান রচনা (এবং সেই সঙ্গে নৃত্য পরিকল্পনা) করেছি, সে হিসাব আর আমার মনে নেই। তবে এইটুকু অনায়াসেই বলতে পারি, নবযুগের আর কোন কবিই রঙ্গালয়ের জন্যে আমার মত এত বেশী গান রচনা করেননি।

ঐ মনোমোহন থিয়েটার থেকেই প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে আমি অচ্ছেদ্য

বন্ধুত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। অনেক দিনই দিবারাত্র একসঙ্গে কাটিয়ে দিয়েছি—একসঙ্গে কাজ করা, একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, একসঙ্গে শোয়া-বসা। দুজনেই পরস্পরকে ভালো ক'রে চিনতে পেরেছি। এবং ঐ মনোমোহন থিয়েটারেই নাট্যপরিচালনায় তাঁর অদ্ভুত কৃতিত্বের সঙ্গে ভালো ক'রে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছি। তিনি কেবল নাটক নির্বাচন করতেন না, তার পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধনেরও ভার গ্রহণ করতেন। তারপর দৃশ্যপট, সাজপোশাক ও মঞ্চসজ্জার পরিকল্পনা, আলোক-নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মিতভাবে মহলা দেবারও ভার থাকত তাঁর উপরে। নাচ, গান ও সুরের উপযোগিতার দিকেও থাকত তাঁর তীক্ষ্ম দৃষ্টি। রঙ্গালয়ে তাবৎ ব্যাপার নিয়ে বিশেষরূপে মস্তিষ্কচালনা করতেন একমাত্র তিনিই। রঙ্গালয়ে একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক মঞ্চস্থ করবার জন্যে যে কি বিপুল পরিশ্রম ও চিন্তাশীলতার প্রয়োজন হয়, বাইরের কেউ তা কল্পনাতেও উপলব্ধি করতে পারবেন না। নট-নটী, দৃশ্য-পরিকল্পক, নৃত্যবিদ্, গীতি-রচয়িতা, সুরশিল্পী, আলোকনিয়ন্তা ও নাট্যকার আপন আপন বিশেষ বিভাগ নিয়েই অবহিত হয়ে থাকেন বটে, কিন্তু একটি মূল ভাব ফুটিয়ে তোলবার জন্যে প্রত্যেককে অবিচ্ছিন্নভাবে একটি নির্দিষ্ট পরিণামের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে পরিচালককে অনন্যসাধারণ সংগঠন-শক্তির পরিচয় দিতে হয়। ভাবুক, কবি, সমালোচক এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পীর বিশেষত্ব সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞান না থাকলে কেহই হ'তে পারেন না সার্থক পরিচালক। কেবল বাছা বাছা রসিকের নয়; তাঁকে রাখতে হয় জনসাধারণের মনের খবরও।

প্রবোধচন্দ্র সম্বন্ধে আগেই বলেছি, তিনি যেন একাই একশো। তাঁর অসাধারণ কর্মদক্ষতা ও শ্রমশক্তি দেখে বারংবার বিস্মিত না হয়ে পারিনি। নূতন নাটক প্রস্তুত করবার সময়ে দৈনন্দিন জীবনের অন্য কোন কথাই তাঁর মনে থাকত না, স্নানাহার ভুলে তিনি একটানা কাজ ক'রে যেতেন সতেরো-আঠারো ঘণ্টা ধ'রে। নিজেই কখনো তুলি ধ'রে দৃশ্যপটের উপরে বর্ণলেপনে নিযুক্ত হয়েছেন, কখনো কাঁচি ধ'রে সাজপোশাক তৈরি করেছেন, আবার সে-সব ফেলে ছুটে গিয়েছেন মহলার আসরে, অভিনেতাদের নির্দেশ দিতে দিতে লক্ষ্য

করেছেন নাটকের মধ্যে নূতন কি পরিবর্তনের দরকার, আবার আমার কাছে এসে নাচ দেখতে দেখতে জানিয়েছেন, আমি তাঁর মনের ভাব ধরতে পারিনি, নাচের কোন কোন অংশ বদলে দিলে ভালো হয় এবং তারপরেই হয়তো সুরকার বা আলোকনিয়ন্তাকে নিয়ে পড়েছেন। কাজের পরে কাজ, এক কাজের পরে আর এক কাজ, কিন্তু মুখে তবু শ্রান্তি বা বিরক্তির একটু লক্ষণ নেই, হাসতে হাসতে সকলকেই করছেন সাদর সম্ভাষণ; এবং এই কাজের ভিড়ের মধ্যে অন্য ব্যাপারও আছে—তাঁর কাছে যা আনন্দকর, কিন্তু আর কারুর পক্ষে উপসর্গ। সবাইকে নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াতেও বড় ভালোবাসেন। কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে দৌড়ে চ'লে যাচ্ছেন রান্নাঘরের ভিতরে, সেখানে মস্ত হাঁড়ায় চড়েছে মাংস, খানিকক্ষণ হাতা নেড়ে আবার দ্রুতপদে ফিরে আসছেন নূতন কোন কাজ করবার জন্যে। সত্য বলছি, এমন আমুদে কাজের মানুষ আমি আর দেখিনি।

সাত

নির্মলচন্দ্র চন্দ্র

সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মিলনস্থানকে কেউ যদি "আড্ডা" ব'লে মনে করতেন, তাহ'লে "ভারতী" সম্পাদক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রতিবাদ করে বলতেন, "সাহিত্যিকদের আসরকে আড্ডা বলা উচিত নয়। আড্ডা শব্দটির মধ্যে কিছুমাত্র আভিজাত্য নেই। নানা স্থলে তার কদর্থও হ'তে পারে।"

মণিলালের মত সমর্থনযোগ্য।

কিন্তু আটত্রিশ নম্বর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে দুই যুগ আগে স্বর্গীয় গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের ভবনে প্রতিদিন বৈকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত যে বৈঠকটি বসত, তাকে আড্ডা বললে অন্যায় হবে না। কারণ সেখানে এসে ওঠাবসা করতেন বটে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ, সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ও সঙ্গীতাচার্য করমতুল্লা খাঁ প্রমুখ তখনকার অধিকাংশ প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও নানা শ্রেণীর শিল্পিগণ, কিন্তু সেই সঙ্গে সেখানে আড্ডা মারতে আসতেন এমন সব ব্যক্তিও অনায়াসেই যাঁদের গোলা লোক বলে গণ্য করা চলে। জ্ঞানী-গুণী-নামীদের সঙ্গে তথাকথিত রাম-শ্যামের সম্মিলন গজেনবাবুর বৈঠকটিকে ক'রে তুলেছিল রীতিমত বিচিত্র। সে বৈঠকে বাদ পড়ত না কোন-কিছুই—জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত।

ঐখানেই প্রথম আলাপ হয় শ্রীনির্মলচন্দ্র চন্দ্রের সঙ্গে।

তক্তাপোশের উপরে ফরাশ পাতা। মাথার উপরে ঘুরছে বিজলী-পাখা। ফরাশের উপরে তাকিয়া এবং তাকিয়ার উপরে আড় হয়ে হেলান দিয়ে আলবালার নলে মাঝে মাঝে টান দিচ্ছেন এবং মাঝে মাঝে কথা কইছেন নির্মলচন্দ্র। দোহারা দেহ। গৌরবর্ণ। সৌম্য, প্রসন্ন মুখ। সম্প্রতি পত্রিকায় পত্রিকায় তাঁর যে-সব প্রতিকৃতি বেরিয়েছে, তার ভিতর থেকে তখনকার নির্মলচন্দ্রের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়

না বললেও চলে। বহুকাল পরে কিছুদিন আগে মিনার্ভা থিয়েটারে এক সভায় নির্মলচন্দ্রের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। "হেমেনদা" ব'লে তিনি যখন আমাকে সম্ভাষণ করলেন, তখন প্রথমটা তাঁকে আমি চিনতেই পারিনি। প্রৌঢ়ত্বের পরে দেহের এই দ্রুত অধঃপতন একটা ট্রাজেডির মত। আমার পনেরো বৎসর আগেকার ফোটোর মধ্যে আমার আজকের চেহারা খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ এই পনেরো বৎসরের মধ্যে একটুও বদলায়নি আমার মন। মনে হয়, বিধাতার এটা সুবিচার নয়।

বন্ধুবান্ধবদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আলবলার নল হাতে ক'রে নির্মলচন্দ্র ধীরে-সুস্থে ব'সে ব'সে সকলের সঙ্গে গল্প করছেন এবং যখন-তখন ভিতরে থেকে বাড়ীর গৃহিণী বৈঠকধারীদের জন্যে পাঠিয়ে দিচ্ছেন চায়ের পেয়ালা ভরা 'ট্রে'র পর 'ট্রে' আর রাশীকৃত পানের খিলি ভরা রেকাবির পর রেকাবি। পেয়ালা আর রেকাবি খালি হয়ে যায় ঘন ঘন।

ধোপদস্ত গিলে-করা ফিনফিনে পাঞ্জাবী ও চুনট-করা তাঁতের ধুতি এবং দামী জুতো প'রে প্রবেশ করেন এক বিপুলবপু সুপুরুষ। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় কোন ফুর্ত্তিবাজ সৌখীন যুবক—আসলে কিন্তু তিনি হচ্ছেন পৃথিবীবিখ্যাত প্রত্নবিদ্যাবিদ্ রাখালদাস বন্দ্যো-পাধ্যায়। তাঁর মৌখিক ভাষণেও থাকে না প্রত্নতত্ত্বের ছিটেফোঁটা, বরং জাহির হয় অল্পবিস্তর খিস্তিখেউড়!

আসেন নরহস্তীর মত বিশাল চেহারা নিয়ে আমাদের 'চিন্দা'—জনসাধারণের কাছে যিনি হাস্যসাগর চিত্তরঞ্জন গোস্বামী। তাঁর জন্যে আসে শ্বেতপাথরের পেয়ালায় ঢালা চা এবং চায়ে চুমুক দিতে দিতে তিনি সুরু করেন ছেবলামি-ভরা চুটকি গালগল্প এবং কথার পর কথা সাজিয়ে কথার খেল। রাখালের মনের মত জুড়ি। বৈঠকী হাস্যরসাভিনয়ে চিত্তরঞ্জন ছিলেন একেবারেই অতুলনীয়।

আসেন সর্বজনপ্রিয় 'দাদাঠাকুর' বা শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত। তিনিও একটি অসাধারণ চরিত্র। তাঁর একটি হাসির রচনায় পরিপূর্ণ পত্রিকা ছিল, নাম "বিদূষক"। তিনি একাই ছিলেন "বিদূষকে"র সম্পাদক, লেখক, মুদ্রাকর, প্রকাশক ও ফেরিওয়ালা। পথে পথে ঘুরে নিজের

কাগজ নিজেই বিক্রি করতেন। অতি সাদাসিধে মানুষ।. একহারা দেহ। টকটকে গৌরবর্ণ। নগ্ন পদ। গায়ে জামার বদলে চাদর। হাসিখুসি, গালগল্পে মাতিয়ে রাখেন সবাইকে।

একদিন তিনি বৈঠকে ব'সে আছেন, এমন সময়ে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তিনি বললেন, "এই যে, 'বিদূষক' শরৎচন্দ্র।"

দাদাঠাকুর তৎক্ষণাৎ পাল্টা সম্ভাষণ করলেন, "এস এস 'চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্র!" তার কিছুকাল আগে শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাস বাজারে বেরিয়েছিল।

মুখের মত জবাব পেয়ে শরৎদা নির্বাক।

এমনি নানা শ্রেণীর গুণীরা এসে আসর ক্রমে জাঁকিয়ে তোলেন এবং তাঁদের মাঝখানে আসীন হয়ে আলবলার নল হাতে নিয়ে নির্মলচন্দ্র করতে থাকেন সকলের সঙ্গে সরস বাক্যালাপ। কেটে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। নেই কোন ব্যস্ততা বা তাড়াহুড়ো। যে চেনে না সে মনে করবে, তিনি কোন কমলাবিলাসী, পরম আরামী ব্যক্তি—ধার ধারেন না কোন ঝুঁকির। অথচ কত দিকে তাঁর কত কর্মশীলতা! তিনি বিখ্যাত আইন-ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক এবং দেশের নেতা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কর্ম-সহচর, মহাত্মা গান্ধীর অনুগামী। কলকাতার পৌরসভার সভ্য। বঙ্গীয় আইন সভার এবং ভারতীয় আইন সভার সদস্য হয়েছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আপাততঃ আমার আর কিছু বলবার নেই। বর্তমান প্রবন্ধমালার উদ্দেশ্যও নয়, কারুর জীবন-কাহিনী বর্ণনা করা। আমি কেবল আঁকতে চাই এক-একজন গুণীর এক-একখানি রেখাছবি।

সে সময়ে বাংলা দেশের ও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঘটছে চিত্তোত্তেজক ঘটনার পর ঘটনা। দেশব্যাপী অশান্তি, অবিচার ও নির্যাতিতের আর্তনাদ। কালাপানির ওপারে ব'সে ক্রুদ্ধ গর্জন করছে জনবুলের পোষা ব্রিটিশ সিংহ এবং তার প্রতিধ্বনি ভেসে আসছে কন্যা কুমারিকা পার হয়ে রাহুগ্রস্ত জম্বুদ্বীপে। ইংরেজ ভেবেছিল এদেশে তার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিত পাকা ক'রে গাঁথা

হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই জীর্ণ ভিত যে ভিতর-ফোঁপরা হয়ে এসেছে, এ সন্দেহ তখনও সে করতে পারেনি। প্রদেশে প্রদেশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে [illegible]—বিশেষ ক'রে বাংলা দেশে। তার উপরে মহাত্মা গান্ধী সুরু করলেন অসহযোগ আন্দোলন—নিরস্ত্রের পক্ষে এক নূতন অস্ত্র। অহিংসার দ্বারা হিংসাকে দমন। একদিকে সন্ত্রাসবাদ আর একদিকে অসহযোগ আন্দোলন, মাঝখানে প'ড়ে রক্ত-শোষক বিদেশী শাসকদের অবস্থা হ'ল অত্যন্ত কাহিল। সিপাহী যুদ্ধের সময়ে সহস্র সহস্র অস্ত্রধারী সিপাহীরাও ইংরেজদের এমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় ক'রে তুলতে পারেনি। তাদের মাথা খারাপ হয়ে গেল। হন্তদন্ত হয়ে তারা অবলম্বন করলে দমননীতি। ভাবলে, জেলে পুরে, নির্বাসনে পাঠিয়ে ও বুলেট চালিয়ে ভেঙে দেবে দুরন্তদের মেরুদণ্ড।

সেই চিরস্মরণীয় মুক্তিসংগ্রামের যোদ্ধাদের পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন, নির্মলচন্দ্র হচ্ছেন তাঁদেরই অন্যতম। এক একদিন এক একটি ঘটনার সংবাদ বিদ্যুতের মত দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে, আর নির্মলচন্দ্র এলেই আমরা চারিদিক থেকে সাগ্রহে তাঁকে ঘিরে বসি, তাঁর মুখ থেকে ভিতরের কথা শুনতে পাব ব'লে। তিনিও আমাদের আগ্রহ নিবারণ করতে আপত্তি করতেন না। বেশ গুছিয়ে গুছিয়ে আমাদের শোনাতেন তখনকার নানা রাজনৈতিক ঘটনার কথা। তাঁর মুখে আমরা সে যুগের প্রখ্যাত রাজনীতিজ্ঞদের ব্যক্তিগত জীবনেরও অনেক কথা শ্রবণ করেছি।

কিন্তু কেবল রাজনীতি, আইন ব্যবসায় বা দেশহিতকর বিবিধ কর্তব্য নিয়েই নির্মলচন্দ্র নিজেকে ব্যাপৃত রাখেননি। সাহিত্যিক না হয়েও তিনি সাহিত্যরসিক। নইলে কর্মব্যস্ততার ভিতর থেকে ছুটি নিয়ে যখন-তখন সাহিত্যিকদের সঙ্গে উঠতে বসতে আসতেন না। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব-বন্ধন সুদৃঢ় হয়ে উঠেছিল। শরৎচন্দ্রও কিছুকাল রাজনীতি নিয়ে যারপরনাই মাথা ঘামিয়েছিলেন। প্রায়ই গিয়ে হাজির হতেন নির্মলচন্দ্রের ভবনে। তাঁদের দুজনের মধ্যে কে বেশী ক'রে কার প্রেমে মশগুল হয়েছিলেন, সে কথা আমি বলতে পারব না।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও নির্মলচন্দ্রের দেখা পেয়েছি। তিনি প্রকাশ করেছিলেন একখানি দৈনিক পত্রিকা। বৈকালে দেখা দিত ব'লে তার নাম হয়েছিল "বৈকালী"। বোধ করি সে হচ্ছে ঊনত্রিশ-ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। সম্পাদনায় তাঁকে সাহায্য করতেন শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (পরে "ভারত" সম্পাদক)। শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ও তাঁদের দলে ছিলেন ব'লে মনে হচ্ছে। কিছুদিন আমিও ছিলুম "বৈকালী"র নিয়মিত নিবন্ধলেখক।

মাঝে মাঝে সখ ক'রে "বৈকালী" কার্যালয়ে বেড়াতে যেতুম। "বৈকালী" কার্যালয় বলতে বুঝায় "বসুমতী" কার্যালয়। "বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরে"র দ্বিতলের দালানের একদিকে ব'সে কাজ করতেন "বৈকালী"র কর্মীরা। এখন সে জায়গাটা ঘিরে নিয়ে হয়েছে "বসুমতী"র বিজ্ঞাপন বিভাগের আপিস। "বৈকালী" ছাপা হ'ত "বসুমতী" প্রেসেই।

সেইখানে আলাপ-পরিচয় হয় "বসুমতী"র কর্ণধার স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি সংবাদপত্র চালনা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করলেন। তাঁর সঙ্গে হয়েছিল আরো কোন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা। এতদিন পরে সব কথা মনে পড়ে না। য়ুরোপ থেকে "দৈনিক বসুমতী"র জন্যে মস্ত বড় এক নতুন প্রেস এসেছে, একদিন তিনি আমাদের নিয়ে নীচে নেমে তাই দেখিয়ে আনলেন। বেশ সদালাপী মানুষ।

নাট্যকলার জন্যেও নির্মলচন্দ্রের মনের মধ্যে ছিল যথেষ্ট প্রেরণা। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে শিশিরকুমারের আবির্ভাবের ফলে গিরিশোত্তর যুগের বাংলা রঙ্গালয়ের পুরানো বনিয়াদ নড়বোড়ে হয়ে যায়। তবে সে যাত্রা শিশিরকুমার এখানে স্থায়ী হ'তে পারেননি। সকলকে অভিভূত ক'রে তিনি দৃশ্যমান ও অদৃশ্য হন ধূমকেতুর মত। কিন্তু নাট্যরসিক বাঙালীর মন তখন সচেতন হয়ে উঠেছে। অভিনয়ের নামে বেলেখেলা নিয়ে ভুলে থাকতে তারা আর রাজি হ'ল না। চাইলে সবাই নবযুগের অভিনব অবদান।

সেই চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে বাহির থেকে যাঁরা বাংলা

রঙ্গালয়ের অন্দরমহলে প্রবেশ করলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন নির্মল-চন্দ্রও। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও বাংলা রঙ্গালয়ের অনুরাগী ছিলেন। মনে মনে তিনি এখানে জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পও পোষণ করতেন, কিন্তু তা বিফল হয় তাঁর অকালমৃত্যুর জন্যে। দেশবন্ধুর অনুগামী নির্মলচন্দ্রও যে নাট্যকলারসিক হবেন, সেটা কিছু বিস্ময়কর নয়। তিনিও হলেন নবগঠিত আর্ট থিয়েটারের অন্যতম পরিচালক।

এই নব প্রতিষ্ঠানের পরিচালকরা প্রথমেই বুঝে নিলেন, একান্তভাবে সেকেলে মালের বেসাতি আর চলবে না। চাই আধুনিকতা, চাই তাজা মুখ, চাই নূতন রক্ত। অতএব তাঁদের আমন্ত্রণে সাড়া দিলেন স্বর্গীয় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় ইন্দু মুখোপাধ্যায়, স্বর্গীয় তিনকড়ি চক্রবর্তী, শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র ও শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি। সুফল ফলতেও বিলম্ব হ'ল না। নাটক হিসাবে "কর্ণার্জুন" কিছুমাত্র অসাধারণ না হয়েও কেবল নূতন রক্তের জোরেই একাদিক্রমে শতাধিক রজনী অভিনীত হবার গৌরব অর্জন করলে।

আর্ট থিয়েটারের সকলেই শিশিরকুমারের পক্ষে ছিলেন না। নিজের সম্প্রদায় নিয়ে তিনি যখন নাট্যজগতে পুনরাগমন করলেন, তখন তাঁরা সাধ্যমত বাধা দিতে ছাড়েননি। কিন্তু ওখানকার অন্যতম পরিচালক হয়েও নির্মলচন্দ্র ছিলেন শিশিরকুমারের অনুরাগী বন্ধু। তাই শিশিরকুমারের যাত্রাপথ সুগম করবার জন্যে তিনি আর্থিক সাহায্য দান করতেও বিরত হননি।

সামাজিকতার দিকেও তিনি যথেষ্ট সচেতন। ক্রিয়াকর্মে বহু বন্ধুবান্ধবকে সাদর আমন্ত্রণ করতে ভোলেন না। একাধিকবার আমাকেও স্মরণ করেছিলেন। তাঁর রসালাপ শুনে ও ভূরিভোজন ক'রে ফিরে এসেছি। ভূরিভোজন! এই 'রেশনে'র যুগে কথাটাকে আজব ব'লে মনে হয়।

একবার তাঁর একসঙ্গে জোড়া পুত্রলাভ হয়। তিনি ঘটা ক'রে এক দোলযাত্রার দিনে স্টীমার-পার্টির আয়োজন করলেন। আমন্ত্রিত হলেন বহু বিখ্যাত ব্যক্তি। আমিও বিখ্যাত না হ'লেও উপেক্ষিত হইনি। যাত্রা সুরু হ'ল সকাল বেলায়। ত্রিবেণী পর্যন্ত গিয়ে ফিরে

এলুম সারাদিন কাটিয়ে। জলযানে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ, মুক্তবায়ু সেবন, বন্ধু-সম্মিলন, রসভাষণ, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে'র সঙ্গীত শ্রবণ এবং ভুরি-ভোজন। সেই আনন্দময় দিনটিকে আজও মনে ক'রে রেখেছি।

সব দিক দিয়ে শিষ্ট, মিষ্ট ও বিশিষ্ট এই মানুষটি কলকাতার পুরাধ্যক্ষ বা মেয়র পদে বৃত হয়েছেন। নির্বাচকরা করেছেন যথার্থ গুণীর আদর।

আট

সেরাইকেলার রাজাসাহেব

উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ ও পাটনা প্রভৃতির মত সেরাইকেলাও এতদিন ছিল একটি করদ রাজ্য। আকারে বৃহৎ নয়। সম্প্রতি ভারতের অন্তর্গত হয়েছে।

কিছুকাল আগে সেরাইকেলাকে বিহারের ভিতরে চালান ক'রে দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু তার উপরে আছে উড়িষ্যার ন্যায়সঙ্গত দাবি। কারণ সেখানকার বাসিন্দারা নিজেদের উড়িয়া ব'লেই মনে করে এবং উড়িয়া ভাষাতেই কথা কয়। বাংলাদেশের সঙ্গেও তার যথেষ্ট সংস্রব আছে, কারণ সে বাংলারই প্রতিবেশী এবং সেরাইকেলার বাসিন্দারা বাংলাভাষাও বেশ বোঝে।

কিন্তু বাংলাদেশের প্রতিবেশী হ'লেও তেরো-চৌদ্দ বৎসর আগেও আমি সেরাইকেলার নাম পর্যন্ত জানতুম না, কারণ তার কোন বিশেষ অবদান বাংলাদেশের ভিতরে এসে পৌঁছয়নি।

তাই স্বর্গত প্রমোদ-পরিচালক হরেন ঘোষ যখন প্রস্তাব করলেন, "সেরাইকেলার রাজাসাহেবের কাছ থেকে আমন্ত্রণ এসেছে। ওখানকার স্থানীয় নাচ দেখতে যাবেন?" আমি প্রলুব্ধ হলুম না। বহুকাল আগে ইংলণ্ডের এক যুবরাজের কলকাতা আগমন উপলক্ষে এখানে ময়ূরভঞ্জের পাইকদের নাচ দেখানো হয়েছিল এবং সে নাচ হয়েছিল অত্যন্ত লোকপ্রিয়। কিন্তু সেরাইকেলার নাচ কখনো দেখিনি বা তার কথাও কারুর মুখে শুনিনি। কাজেই অবহেলাভরে হরেনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলুম। পরের বৎসরে আবার এল রাজাসাহেবের আমন্ত্রণ। ইতিমধ্যে নৃত্যবিশেষজ্ঞ হরেন ঘোষের মুখে সেরাইকেলার ছউ নাচের উজ্জ্বল বর্ণনা শ্রবণ ক'রে মনের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে প্রভূত কৌতূহল। গ্রহণ করলুম দ্বিতীয় বারের আমন্ত্রণ। কলকাতা থেকেই রাজাসাহেবের অতিথিরূপে ট্রেণে গিয়ে আরোহণ করলুম।

ছউ নাচ দেখলুম যথাসময়ে। পাহাড়, প্রান্তর, কান্তার ও নদীর

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝখানে সহর থেকে দূরে গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে মনুষ্যসৃষ্ট চারুকলার এত ঐশ্বর্য যে লুকিয়ে থাকতে পারে, এমন কল্পনা মনেও আসেনি। কেবল পরিকল্পনার মাধুর্যে ও বিস্ময়প্রাচুর্যে নয়, ছন্দসৌকুমার্যে, ভঙ্গি-বৈচিত্র্যে ও কাব্যলালিত্যেও সেরাইকেলার এই ছউ নৃত্য আমার চিত্তকে ক'রে তুললে সমৃদ্ধ ও উৎসবময়। ভারতের অধিকাংশ প্রাদেশিক নৃত্যের মত এ নাচ একদেশদর্শী নয়, মানুষের বিচিত্র জীবনকে এ দেখতে ও দেখাতে চেয়েছে সকল দিক দিয়েই। পৌরাণিক, আধুনিক, লৌকিক, আধ্যাত্মিক, ঐতিহাসিক, সাংসারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, কাল্পনিক ও বস্তুতান্ত্রিক তাবৎ চিত্রই ফুটে ওঠে এই নাচের ছন্দোবদ্ধ আঙ্গিক অভিনয়ের ভিতর দিয়ে। উদয়শঙ্করের আবির্ভাবের আগেই এমন এক সর্বতোমুখ নৃত্য বাংলাদেশের পাশেই সেরাইকেলার সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে লালিত হয়ে এসেছে, অথচ সে সংবাদ বাইরের কেহই পায়নি। বাংলাদেশে এই অপূর্ব নৃত্যের কাহিনী সর্বপ্রথমে প্রকাশিত হয় আমার দ্বারা সম্পাদিত "ছন্দা" পত্রিকায়, সে হচ্ছে মাত্র এক যুগ আগেকার কথা।

ভারতনাট্যম্, কথাকলি, মণিপুরী বা কথক প্রভৃতি নৃত্য প্রচুর প্রশস্তি লাভ করেছে, কিন্তু ওদের কোনটির মধ্যেই প্রকাশ পায় না আধুনিক যুগধর্ম, ওরা প্রাণপণে আঁকড়ে আছে অতীতকেই। আমরা ওদের দেখি, খুসি হই, উপভোগ করি, অভিনন্দন দি, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার কোলে মানুষ হয়ে ওদের প্রাণের আত্মীয় ব'লে মনে করতে পারি না, কারণ ওদের মধ্যে খুঁজে পাই না বর্তমানের প্রাণবস্তু। এইজন্যেই উদয়শঙ্কর যখন অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রেখে নব নব পরিকল্পনায় আধুনিক মনের খোরাক জোগাবার ভারগ্রহণ করলেন, তখনই তিনি হয়ে উঠলেন আবালবৃদ্ধবনিতার প্রেয় স্বজন। তাঁরও বিশেষ গুণপনা এবং সৃষ্টিক্ষম প্রতিভার দিকে সর্বপ্রথমে বাংলাদেশের রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল মৎসম্পাদিত "নাচঘর" পত্রিকাতেই।

কিন্তু উদয়শঙ্করের আগেও যে অতীতের ঐতিহ্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ না ক'রেও গোঁড়ামির শৃঙ্খল ছিঁড়ে ভারতীয় নৃত্যকলার

মধ্যে যুগোপযোগী নূতনত্ব আনবার চেষ্টা হয়েছিল, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই ছউ নাচ। তবে সে সত্য বহু দিন পর্যন্ত সকলের অগোচরে থেকে গিয়েছিল চক্ষুষ্মান সমালোচকের অভাবে।

ছউ নাচের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিপালক হচ্ছেন সেরাইকেলার রাজা শ্রীআদিত্যপ্রতাপ সিং দেও বাহাদুর। নাচ দেখবার পর তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হ'ল। আমি বললুম, "রাজাসাহেব, সেরাইকেলার এমন একটা অপূর্ব অবদানের কথা বাইরের লোক জানে না। দুঃখের বিষয়, তাঁদের জানাবার জন্যে কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টাও হয়নি।"

সেখানে আরো কেউ কেউ উপস্থিত ছিলেন। কে একজন বললেন, "এ নাচকে আমরা সেরাইকেলার নিজস্ব ব'লে মনে করি। একে দেশের বাইরে নিয়ে গেলে আরো অনেকেই এর নকল করতে পারে।" অর্থাৎ তাঁর ধারণা, সাত নকলে আসল খাস্তা হওয়ার সম্ভাবনা।

ভারতবর্ষে আর্টের কোন কোন ক্ষেত্রে এই রকম সংকীর্ণ মনোবৃত্তি পোষণ করা হয়—বিশেষ ক'রে "ক্লাসিকাল" সঙ্গীতকলার। ওস্তাদরা সঙ্গীতের বিশেষ বিশেষ গুপ্তকথা বাইরে কারুর কাছে ব্যক্ত করতে চাননি, তা জানতে পেরেছে বংশানুক্রমে কেবল তাঁদের উত্তরাধিকারীরাই।

পরমাণু-বোমার নির্মাণপদ্ধতি লুকিয়ে রাখা উচিত, কারণ তা সুলভ হ'লে পৃথিবী থেকে মনুষ্যজাতি লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ললিতকলা করে বিশ্বের কল্যাণসাধন। যা সর্বজনভোগ্য, তাকে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বন্দী রাখা স্বার্থপরতা।

উপরন্তু অনুকরণের দ্বারা শ্রেষ্ঠ আর্টের মহিমা কোনদিনই ক্ষুণ্ণ হয়নি। অননুকরণীয় হচ্ছেন কাব্যে রবীন্দ্রনাথ, চিত্রে অবনীন্দ্র-নাথ, অভিনয়ে শিশিরকুমার, নৃত্যে উদয়শঙ্কর প্রভৃতি। অনুকারীরা যখনই এঁদের অবলম্বন করেছেন, হাস্যাস্পদ ছাড়া আর কিছুই হ'তে পারেননি। পরে আমি ছউ নাচেরও ('শ্রীদুর্গা' নৃত্যের) অনুকরণ দেখেছি। কিন্তু সে অনুকৃতি দেখে আমার মনে পড়েছে চেরাগের তলায় অন্ধকারের কথা।

হরেন ঘোষের চেষ্টায় অবশেষে রাজা আদিত্যপ্রতাপের মত পরিবর্তন হয়। সেরাইকেলার নির্মোক ভেঙে ছউ নাচ প্রথমে কলকাতায় আসে এবং তারপর যায় য়ুরোপেও।

সেরাইকেলার যে প্রতিবেশের মধ্যে ছউ নাচ অনুষ্ঠিত হয়, দেশের বাইরে গিয়ে তাথেকে তাকে বঞ্চিত হ'তে হয়েছিল। ছউ নাচের স্বাভাবিক আসর হচ্ছে যাত্রার আসরের মত, শিল্পীদের চারিদিকেই দর্শকরা আসন গ্রহণ করে মণ্ডালাকারে। আধুনিক নাচঘরের অপ্রশস্ত আবেষ্টনের মধ্যে তার আবেদন ও স্বাধীনতা কতকটা ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারে না। কিন্তু তবু এখানে এবং পাশ্চাত্য দেশেও ছউ নাচ দেখে সবাই তুলেছিল ধন্য ধন্য রব। তাইতেই বোঝা যায় তার আবেদন হচ্ছে সার্বজনীন এবং তাকে প্রাদেশিক নৃত্য ব'লে গণ্য করা যেতে পারে না। আমাদের অধিকাংশ প্রাদেশিক নৃত্য সম্বন্ধে এমন কথা বলা যায় না। জন্মভূমির—বিশেষতঃ ভারতের—বাইরে গেলে তাদের পক্ষে জনপ্রিয়তা অর্জন করা কঠিন হয়ে উঠবে। কারুর প্রধান ভাষা হচ্ছে মুদ্রা, কারুর ভঙ্গী এবং কারুর বা নূপুরের বোল। যারা অধ্যবসায় সহকারে সে সব ভাষা শেখেনি, তাদের কাছে মাঠে মারা যায় নাচের সৌন্দর্য।

ছউ নাচ একটি বারংবার-প্রমাণিত সত্যকে প্রমাণিত করেছে পুনর্বার। ললিতকলার মাধ্যমে কেবল ব্যক্তিবিশেষের নয়, কোন অজানা দেশ বা জাতিও প্রখ্যাত হয়ে উঠতে পারে। পনেরো বৎসর আগে ক্ষুদ্র রাজ্য সেরাইকেলার নাম জানত কয়জন? কিন্তু ছউ নাচের প্রসাদে সেরাইকেলার নাম আজ ভারতের সর্বত্র এবং য়ুরোপেও সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। একেই বলতে পারি সাংস্কৃতিক দিগ্বিজয়।

রাজা আদিত্যপ্রতাপ এবং তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর স্বর্গীয় বিজয়-প্রতাপের তত্ত্বাবধানে যে সব ছউ নৃত্য পরিকল্পিত হয়েছে, সংখ্যায় সেগুলি অসামান্য। ভারতনাট্যম্ ও কথাকলির নৃত্যসংখ্যা আমি জানি না, কিন্তু যে বিশ্ববিখ্যাত রুসীয় নৃত্য-সম্প্রদায় পৃথিবীভ্রমণ করেছিল, তার চেয়ে ছউ নাচের সংখ্যা অনেক বেশী। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে সেরাইকেলা নৃত্য-সম্প্রদায় মোট একচল্লিশটি নাচ নিয়ে গিয়েছিল ইতালী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে। কিন্তু সেরাইকেলার নৃত্য-

তালিকা এর চেয়ে ঢের বেশী দীর্ঘ—বোধ করি শতাধিক হবে।

সাধারণত রাজা-মহারাজারা নিজেরাও শিল্পী হবার জন্যে আগ্রহপ্রকাশ করেন না, তাঁরা হন নানা কলাবিদ্যার পৃষ্ঠপোষকমাত্র। শিল্পীদের উৎসাহ দেন, অর্থসাহায্য করেন, তার বেশী আর কিছু নয়। কিন্তু সেরাইকেলা নৃত্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজা এবং রাজ-বংশীয় অন্যান্য ব্যক্তিগণ শিল্পীরূপেই যোগদান করেন। রাজা আদিত্যপ্রতাপ কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র নন, নিজেও একজন নৃত্যশিল্পী এবং চিত্রবিদ্যাতেও সুনিপুণ। বিশেষজ্ঞ সমালোচকরা জানেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের দ্বারা যে সব মুখোস গঠিত ও চিত্রিত হয়েছে, ললিতকলায় তা উচ্চ স্থান অধিকার ক'রে আছে। সেরাইকেলার নর্তকরা নাচের সময়ে মুখোস ব্যবহার করেন। অধিকাংশ মুখোসই রাজা আদিত্যপ্রতাপের নিজের হাতেই তৈরি। বিভিন্ন রসাশ্রিত নৃত্যনাট্যের পাত্র-পাত্রীদের চারিত্রিক বিশেষত্ব সেই সব মুখোসের উপরে ফুটে উঠেছে যথাযথ বর্ণের আলেপনে ও তুলির টানে চমৎকার ভাবে।

রাজভ্রাতা স্বর্গীয় কুমার বিজয়প্রতাপও ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী এবং উড়িয়া ভাষার একজন সুলেখক। তিনি কবিতা, নাটক ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন রাজাসাহেবের দক্ষিণ হস্তের মত। সেরাইকেলার অধিকাংশ নৃত্যনাট্য পরিকল্পনা ও রচনা করেছেন তিনিই এবং সেই সঙ্গে নিয়েছেন নাচ শেখাবারও ভার।

স্বর্গীয় কুমার শুভেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন রাজাসাহেবের পুত্র ও সম্প্রদায়ের প্রধান শিল্পী। তাঁর মধ্যে ছিল প্রথম শ্রেণীর নৃত্যপ্রতিভা। শুভেন্দ্রনারায়ণের নাচ দেখে বিলাতের সমালোচক উদয়শঙ্করের সঙ্গে তাঁর তুলনা করেছিলেন। তাঁর রাধাকৃষ্ণ, ময়ূর, চন্দ্রভাগা, দুর্গা, নাবিক ও সাগর প্রভৃতি অমৃতায়মান নাচের কথা কখনো ভুলতে পারব না। আজ তিনি অকালে গিয়েছেন পরলোকে, কিন্তু আজও মনের মধ্যে জীবন্ত হয়ে আছে নৃত্যপর শুভেন্দ্রনারায়ণের লীলায়িত মূর্তি।

রাজাসাহেবের আরো দুই নৃত্যপটু পুত্র নৃত্যনাট্যে বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই রাজবংশের আর এক অসাধারণ নৃত্য-

শিল্পী হচ্ছেন কুমার শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ। রৌদ্র ও বীর রসের নাচে তাঁর অতুলনীয় দক্ষতা।

বহু রাজপরিবারের কথা জানি, কিন্তু এমন শিল্পী রাজ-পরিবার আর দেখিনি। আমাদের দেশীয় নৃপতিদের বিলাস-ব্যসনের কথা পরিণত হয়েছে প্রবাদবচনে। কিন্তু এই এক অদ্বিতীয় রাজপরিবার, যেখানে সকলেই অবহিত হয়ে থাকেন শিল্পসাধনায়। তাঁরা কেবল শিল্পী নন, প্রত্যেকেই কৃতবিদ্য, বিনয়ী ও সদালাপী। সেরাইকেলার রাণীসাহেবও শিল্পী স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী। স্বর্গত পুত্র শুভেন্দ্রনারায়ণের জন্যে তিনি যে স্মৃতিসৌধের মডেল স্বহস্তে গড়েছিলেন, তা দেখেই আমি তাঁর শিল্পবোধের পরিচয় পেয়েছিলুম। সেরাইকেলার যুবরাজও নট এবং নাট্যকার। রাজা আদিত্যপ্রতাপের প্রেরণাতেই এই পরিবারের মধ্যে যে উপ্ত হয়েছে সাহিত্য ও ললিতকলার বীজ, এটুকু অনুমান করা যায় অনায়াসেই।

চৈত্র মাসে এখানে যে বসন্তোৎসব হয়, তার নাম "চৈত্র-পর্ব"। গাছে গাছে পাখীরা গান গায়। বনে বনে ফুল ফোটে। চোখের সামনে জাগে তরুণ শ্যামলতা। সুগন্ধনন্দিত সমীরণে পাওয়া যায় যে আনন্দের ছন্দ, তারই প্রতিধ্বনি বাজতে থাকে নরনারীর অন্তরে অন্তরে। বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে মিলে যায় অন্তঃপ্রকৃতি এবং ছউ নাচের নূপুরে নূপুরে সেই মিলনেরই বাণী ধ্বনিত হয়ে ওঠে। তখন বাজে বংশী, বাজে মৃদঙ্গ এবং জাঁকিয়ে বসে নাচের সভা। সভানায়ক হন স্বয়ং রাজাসাহেব।

ছয়-সাত বৎসর আগে চৈত্র-পর্বের সময়ে শুভেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রাজাসাহেবের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে আমি দ্বিতীয়বার সেরাইকেলায় যাই এবং তাঁর অনুরোধে একটি বৃহৎ সভায় শুভেন্দ্রনারায়ণের নৃত্যকুশলতা নিয়ে আলোচনা করি। যথা-সময়ে সেই আলোচনাটি "মাসিক বসুমতী"তে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে।

সেরাইকেলা থেকে সিনি স্টেশনে আনাগোনা করবার পথটিও আমার বড় ভালো লাগে।

নয়

মোহিতলাল মজুমদার

আমার বয়স তখন কত? ঠিক মনে নেই, তবে অর্ধশতাব্দী আগেকার কথা বলছি নিশ্চয়ই। এবং এটাও ঠিক, তখনও আমি কৈশোর অতিক্রম করিনি।

স্বর্গীয় ডক্টর সত্যানন্দ রায় ছিলেন আমার প্রতিবেশী ও দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়। ছেলেবেলায় তাঁর চেয়ে ঘনিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সুহৃদ আমার আর কেউ ছিলেন না। সত্যানন্দ পরে বিলাতে যান এবং সেখান থেকে ফিরে এসে কলকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা বিভাগে প্রধান কর্মচারীর পদে অধিষ্ঠিত হন।

সত্যানন্দের সঙ্গে সেই কিশোর বয়স থেকেই সুরু হয়েছিল আমার সাহিত্যসাধনা। বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ বিখ্যাত রচনা তখনই আমরা প'ড়ে ফেলেছি এবং বিলাত থেকেও আনাতুম বালকদের উপযোগী ভালো ভালো বই। তখনকার এক চমৎকার গ্রন্থমালার কথা আজও আমার মনে আছে, তা হচ্ছে বিখ্যাত ডবলিউ টি স্টেডের সম্পাদনায় প্রকাশিত "দি বুক ফর দি বের্ন্স্"। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রখ্যাত কথাগ্রন্থগুলি ছোটদের উপযোগী ক'রে পরিবেশন করা হ'ত। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্যও ছিল যৎসামান্য।

সত্যানন্দ ও আমার, দু'জনেরই ছিল একখানি ক'রে হাতে-লেখা পত্রিকা। সত্যানন্দ ছিলেন কেবল প্রবন্ধকার, কিন্তু আমি সমান বিক্রমে আক্রমণ করতুম প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা প্রভৃতি বিভাগকে। লেখাগুলিকে অবশ্য ছাইভস্ম বললে অত্যুক্তি হবে না। যদিও আমার সেই হস্তলিখিত পত্রিকারই একটি গল্প দু তিন বৎসর পরে ছাপার হরপে "বসুধা" মাসিকপত্রে স্থান পায়। সেই-ই আমার প্রকাশিত প্রথম রচনা। আর এক বিষয়েও সত্যানন্দ আমার কাছে হেরে যেতেন। তিনি তুলি ধরতে পারতেন না, আমি পারতুম। (এবং আঁকতুম কেবল কাকের ছানা বকের ছানা)। কাজেই আমার পত্রিকা ছিল সচিত্র।

আমাদের সেই সাহিত্যসাধনার উদ্‌যোগ-পর্বে সত্যানন্দের বাড়িতেই প্রথম দেখি মোহিতলাল মজুমদারকে। সত্যানন্দের সঙ্গে তাঁরও কি যেন একটা দূর-সম্পর্ক ছিল। সে বয়সে আলাপ জমতে দেরি হয় না। বালকরা কথায় কথায় বন্ধু পায় এবং বন্ধু হারায় (আর বলতে কি সাহিত্যক্ষেত্রে তরলমতি বুড়ো খোকারও অভাব নেই)। মোহিতলাল সেখানে গিয়েছিলেন দুই-তিনবার। সে সময়ে কিরকম বিষয়বস্তু আমরা আলাপ্য ব'লে মনে করতুম, আজ আর তা স্মরণে আসছে না। মোহিতলাল সেই বয়সেই কাব্যকুঞ্জবনে প্রবেশ করেছিলেন কিনা, তাও আমি বলতে পারব না। অন্তত তাঁর মুখ থেকে এ সম্পর্কে কোন কথা শুনেছিলুম ব'লে মনে হচ্ছে না। তবে তাঁর দিকে যে আমি আকৃষ্ট হয়েছিলুম, তাতে আর সন্দেহ নেই।

আমাদের সেই সাহিত্যের বেলেখেলাঘরেই মাঝে মাঝে আর একটি বালক আসতেন, পরে যিনি এখানকার সাহিত্য সমাজে বিশেষ আলোড়ন উপস্থিত করেছিলেন। তিনি হচ্ছেন "কল্লোল" সম্পাদক স্বর্গীয় দীনেশরঞ্জন দাস। কিন্তু তিনি তখন কালিকলম নিয়ে সুবোধ বালকের মত ইস্কুলের লেখাপড়া ছাড়া আর কিছু করতেন ব'লে মনে হয় না।

বালক হ'ল যুবক, কাঁচা হ'ল পাকা। কেটে গেল কয়েকটা বছর। আমার নানাশ্রেণীর রচনা প্রকাশিত হয় "ভারতী", "নব্য-ভারত", "মানসী", "বাণী", "ঐতিহাসিক চিত্র", "অর্চনা", "জন্মভূমি" ও অন্যান্য পত্রিকায়। সেই সময়ে একদিন অধুনালুপ্ত প্রখ্যাত বিদ্যায়তন "শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা"র ত্রিতলের ঘরে গিয়ে সবিস্ময়ে দেখলুম কবির এক পরম সাধক মূর্তি। দেখলুম শয্যাগত, উত্থান-শক্তিহীন বৃদ্ধ কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেনকে। তাঁর দৃষ্টি প্রায় অন্ধ, সর্বাঙ্গ বাতে পঙ্গু, হাতে কলম পর্যন্ত ধরতে পারেন না, তবু নিদারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যেও প্রশান্ত আননে মুখে মুখেই তিনি রচনা ক'রে যাচ্ছেন কবিতার পর কবিতা। কোন কবিতার মধ্যেই নেই ব্যাধিজর্জর দেহের দুঃখ-বেদনার সুর, কোন কবিতাতেই নেই অন্ধকারের ছোপ, প্রত্যেক কবিতাই হচ্ছে আলোর কবিতা, যার প্রভাবে হাহাকারও হয় নন্দিত ও নিস্তব্ধ। মন করলে নতিস্বীকার।

কবির রোগশয্যার পার্শ্বেই আবার দেখা পেলুম বাল্যবন্ধু মোহিতলালের।

তীর্থযাত্রীর মত প্রায় প্রত্যহই যেতুম দেবেন্দ্রসদনে। প্রতিদিন না হোক, প্রায়ই সেখানে মোহিতলালের সঙ্গে দেখাশুনো হ'তে লাগল, এবং অবিলম্বেই আবিষ্কার করলুম তিনি তখন হয়েছেন কাব্যগত-প্রাণ। কেবল কবিতা-পাঠক নন, কবিতা-লেখকও—যদিও সাময়িক পত্রিকায় তাঁর কোন কবিতা তখনও আমার চোখে পড়েনি। তিনি নিজেই স্বলিখিত কবিতা পাঠ ক'রে শোনালেন। ভালো লাগল।

দিনে দিনে জ'মে উঠল আমাদের আলাপ, দৃঢ়তর হ'ল আমাদের মৈত্রীবন্ধন। দেখা হ'লেই কবিতার প্রসঙ্গ, সময় কাটে কাব্যালোচনায়। কোন কোন দিন এক সঙ্গেই যাই কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী বা কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। সেখানেও হ'ত নতুন নতুন কবিতা শোনা, উঠত স্বদেশী-বিদেশী নানা কবি ও কবিতার প্রসঙ্গ। জীবন হয়ে উঠেছিল কবিতাময়। দু'জনের কেহই তখনও সংসারে লব্ধপ্রবেশ হ'তে পারিনি, কারুকেই ঝড়-ঝাপটাও সহ্য করতে হয়নি, তাই এটা আমাদের ধারণার বাইরে থেকে গিয়েছিল যে, কবিতা যতই মহত্তম হোক, জীবনের যাত্রাপথে তাকে সম্বল ক'রে পথ চলতে হলে যথেষ্ট বিড়ম্বনার সম্ভাবনা আছে। মোহিতলালের মনের কথা বলতে পারি না, তবে নিজে আমি এ সত্যটি উপলব্ধি করেছি বহু বিলম্বে, অত্যন্ত অসময়ে। তিনকাল গিয়ে যখন এক কালে ঠেকে, তখন আর কেঁচে গণ্ডূষ করা চলে না।

"যমুনা" পত্রিকার কার্যালয়ে বসল আমাদের বৃহৎ আসর। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বৈঠক হয়ে উঠল জমজমাট। সেখানেও সর্বদাই কাব্যকৌমুদীতে মন হয়ে থাকে প্রসন্ন। নিয়মিতভাবে আসা-যাওয়া করেন মোহিতলাল। তাঁর লেখনীও কবিতা প্রসব করে ঘন ঘন। তিনি কেবল লিখেই তুষ্ট থাকতে পারেন না, স্বরচিত কবিতা অপরকে শোনাবার জন্যেও আগ্রহ তাঁর উদগ্র। হয়তো সন্ধ্যা উৎরে গিয়েছে। কলকাতার পথে গ্যাসের আলো জ্বলেছে। মোহিতলাল চলেছেন পদব্রজে। তাঁর পকেটে আছে একটি নূতন কবিতা। বুঝি সেটি তখনও কারুকে শোনানো

হয়নি। হঠাৎ এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। মোহিতলাল অমনি ফুট-পাথের উপরে একটা গ্যাসপোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর সেই জনাকীর্ণ পথকে গ্রাহ্যের মধ্যে না এনেই বন্ধুকে সামনে রেখে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন।

"যমুনা" পত্রিকা উঠে গেল। সেখানেই বসল সাপ্তাহিক সাহিত্যপত্রিকা "মর্মবাণী"র বৈঠক। সভ্যের সংখ্যা আরো বেড়ে উঠল। এলেন কথাশিল্পী মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, এলেন কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ও আসতেন মাঝে মাঝে। করুণানিধান ও অন্যান্য কবিরাও আসতেন। সেই-খানেই শ্রীকালিদাস রায়কেও প্রথম দেখি। মোহিতলাল আসতেন। তিনি তখন উদীয়মান কবি হিসাবে সুপরিচিত হয়েছেন।

অধিকাংশ বাংলা পত্রিকাই দীর্ঘজীবন লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে না। খোঁটার জোর থাকলেও অকালমৃত্যু তাদের ছিনিয়ে নেয়। আমাদের সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাস হচ্ছে ঘন ঘন জন্ম ও মৃত্যুর ইতিহাস। নাটোরাধীশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ ক'রেও "মর্মবাণী" আত্মরক্ষা করতে পারলে না। এক বৎসর পরে মাসিক "মানসী"র সঙ্গে মিলে কোন রকমে তখনকার মত মানরক্ষা করলে। এখন "মানসী ও মর্মবাণী"ও অতীতের স্মৃতি।

"ভারতী" সম্পাদনার ভার গ্রহণ করলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে আহূত হলুম আমি। "ভারতী" কার্যালয়েই বসল আমাদের নতুন বৈঠক—রবীন্দ্রনাথের ভক্ত না হ'লে সেখানে কেউ বৈঠকধারী হ'তে পারতেন না। সেখানেও মোহিত-লাল যোগ দিলেন আমাদের দলে। এই সময়েই তাঁর কবিতাপুস্তক "স্বপনপসারী" প্রকাশিত হয়।

মোহিতলাল আধুনিক কবি হ'লেও এবং তিনি আধুনিক যুগ-ধর্মকে স্বীকার করলেও, তাঁর কবিতার মূল সুরের মধ্যে পাওয়া যাবে পুরাতন যুগেরই প্রতিধ্বনি। কি পদ্যে এবং কি গদ্যে তাঁর ভাষাও মেনে চলে অতীতের ঐতিহ্য। তথাকথিত নূতনত্ব দেখাতে গিয়ে কোথাও তিনি যথেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেন না। এই নূতনত্বের মোহে একেলে অনেকের কবিতা হয়ে ওঠে রীতিমত উদ্ভট।

রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আধুনিক কবি এখনো এদেশে জন্মগ্রহণ করেননি। ভাবে ও ভাষায় তাঁকে ডিঙিয়ে আর কেউ এগিয়ে যেতে পারেননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোথাও উদ্ভট নন। শ্রেষ্ঠ কবিরা উদ্ভট হ'তে পারেন না। মোহিতলালেরও এ দোষ নেই।

কবিরূপে মোহিতলালের আসন যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে, তখন তিনি হাত দেন সাহিত্যের অন্য এক বিভাগে। পদ্যে নয়, গদ্যে। তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সময়েই বুঝতে পারতুম, তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যবোদ্ধা। দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ তিনি কেবল সাগ্রহে অধ্যয়নই করেন না, অধীত বিষয় নিয়ে স্বাধীনভাবে যথেষ্ট চিন্তাও করেন। সমালোচক হবার অনেক গুণ পূর্বেই তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছিলুম, কিন্তু গোড়ার দিকে প্রকাশ্যভাবে তিনি সমালোচকের আসনের দিকে দৃষ্টিপাত করেননি, মশগুল হয়ে ছিলেন কবিতার প্রেমেই।

বাংলা দেশে আজকাল সাহিত্যপ্রবন্ধের এবং সমালোচনার অভাব হয়েছে অত্যন্ত। প্রবন্ধের দৈন্য বেড়ে উঠছে দিনে দিনে এবং যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তার অধিকাংশেরই মধ্যে থাকে না সাহিত্যরস। মাসিকপত্রগুলি হাতে নিলে দেখি, রাশি রাশি গল্প আর উপন্যাসের ভিড়ে, দু-একটা চুট্‌কি নিবন্ধ কোনরকমে কোণঠাসা হয়ে আছে। আগেকার ধারা ছিল আলাদা। আগে গল্প বা উপন্যাস নয়, পত্রিকার গৌরববর্ধন করত প্রবন্ধই। এদেশে যাঁরা শ্রেষ্ঠ সমালোচক ও প্রবন্ধকার ব'লে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের কেহই অতিআধুনিক যুগের মানুষ নন। গল্প ও উপন্যাস সাহিত্যের অন্যতম অঙ্গ বটে, কিন্তু প্রবন্ধদৈন্য ও স্থায়ী সমালোচনার অভাব থাকলে কোন সাহিত্যই উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হ'তে পারে না।

মোহিতলাল মানুষ হয়েছেন গত যুগেরই প্রতিবেশ-প্রভাবের মধ্যে। তাই অতিআধুনিকদের ছোঁয়াচ লাগেনি তাঁর মনে। তিনি এই সাহিত্যপ্রবন্ধের দুর্ভিক্ষের যুগেও অবাহিতভাবে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে ক'রে যাচ্ছেন প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ রচনা। প্রাচীন বয়সেও এ বিভাগে মোহিতলালের সাহিত্যশ্রম দেখলে বিস্মিত হ'তে হয়। আজকাল কবিরূপে নয়, সমালোচকরূপেই তাঁর দেখা পাওয়া যায়

যখন তখন। তাঁর সব মতের সঙ্গে যে সকলের মত মিলবে, এমন আশা কেউ করে না। বিভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি হয় বিভিন্ন। কিন্তু নির্ভীক, নিরপেক্ষভাবে সাহিত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা রেখে যিনি নিজের কর্তব্য পালন করবেন, তাঁকে অনায়াসেই অভিনন্দন দেওয়া চলে।

বলেছি, প্রাচীন বয়সেও মোহিতলালের সাহিত্যশ্রম হচ্ছে বিস্ময়কর। কিন্তু যখন তিনি ঠিক বৃদ্ধত্ব লাভ করেননি, তখনই তাঁর মনে জেগেছিল নিরাশার সুর। ষোলো বৎসর আগে ঢাকা থেকে একখানি পত্রে তিনি লিখেছিলেন : "ভাই হেমেন্দ্রকুমার, তোমার অতীত স্মৃতির আবেগভরা স্নেহপূর্ণ পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমাদের কাল এখন 'সেকাল' হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে যুগ এখনই কাব্যস্মৃতিময় হইয়া উঠিয়াছে। দুই চারিজন এখনও যাহারা এখানে-ওখানে ছড়াইয়া আছি, তাহাদের মধ্যে প্রাণের সূক্ষ্ম-তন্ত্রীর যোগ অদৃশ্য হইলেও দৃঢ় ও অটুট হইয়া আছে, বরং জীবনসায়াহ্নে প্রভাতের সেই অরুণ-রাগ ক্রমেই করুণ ও কোমল হইয়া উঠিতেছে, তার প্রমাণ তোমার ও আরও দুই-একজন বন্ধুর চিঠি। তুমি জানো, সাহিত্য আমার ধর্মব্রত ছিল; যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, তাহার জন্য নির্মমভাবে নিজের সকল স্বার্থ, আত্মপ্রীতি ও মমতা সকলই বর্জন করিয়াছি। সেজন্য "কত বান্ধব হয়েছে বিমুখ"। কিন্তু আজ আমি ক্লান্ত শ্রান্ত অবসন্ন, আমার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়াছে, মনের উৎসাহ আবেগ আর নাই, গত কয়েক মাস যাবৎ আমি লেখনীকর্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। যদি একটু সুস্থ হইতে পারি, তবে হয়ত জন্মগত ব্যবসায় আবার কিছু কিছু করিতে হইবে। তুমি যে এখনও সমান উৎসাহে সাহিত্যব্রত উদ্‌যাপন করিতেছ, ইহা কম কৃতিত্বের কথা নয়। প্রার্থনা করি, তোমার আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হউক এবং আমাদের বিদায় গ্রহণের বহু পরেও গত যুগের সাক্ষীরূপে তুমি মাঝে মাঝে আমাদিগকে স্মরণ করিও। সেজন্যও তোমার দীর্ঘায়ুঃ কামনা করি" প্রভৃতি।

কিন্তু মহাকালের কবলে "আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান"—মোহিতলাল, না আমি? তারই যখন নিশ্চয়তা নেই, তখন মোহিত-

লাল ইহলোকে বিদ্যমান থাকতে থাকতেই বন্ধুকৃত্যটা সেরে ফেলাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কার্য। তিনি তো আমারই সমবয়সী, কার ডাক কবে আসবে, কে জানে?

শিশিরকুমারের আত্মপ্রকাশ

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে বাংলা দেশের বিভিন্ন বিভাগে এখনো এমন কয়েকজন প্রতিভাধর বাঙালী বিরাজ করছেন, সমগ্র ভারতে যাঁরা অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। যেমন চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু, ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, নাট্যশিল্পী শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর।

একটি কারণে শিশিরকুমারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলার বাইরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস ও নৃত্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু বাংলার বাইরে উল্লেখযোগ্য সাধারণ রঙ্গালয় নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না। পশ্চিম ভারতের একাধিক সহরে যে-সব অভিনয় দেখেছি তা রীতিমত হাস্যকর। দক্ষিণ ভারতের অনেক গুণী সাহিত্য, শিল্প ও নৃত্য-চর্চায় প্রভূত শক্তি প্রকাশ করেছেন বটে এবং চলচ্চিত্রেও সেখানকার কয়েকজন খ্যাতিমানের নাম করা যায়, কিন্তু আধুনিক কালেও সেখানে দানীবাবু, নির্মলেন্দু, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শিশির-কুমার, নরেশচন্দ্র মিত্র ও অহীন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতির সঙ্গে তুলনীয় একজন শিল্পীকেও আবিষ্কার করা যাবে না।

এ আমার নিজস্ব মত নয়। কিছুদিন আগে বোম্বাই প্রদেশ থেকে আগত একটি বিদুষী মহিলাকে আমি কলকাতার কোন কোন রঙ্গালয়ে নিয়ে গিয়েছিলুম। তিনি সবিস্ময়ে বলেছিলেন, "অভিনয় যে এমন অপূর্ব হওয়া সম্ভবপর, দক্ষিণ ভারতে কেউ তা কল্পনাতেও আনতে পারবে না। আমাদের দেশে মাঝে মাঝে অভিনয়ের যে আয়োজন হয়, এখানকার তুলনায় তাকে অভিনয় বলাই চলে না।" বিশেষভাবে তাঁকে অভিভূত করেছিল শিশিরকুমারের কৃতিত্ব। তাঁকে তিনি বলেছিলেন, "আপনি যদি আমাদের দেশে যান, তা'হলে সর্বত্রই অভিনন্দন লাভ করবেন।"

এবারে আমরা শিশিরকুমারের কথাই বলব। কিন্তু তাঁর গুণপনা ভালো ক'রে বুঝতে হ'লে কি-রকম পটভূমিকার উপরে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, সে সম্বন্ধেও কিছু কিছু ইঙ্গিত দেওয়া দরকার।

গিরিশোত্তর কালে প্রায় একযুগের মধ্যে বাংলা রঙ্গালয়ে এমন একজন নূতন শিল্পীকে দেখা যায়নি, যিনি দ্বিতীয়—এমন কি তৃতীয়—শ্রেণীতেও স্থানলাভ করতে পারেন। গিরিশ-যুগের গৌরবময় ঐতিহ্য বহন ক'রে তখনও বিদ্যমান ছিলেন যে কয়েকজন বিখ্যাত নট-নটী, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন দানীবাবু, তারকনাথ পালিত, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তারাসুন্দরী।

কিন্তু দানীবাবুর তারকা তখন আর ঊর্ধ্বগামী নয়। তিনি ভালো অভিনয় করেন বটে, কিন্তু যারা আগেকার দানীবাবুকে দেখেছিল, তারা তাঁর অভিনয়ের ভিতর থেকে আর কোন নূতনত্ব আবিষ্কার করতে পারত না।

তারক পালিত, অপরেশচন্দ্র ও তারাসুন্দরীর শক্তি তখনও অটুট ছিল। আমার তো মনে হয়, নাট্যজীবনের উত্তরার্ধেই অপরেশচন্দ্রের নাট্যনৈপুণ্য উঠেছিল অধিকতর উচ্চশ্রেণীতে। কিন্তু দর্শকদের মধ্যে প্রাকৃতজনরা সে সময়ে দস্তুরমত দলে ভারি হয়ে উঠেছিল। উচ্চ-শ্রেণীর অভিনয়ের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর নাটকের রোমাঞ্চকর ঘাত-প্রতিঘাতই তাদের আকৃষ্ট করত বেশী মাত্রায়।

ওথেলো নাটকে তারক পালিত, অপরেশচন্দ্র ও তারাসুন্দরী অপূর্ব অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু দর্শকদের সহানুভূতির অভাবে সে নাটকের পরমায়ু হয়েছিল খুব সংক্ষিপ্ত। ইবসেন অবলম্বনে রচিত "রাখীবন্ধন" নাটকেও তারক পালিত ও তারাসুন্দরীর অভিনয় হয়েছিল যারপরনাই চমৎকার। কিন্তু সে নাটকও দর্শক আকর্ষণ করতে পারেনি। তারপরেই তারক পালিতও রঙ্গালয়ের সংস্রব ত্যাগ করেন। কিন্তু তখনকার দর্শকরা অমন উঁচু দরের একজন শিল্পীরও অভাব অনুভব করেছিল ব'লে মনে হয়নি। আজকাল কাগজে কাগজে নাট্যজগতের রামা-শ্যামার যা তা খবর প্রকাশ করা হয়; কিন্তু নাট্যজগতে যাঁর স্থান ছিল ঠিক দানীবাবুর পরেই, সেই তারক

পালিত কবে ইহলোক ত্যাগ করেন, সে খবর পর্যন্ত কোন কাগজেই স্থান পায়নি।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দ। শুনলুম মনোমোহন থিয়েটারে একখানি ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় দেখবার জন্যে কাতারে কাতারে লোক ভেঙে পড়ছে। কৌতূহলী হয়ে দেখতে গেলুম। কিন্তু পুরো এক অঙ্ক পর্যন্ত অভিনয় দেখতে পারলুম না—যেমন নিকৃষ্ট নাট্যকারের রচনা, তেমনি প্রাণহীন অভিনয়! দানীবাবু পর্যন্ত নূতন কোন চরিত্র সৃষ্টির চেষ্টা না ক'রে নিজের পূর্বসঞ্চিত পণ্যের (Stock-in-trade) ভিতর থেকে বেছে বেছে যে কলকৌশলগুলি প্রয়োগ ক'রে গেলেন, তা ঘন ঘন হাততালির দ্বারা অভিনন্দিত হ'ল বটে, কিন্তু তার প্রত্যেকটিই ছিল আমার কাছে সুপরিচিত। বিতৃষ্ণা ভরা মন নিয়ে প্রকাশ্যে নাটক ও অভিনয়ের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ ক'রে প্রেক্ষাগার ছেড়ে বেরিয়ে এলুম। মজা দেখলুম এই, জনপ্রাণীও আমার বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রতিবাদ করলে না।

মনোমোহন থিয়েটারের পরেই লোকপ্রিয় ছিল তখন মিনার্ভা থিয়েটার। সেখানে আমার রচিত একখানি নাটিকা অভিনীত হয়েছিল। সেই সূত্রে আমি প্রায়ই রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে আনাগোনা করতুম। অবিলম্বে একখানি নূতন নাটকের মহলা শুরু হবে শুনলুম। একদিন গিয়ে দেখলুম নূতন পালার আপন আপন ভূমিকা নিয়ে মিনার্ভার দুইজন বিখ্যাত নট পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করছেন। একজন আর একজনকে ডেকে বললেন, "ওহে, পার্ট নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি তো অমুক পালায় অমুক পার্ট করেছ। এ পার্টটাও তারই মত। সেই পার্টটার মত ক'রে এটা ছ'কে নিলেই চলবে।"

কথা শুনে বিস্মিত হলুম। সত্যিকার অভিনেতারা এক একটি পুরাতন ভূমিকাও নূতন নূতন ধারণা (Conception) অনুসারে প্রস্তুত ক'রে তুলতে চেষ্টা করেন, আর এ'রা পুরাতন ভূমিকার ছাঁচে ফেলেই তৈরি করতে চান নূতন ভূমিকা!

আসল কথা, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিনেতার স্বাধীন মস্তিষ্কের সঙ্গে থাকত না অভিনয়ের সম্পর্ক। ধরা-বাঁধা নির্দিষ্ট

পদ্ধতিতে সকলে কাজ ক'রে যেতেন কলের পুতুলের মত। যে সব নাটকের চরিত্র, ভাব ও ভাষা হ'ত সম্পূর্ণ অভিনব, তখনকার বেশীর ভাগ অভিনেতার কাছেই তা হয়ে উঠত অত্যন্ত গুরুপাক।

এই জন্যেই নব্য বাংলার সুধীসমাজের সঙ্গে গিরিশোত্তর যুগের বাংলা রঙ্গালয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠবার সুযোগ হয়নি। শিক্ষিত ও সুরসিক দর্শকরা যে বাংলা রঙ্গালয়কে একেবারেই বয়কট করেছিলেন এমন কথা বলতে পারি না। কিন্তু দলে হাল্কা ছিলেন তাঁরা এবং দলে ভারি ছিল সেখানে প্রাকৃতজনরাই। প্রায় ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা রঙ্গালয়ের অবস্থা ছিল অল্পবিস্তর একই-রকম। এ অবস্থা যে হঠাৎ পরিবর্তিত হবে, এমন কোন লক্ষণ দেখা যায়নি তখন পর্যন্ত।

এই সময়ে কলকাতার ওল্ড ক্লাব নামক সৌখীন নাট্য প্রতিষ্ঠান থেকে স্টার থিয়েটারে একটি সাহায্য রজনীর আয়োজন হয়। সৌখীন শিল্পীদের উপরে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তবু উপরোধে প'ড়ে একখানি টিকিট কিনি। শুনলুম য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের শিশিরকুমার ভাদুড়ী "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" নাটকে ভীম ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। প্রফেসররূপে তাঁর খ্যাতি আগেই আমার কাণে গিয়েছিল এবং লোকের মুখে মুখে শুনতুম, তিনি নাকি ভালো অভিনয় করেন। কিন্তু অতি-সেকেলে পৌরাণিক নাটক "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে" একজন আধুনিক অধ্যাপক এমন কি স্মরণীয় অভিনয় করবেন, সেটুকু ধারণায় আনতে পারলুম না।

যবনিকা উঠল। দেখা গেল প্রথম দৃশ্য। গোড়া থেকেই দৃষ্টি হয়ে উঠল সচকিত, তারপর ক্রমে ক্রমে যা দেখতে ও শুনতে লাগলুম, আমার কাছে ছিল তা একেবারেই অভাবিত ব্যাপার! সেকেলে নাটক "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস"কে মনে হ'ল আনকোরা নতুনের মত। অভিনেতাদের চেহারাই খালি সুন্দর নয়, প্রত্যেকের ভাব, অঙ্গভঙ্গী, সংলাপ—এমন কি প্রবেশ ও প্রস্থানের পদ্ধতি পর্যন্ত কল্পনাতীত-রূপে অভিনব। কোথাও বহুপরিচিত কৃত্রিম থিয়েটারি ঢং নেই, প্রয়োগকৌশলেও প্রভূত স্বাতন্ত্র্য। এরকম উপভোগ্য বিস্ময়ের জন্যে

আদৌ প্রস্তুত ছিলুম না, আমার অবস্থা হ'ল আকাশ থেকে সদ্য-পতিতের মত।

আর একটা ব্যাপার সেইদিনই লক্ষ্য করলুম। বাল্যকাল থেকেই অভিনয় দেখে আসছি। কিন্তু বাংলা রঙ্গালয়ে কোনদিনই কোন পালাতেই প্রত্যেক নট-নটীকে সমানভাবে একসঙ্গে আপন আপন ভূমিকার উপযোগী অভিনয় করতে দেখিনি। এমন কি যে পালায় গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখর প্রভৃতি অতুলনীয় অভিনেতারা থাকতেন, সেখানেও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও অপ্রধান ভূমিকাগুলির অভিনয় প্রায়ই হ'ত নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর। তাই দেখে দেখে আমরা এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলুম যে, কৌতুক বোধ করলেও অসুবিধা বোধ করতুম না। লোকে তখন এক একজন বিখ্যাত ব্যক্তির উচ্চশ্রেণীর অভিনয় দেখলেই পরিতুষ্ট হ'ত, ছোট ছোট ভূমিকা নিয়ে কিছুমাত্র মাথা ঘামাত না।

কিন্তু "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে"র সেই সৌখীন পুনরভিনয়েই বাংলা রঙ্গালয়ে প্রথম দেখলুম, নাট্যাভিনয়ে প্রত্যেকেই—এমন কি মূক দৌবারিকটি পর্যন্ত ভূমিকার উপযোগী নিখুঁত অভিনয় ক'রে গেল। এও এক আশ্চর্য অগ্রগতি। শিশিরকুমারের যে কোন নাট্যানুষ্ঠানে আজ পর্যন্ত এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর আগে আর কেউ এদিকে সমগ্রভাবে দৃষ্টি দেননি। কেবল অর্ধেন্দু-শেখর এদিকে দৃষ্টি রাখবার চেষ্টা করতেন বটে, কিন্তু সে চেষ্টাও সম্পূর্ণরূপে সুফল প্রসব করতে পারত না। কিন্তু তাঁরও একটি বিশেষ দুর্বলতা ছিল। গিরিশচন্দ্রের উক্তি থেকে জানতে পারি, অনেক সময়ে তিনি বড় বড় ভূমিকাকে অবহেলা ক'রে ছোট ছোট ভূমিকা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থাকতেন।

"পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে"র সেই অভিনয়ে শিশিরকুমার যে প্রথম শ্রেণীর কলাকুশলতা প্রকাশ করলেন, এতদিন পরে তা নিয়ে আর বিশেষ আলোচনা না করলেও চলবে। কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, ভেবেছিলুম দেখব কোন নবীন শিক্ষার্থীকে, কিন্তু গিয়ে দেখলুম এক প্রতিভাবান ওস্তাদকে। তারপর সেইদিনই খবর পেলুম, সৌখীন শিল্পিরূপে এই হচ্ছে শিশিরকুমারের শেষ

অভিনয়, অদূর ভবিষ্যতেই তিনি আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রকাশ্য ভাবে যোগদান করবেন। মন আশান্বিত হয়ে উঠল।

সেদিনকার নাট্যানুষ্ঠানে আরো যাঁদের দেখা পাওয়া গেল, তাঁদের মধ্যেও নির্মলেন্দু লাহিড়ী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, ললিতমোহন লাহিড়ী, ও রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (দৃশ্য-পরিকল্পক) পরে সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগ দিয়ে নাম কিনে গিয়েছেন। এক দলে এতগুলি গুণীর আবির্ভাব! একালে আর কোন সৌখীন নাট্য-প্রতিষ্ঠান এমন গৌরব অর্জন করতে পারেনি।

আমি তখন দৈনিক "হিন্দুস্থান" পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তার পৃষ্ঠায় উচ্ছ্বসিত ভাষায় এই অভিনব শিল্পী সম্প্রদায়কে অভিনন্দন দান করলুম। তার ফলেই আমি শিশিরকুমারের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হই।

অনতিবিলম্বেই "আলমগীর" নাটকের নাম-ভূমিকায় শিশির-কুমারের রঙ্গাবতরণ হ'ল ম্যাডানদের কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে। সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা এতদিন সাধারণ রঙ্গালয়কে বিশেষ প্রীতির চোখে দেখতেন না, সেই বিশ্বজ্জনগণ দলে দলে এসে প্রেক্ষাগৃহকে পরিপূর্ণ ক'রে তুলতে লাগলেন। যাঁরা কখনো সাধারণ রঙ্গালয়ে পদার্পণ করেননি, তাঁদেরও দেখা পাওয়া যেতে লাগল কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে। বাংলা রঙ্গালয়ের জন্যে নূতন এক শ্রেণীর দর্শক তৈরি হয়ে উঠল।

শিশিরকুমারের নাট্যসাধনা

১৯২১ খৃষ্টাব্দ। মনোমোহন থিয়েটারে, ষ্টার থিয়েটারে ও মিনার্ভা থিয়েটারে যথাক্রমে অভিনীত হচ্ছে "হিন্দুবীর", "অযোধ্যার বেগম" ও "নাদির সাহ" প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক। কি ইতিহাসের দিক দিয়ে এবং কি নাটকত্বের দিক দিয়ে এ নাটক তিনখানি আদৌ উল্লেখযোগ্য ছিল না—সেই থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়। তবে প্রধানতঃ স্বর্গীয়া তারাসুন্দরীর অপূর্ব নাট্যনৈপুণ্যের গুণে "অযোধ্যার বেগম" যথেষ্ট পরিমাণেই রসিক দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পেরেছিল।

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদও ঐতিহাসিক নাটকের চাহিদা আছে দেখে একখানি নাটক রচনা করেছিলেন—"আলমগীর"। এ পালাটির মধ্যে পূর্বোক্ত তিনখানি নাটকের চেয়ে উচ্চতর শ্রেণীর ভাব, ভাষা, চরিত্র-চিত্রণ ও অবস্থা-সঙ্কট (situation) থাকলেও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকাবলীর মধ্যে এখানি উচ্চাসন দাবি করতে পারে না। যতদূর জানি, পালাটি তখনকার কোন রঙ্গালয়ে পঠিত হয়েছিল, কিন্তু গৃহীত হয় নি। নির্বাচকরা তার মধ্যে কোন সম্ভাব্যতা আবিষ্কার করতে পারেন নি।

এই সময়ে ম্যাডানরা বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী খুলে পরদেশীয় আগা হাসারকে অবলম্বন ক'রে "অপরাধী কে?" প্রভৃতি পালা বা বেলেখেলা দেখিয়ে বাঙালীকে ভোলাতে না পেরে হাবুডুবু খেয়ে থই খুঁজে পাচ্ছিলেন না। উপায় না দেখে তাঁরা (হয়তো মরিয়া হয়েই) প্রবৃত্ত হলেন নূতন পরীক্ষায়। দৃষ্টিপাত করলেন সৌখীন নাট্যজগতের দিকে—যেখানকার নটনায়ক ছিলেন অধ্যাপক শিশির-কুমার ভাদুড়ী। তাঁদের আহ্বানে সাধারণ রঙ্গালয়ে এসে নবীন অধ্যাপক শিশিরকুমার প্রথমেই নির্বাচন করলেন প্রাক্তন অধ্যাপক ক্ষীরোদপ্রসাদের "আলমগীর" নাটক। নাট্যবোদ্ধা শিশিরকুমারের

বুঝতে বিলম্ব হ'ল না যে, এই পালাটির মধ্যে উচ্চশ্রেণীর অভিনয়-কৌশল দেখাবার যথেষ্ট সুযোগ আছে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে মঞ্চস্থ হ'ল "আলমগীর"। সঙ্গে সঙ্গে গিরিশোত্তর যুগের বাংলা নাট্যজগতের অচলায়তনের মধ্যে বিদ্যুতের মত সঞ্চারিত হয়ে গেল এক অভাবিত প্রতিভার দীপ্তি। প্রথম থেকেই শিশিরকুমার এলেন, দেখলেন, জয় করলেন। প্রথম থেকেই সকলে উপলব্ধি করতে পারলে আধুনিক যুগে তিনি হচ্ছেন অতুলনীয়। এবং প্রথম থেকেই বিপুল জনসাধারণ তাঁকে একবাক্যে দান করলে অবিস্মরণীয় অভিনন্দন।

সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল বাংলা রঙ্গালয়ের প্রেক্ষাগৃহের প্রতিবেশ (environment)। আগে ছিল সেখানে নিম্নশ্রেণীর গ্যালারির দেবতাদের প্রভাব ও উপদ্রব, যাদের জন্যে রঙ্গালয় হয়ে উঠেছিল প্রায় ইতরদের আড্ডাখানার মত। স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত ভদ্রলোকরা সেখানে সঙ্কুচিত ভাবে যেতেন বটে, কিন্তু তাঁদের প্রাধান্য ছিল নগণ্য। কিন্তু শিশিরকুমারের আবির্ভাবের পরে কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে গিয়ে দেখতুম, ইতরজনরা আত্মগোপন করেছে কোন্ অন্তরালে এবং অধিকাংশ আসন অধিকার ক'রে আছেন মার্জিতমুখ বিদ্বজ্জনগণ। কেবল কি ভদ্র পুরুষরা? সেই প্রথম দেখলুম দলে দলে ভদ্রমহিলা উপরতলা ছেড়ে একতলায় নেমে এসে পুরুষদের পাশে নির্ভয়ে ব'সে অভিনয় দর্শন করছেন। এও ছিল কল্পনাতীত।

"আলমগীরে"'র পর "চাণক্য" ও "রঘুবীরে"'র নামভূমিকায়। শিশিরকুমারের প্রতিভা যে অনন্যসাধারণ, এ সম্বন্ধে কারুর আর কোন সন্দেহই রইল না।

মনোমোহন থিয়েটার তখনও দেওয়ালের লিখন পাঠ করতে পারলে না, কিন্তু মিনার্ভা থিয়েটারের সত্ত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মিত্র ও অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র রায় ছিলেন শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ব্যক্তি। বাতাস কোন্ দিকে বইছে, সেটা বুঝতে তাঁদের দেরি লাগল না। তাঁরা ধরনা দিলেন সৌখীন নাট্যজগতের আর দুইজন প্রখ্যাত অভিনেতার কাছে—রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র। তাঁরাও মিনার্ভায় এলেন এবং লাভ করলেন শিক্ষিত দর্শকদের অভিনন্দন।

এদিকে শিশিরকুমার উপলব্ধি করতে পারলেন একটি নিশ্চিত সত্য। পরের চাকরি ক'রে দিন গুজরাণ করতে তিনি আসেন নি নাট্যজগতে। নাট্যকলার প্রত্যেকটি বিভাগ নিজের নখদর্পণে রেখে কর্তৃত্ব করবার অধিকার না থাকলে নাট্যজগতে কেউ সৃষ্টি করতে পারে না অখণ্ড, অভিনব সৌন্দর্য। ম্যাডানদের কাছে সে স্বাধীনতা পাবার সম্ভাবনা নেই। তিনি আবার অদৃশ্য হলেন যবনিকার অন্তরালে।

কিছুদিন কাটল চলচ্চিত্র নিয়ে। তাঁর পরিচালনায় দেখানো হ'ল শরৎচন্দ্রের প্রথম চিত্রকাহিনী "আঁধারে আলো"।

ইতিমধ্যে নবযুগের অগ্রনেতারূপে যে নূতন মার্গের সন্ধান তিনি দিয়ে গিয়েছেন, তার উপরে দেখা যেতে লাগল নব নব মার্গিককে। তাঁকে হারিয়ে ম্যাডানরা অবলম্বন করলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ীকে। তারপর চোখ ফুটল ষ্টার থিয়েটারের। আর্ট সম্প্রদায়ের পরিচালনায় সেখানে দেখা দিয়ে তিনকড়ি চক্রবর্তী, শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইন্দু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তরুণ শিল্পীর দল "কর্ণার্জুনে"র মত নিতান্ত সাধারণ নাটককেও নিজেদের অভিনয়গুণে অসাধারণ রূপে সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তুললেন। বাংলা রঙ্গালয় যে চায় নব যুগের শিল্পী, শিশিরকুমার সর্বপ্রথমে যদি এ সত্য প্রমাণিত না করতেন, তাহ'লে আজও হয়তো আমাদের সহ্য করতে হ'ত বালখিল্যদের অত্যাচার। নির্মলেন্দু আমার কাছে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছিলেন, "শিশিরবাবু আগে না এলে পাবলিক থিয়েটারে যোগ দেবার সাহস আমাদের হ'ত না।" সুতরাং শিশির-কুমারকে মাত্র জনৈক ব্যক্তি না ব'লে একটি প্রতিষ্ঠান ব'লে গণ্য করা যায় অনায়াসেই। একথা হয়তো কারুর কারুর পছন্দসই হবে না, কিন্তু এ কথা অত্যুক্তি নয়। যে-কোন বাংলা রঙ্গালয়ের দিকে তাকালেই দেখা যাবে তাঁর শিষ্য বা প্রশিষ্যের দলকে। জেনে বা না জেনে অনেকেই করেন তাঁরই অনুসরণ।

সেটা ঠিক কোন্ বৎসর স্মরণ হচ্ছে না, তবে ১৯২৩ কি ২৪ খৃষ্টাব্দ। ইডেন গার্ডেনে বসে মস্ত এক প্রদর্শনী। কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে শিশিরকুমার আবার সেখানে পাদপ্রদীপের আলোকে আত্ম-প্রকাশের সুযোগ পান। তিনি ললিতমোহন লাহিড়ী, বিশ্বনাথ

ভাদুড়ী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্রীরবি রায় ও জীবন গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি আরো অনেককে নিয়ে গ'ড়ে তুললেন একটি নূতন সম্প্রদায় এবং নাটক নির্বাচন করলেন দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা"। প্রথমে নির্মলেন্দু লাহিড়ীও সম্প্রদায়ে ছিলেন, কিন্তু পারিবারিক দুর্ঘটনায় (বোধ করি পিতৃবিয়োগ) শেষ পর্যন্ত অভিনয়ে যোগ দিতে পারেন নি—কেবল একদিন কি দুইদিন শম্বুকের ভূমিকায় মহলা দিয়ে গিয়েছিলেন।

এবার নাট্যাচার্য ও পরিচালক রূপে শিশিরকুমার অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি বিভাগে তীক্ষ্নদৃষ্টি রেখে কাজ করবার ক্ষেত্র পেলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই। ফলও পাওয়া গেল হাতে হাতেই। অভিনয় ও প্রয়োগনৈপুণ্য হ'ল এমন উচ্চশ্রেণীর যে, রাত্রির পর রাত্রি ধ'রে প্রেক্ষাগৃহে আর তিল ধারণের ঠাঁই থাকত না। প্রদর্শনী শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিনয় বন্ধ হয় নি। বেশ বোঝা গেল, সাধারণ রঙ্গালয়ে অল্পদিন অভিনয় করবার পর দীর্ঘকাল চোখের আড়ালে থেকেও শিশিরকুমার জনসাধারণের মনের আড়ালে যান নি। সবাই তাঁকে চায়! তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। স্থির করলেন দ্বিজেন্দ্র-লালের "সীতা" নিয়ে স্বাধীন ভাবেই আবার দেখা দেবেন সাধারণ রঙ্গালয়ে। ভাড়া নেওয়া হ'ল আলফ্রেড থিয়েটার।

দুর্ভাগ্যক্রমে "সীতা"র অভিনয়স্বত্ব তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেল। কিন্তু শিশিরকুমার হতাশ হলেন না। যোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে নিয়ে প্রস্তুত করতে লাগলেন রাম-সীতার পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে নতুন একটি পালা। "সীতা"কে সব দিক দিয়ে অভিনব ও নবযুগের উপযোগী ক'রে তোলবার জন্যে শিশিরকুমার প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল আলফ্রেড থিয়েটারের অভিনয়। সেইটেই হ'ল কুবিখ্যাত মনোমোহন থিয়েটার তথা পুরাতন দলের পতনের প্রধান হেতু।

ব্যাপারটা একটু খুলেই বলি। আলমগীরের ভূমিকায় শিশির-কুমারের প্রথম আবির্ভাবের সময়েই লোকের চোখ ফোটে সর্বপ্রথমে। প্রাকৃতজন ছাড়া আর সকলেই উপলব্ধি করতে পারে যে, গিরিশোত্তর যুগের অভিনয় এ দেশে আর চলবে না। মনোমোহন ছিল ঐ শ্রেণীর

অভিনয়ের প্রধান কেন্দ্র। তারপর শিশিরকুমার গেলেন অজ্ঞাতবাসে। কিন্তু মনোমোহনের পাণ্ডারা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে না ছাড়তে রঙ্গভূমে প্রবেশ করলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী (বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী) ও "কর্ণার্জুনে"র নবাগত শিল্পিবৃন্দ (আর্ট থিয়েটার লিঃ)। শেষোক্ত সম্প্রদায়ের জনপ্রিয়তা হয়েছিল যথেষ্ট। কিন্তু মনোমোহনও নেববার আগে আর একবার জ্বলে উঠল তৈলহীন প্রদীপের মত। "বঙ্গে বর্গী" (ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র এই পালাটির নাম দিয়েছিলেন "বঙ্গে মুর্গী") নামক "অখাদ্য" নাটকও দানীবাবুর লম্ফঝম্প ও তর্জনগর্জনের মহিমায় গ্যালারির দেবতাদের অসামান্য দয়াদাক্ষিণ্য লাভ করে। মনোমোহনের অধঃপতনের মুখে সেই পালাটিই হ'ল ঠেকোর মত, তার সাহায্যেই সে আর্ট থিয়েটারের নবাগতদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোনরকমে সামলে নিতে পারলে। তারপর সে খুললে "আলেকজাণ্ডার"। কিন্তু তরুণ দিগ্বিজয়ীর ভূমিকায় জরাজর্জর দানীবাবুকে কেউ দেখতে চাইলে না। এই সময়েই শিশিরকুমারের পুনরাগমন। ওদিকে আর্ট সম্প্রদায় এবং এদিকে শিশির সম্প্রদায়—দুই দিকে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী, মনোমোহনের নাভিশ্বাস উঠতে বিলম্ব হ'ল না। দীপ-নির্বাণের আগে আবার সে খুললে নূতন নাটক "ললিতাদিত্য"। কিন্তু তবু সে বাঁচতে পারলে না। সেখানে আবার নূতন আসর পেতে যবনিকা তুললেন শিশিরকুমার। অভিনীত হ'ল "সীতা"—১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট তারিখে।

ঐ তারিখটি বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে সোনার হরপে লিখে রাখবার মত। কারণ "সীতা" নাট্যাভিনয়ে অভিনয় ও প্রয়োগ-নৈপুণ্যের যে সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ দেখা গিয়েছিল, আগে কেউ তা কল্পনাতেও আনতে পারে নি, এমন কি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তার অভিনয়ে নূতনত্ব, তার দৃশ্যসংস্থানে নূতনত্ব, তার গানের সুরে নূতনত্ব, তার নৃত্য-পরিকল্পনায় নূতনত্ব। অল্পবিস্তর দুর্বলতা ছিল কেবল নাট্যকারের রচনায়, কিন্তু শিশিরকুমারের অপূর্ব আবৃত্তির ইন্দ্রজালে অভিভূত হয়ে সে দুর্বলতাটুকু সাধারণ দর্শকেরা উপলব্ধি করতে পারত না। শ্রেষ্ঠ

কবি, শিল্পী, পণ্ডিত, দেশনেতা ও মহারাজা একযোগে "সীতা" নাট্যাভিনয়ের জন্যে উচ্ছ্বসিত ভাষায় করেছেন প্রশস্তি রচনা। সেই দিন থেকেই বাংলা নাট্যজগতে এসেছে সত্যকার যুগান্তর এবং সবাই পেয়েছে সম্যকভাবে শিশির-প্রতিভার পরিচয়।

তারপর একে একে অভিনীত হ'তে লাগল বিচিত্র সব নাটকের পর নাটক—"পাষাণী", "পুণ্ডরীক", "ভীষ্ম", "জনা", "দিগ্বিজয়ী", "ষোড়শী", "সাজাহান", "বিসর্জন", "শেষরক্ষা", "প্রফুল্ল" ও "তপতী" প্রভৃতি এবং প্রত্যেক পালাতেই শিশিরকুমার দেখালেন নূতন প্রয়োগনৈপুণ্য ও নানা ভূমিকার নূতন নূতন ধারণা। তারপরেও কত নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন এবং এখনো করছেন, কিন্তু এমনি অসাধারণ তাঁর তারুণ্য যে, এই প্রাচীন বয়সেও তাঁর শক্তি এতটুকু জীর্ণ না হয়ে অধিকতর প্রবল হয়ে পথ কেটে নেয় নব নব পরিকল্পনার ক্ষেত্রে। সে সব কথা এখানে বলা বাহুল্য। আমি আজ তাঁর অভিনয়ের সমালোচনা করতে চাই না, কারণ সে কাজ করেছি বিভিন্ন পত্রিকায় বারংবার। এখানে দেওয়া হ'ল কেবল তাঁর কর্মজীবনের একটি রেখাচিত্র।

রঙ্গমঞ্চের উপরে অভিনেতা শিশিরকুমারের প্রকৃষ্ট পরিচয় পেয়েছেন সকলেই। কিন্তু যবনিকার অন্তরালে বাস করেন যে শিল্পী, সাহিত্যরসিক, সংলাপপটু ও নাট্যাচার্য শিশিরকুমার, তাঁকে দেখবার ও জানবার সুযোগ হয়নি বাইরের লোকের। এইবারে সেই কথা ব'লে সাঙ্গ করব বর্তমান প্রসঙ্গ।

নেপথ্যে শিশিরকুমার

শিশিরকুমার যে সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করবেন সে কথা তখন পাকা হয়ে গিয়েছে। একদিন বৈকালে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে স্বর্গীয় বন্ধুবর গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের বৈঠকখানায় ব'সে আছি। গজেনবাবু ছিলেন অত্যন্ত সদালাপী ও সামাজিক মানুষ। তখনকার সাহিত্য-সমাজের সকলেই তাঁকে ভালোবাসতেন এবং তাঁর বৈঠকে প্রত্যহ এসে আসন গ্রহণ করতেন প্রবীণ ও নবীন বহু সাহিত্যিক ও অন্যান্য শ্রেণীর শিল্পী। তিনি ছিলেন সকলেরই "গজেনদা"।

সেইখানেই এসে উপস্থিত হলেন গজেনদার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীরামগোপাল ঘোষের সঙ্গে শিশিরকুমার, ছাত্রজীবনে ওঁরা দু'জনে ছিলেন সহপাঠী। প্রথমেই চিনি চিনি ক'রেও ভালো ক'রে শিশির-কুমারকে চিনতে পারলুম না, কারণ তার আগে তাঁকে একবারমাত্র দেখেছিলুম "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" নাট্যানুষ্ঠানে অভিনেতার ছদ্মবেশে।

কিন্তু তাঁর চেহারা যে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, সে কথা বলাই বাহুল্য,—তাঁর মূর্তি আজও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার কারণ কেবল দৈহিক সৌন্দর্য নয়, শিশিরকুমারেরও চেয়ে সুপুরুষ আমি অনেক দেখেছি। কিন্তু তাঁর মুখে-চোখে যে ধী, প্রতিভা ও সংস্কৃতির স্পষ্ট ছাপ আছে, সাধারণতঃ তা দুর্লভ। দেখলেই মনে হয়, মানুষটি গুণী অনন্যসাধারণ।

আমরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হলুম। কথা আরম্ভ করলেন তিনি সাধারণভাবেই। বললেন, "হেমেন্দ্রবাবু, 'হিন্দুস্থান' পত্রিকায় 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে'র যে সমালোচনা বেরিয়েছে, শুনলুম সেটি আপনার লেখা। আমার ভালো লেগেছে।"

জবাবে কি বলেছিলুম মনে নেই। "আপনার ভালো লেগেছে শুনে সুখী হলুম"—হয়তো বলেছিলুম এই রকম কোনও কথাই।

তারপর শিশিরকুমার বেশ খানিকক্ষণ ধ'রে ব'সে ব'সে বাক্যালাপ

ক'রে গেলেন। প্রথম দিনেই উপলব্ধি করতে পারলুম, তিনি অনায়াসেই অভিনেতা না হয়ে সাহিত্যিক হ'তে পারতেন। কারণ তাঁর মুখ দিয়ে অনর্গল নির্গত হ'তে লাগল কাব্য ও আর্টের কথা। গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল বসুর সংলাপ শুনেছি। গিরিশচন্দ্রের সংলাপ সম্বলিত একখানি পুস্তকও প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের সংলাপ ছিল জ্ঞানগর্ভ। কিন্তু তাঁরা দু'জনেই ছিলেন গ্রন্থকার। সুতরাং তাঁদের পক্ষে সাহিত্যিকদের মত আলাপ করা সম্ভবপরই ছিল। কিন্তু বাংলা দেশের অধিকাংশ বিখ্যাত নটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযোগ স্থাপন ক'রে দেখেছি, তাঁরা সাহিত্যিকদের মত আলাপ করবেন কি, তাঁদের অনেকেরই স্বদেশী-বিদেশী সাহিত্যরসের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কই নেই। এমন সব নামজাদা অভিনেতাও দেখেছি, যাঁরা পাশ্চাত্য সাহিত্যের কথা দূরে থাক্, ঘরের জিনিস রবীন্দ্র-রচনারও সঙ্গে পরিচিত নন। "শেষের কবিতা" সামনে ধরলে তাঁরা চোখে সরষে ফুল দেখে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়বেন। একাধিক গণ্ডমূর্খও এখানে প্রথম শ্রেণীর শিল্পী ব'লেও অভিনন্দিত হয়েছেন। নাটকও সাহিত্যের অন্তর্গত। সাহিত্যরসে বঞ্চিত হয়েও নাট্যাভিনয়ে তাঁরা নাম কিনেছেন হয়তো কেবল গুরুকৃপাতেই। তাঁদের কাছে গিয়ে শুনেছি শুধু আজেবাজে গালগল্প।

এমন কি, কাব্য ও ললিতকলা নিয়ে শিশিরকুমারের মত মুখে মুখে বিচিত্র আলোচনা করতে পারেন, এরকম সাহিত্যিকও আমি খুবই কম দেখেছি। সাধারণ কথায় তিনি বড় কান পাতেন না, অশ্রান্তভাবে বলতে ও শুনতে চান কেবল আর্ট ও সাহিত্যের যে কোন প্রসঙ্গ এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই আবৃত্তি ক'রে যান স্বদেশী ও বিদেশী কবিদের বচনের পর বচন। কেবল তাঁর অভিনয় দেখা নয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ করাও একটি পরম উপভোগ্য আনন্দ। এই প্রাচীন বয়সেও এবং রঙ্গালয় সম্পর্কীয় নানা দুশ্চিন্তায় কাতর হয়েও তাঁর কাব্যগত শিল্পীর প্রাণ একটুও শ্রান্ত বা অন্যমনা হয়ে পড়েনি,—গানের পাখী যেমন গান গাইবেই, শিশিরকুমারের রসনাও তেমনি শোনাবেই শোনাবে শিল্প ও সাহিত্যের বাণী। নির্জন বাড়িতে আমি নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করি। সেখানে যখন মাঝে মাঝে শিশির-

কুমারের আবির্ভাব হয়, আমার মনে জাগে অপূর্ব আনন্দের প্রত্যাশা। নির্জনতা পরিণত হয় যেন জনসভায়—কানে শুনি কত গুণীর, কত কবির ভাষা। শিশিরকুমার একাই একশো।

রবীন্দ্রনাথ কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে অতিশয় ভালোবাসতেন, তাঁর অকালমৃত্যু তাঁকে অভিভূত করেছিল। তাই প্রাণের দরদ ঢেলে রচনা করেছিলেন অসাধারণ ও সুদীর্ঘ একটি শোক-কবিতা। কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরীতে সত্যেন্দ্রনাথের জন্যে একটি জন-বহুল শোকসভার অনুষ্ঠান হয় এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত থেকে ভাবগম্ভীর উদাত্তকণ্ঠে সেই কবিতাটি পাঠ করেন। সভাস্থলে শ্রোতা ছিলেন অসংখ্য সাহিত্যিক ও বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে শিশির-কুমারও। সকলের মনকেই একান্ত অভিভূত ক'রে তুলেছিল মৃত কবির উদ্দেশ্যে কবিগুরুর সেই অপূর্ব ভাষণ।

সভাভঙ্গের পর আমাদের সঙ্গে শিশিরকুমারও বাইরে এসে দাঁড়ালেন। তারপর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, "ভাই, আমার জন্যে রবীন্দ্রনাথ যদি এইরকম একটি কবিতা রচনা করেন, তাহ'লে এখনি আমি চলন্ত মোটরের তলায় চাপা প'ড়ে মরতে রাজি আছি।" বাংলা দেশের আর কোন অভিনেতার—এমন কি সাহিত্যিকেরও মুখ দিয়ে নির্গত হ'ত না এমন উক্তি। এর মধ্যে একসঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর রচনার অতুলনীয়তা সম্বন্ধে কাব্য-গতপ্রাণ শিশিরকুমারের মনের ভাব। একসঙ্গে সমালোচন ও মহাপুরুষার্চন।

শিশিরকুমার অভিনেতা, সুতরাং নাট্যজগৎ নিয়েই তাঁর একান্ত-ভাবে নিযুক্ত হয়ে থাকবার কথা। যেমন ছিলেন গিরিশচন্দ্র। তিনি সামাজিক ও সাহিত্যিক বৈঠকে বা সভায় যেতে চাইতেন না। কিন্তু শিশিরকুমারের প্রকৃতিতে দেখি এর বৈপরীত্য। নাট্যসাধনাকেই জীবনের প্রধান সাধনা ক'রে তুলেছেন বটে, কিন্তু রঙ্গালয়ের প্রতিবেশ তাঁকে সর্বক্ষণ খুশি ক'রে রাখতে পারে না—তাঁর চিত্ত কামনা করে সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সঙ্গ।

অধুনালুপ্ত "ভারতী"র বৈঠক এখানকার সাহিত্যসমাজে বিখ্যাত হয়ে আছে। সেখানে যাঁরা ওঠা-বসা করতেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন

রবীন্দ্রপন্থী সাহিত্যিক। শেষের দিকে সেই বৈঠকে যখন কতকটা মন্দা প'ড়ে এসেছে, তখনই শিশিরকুমারের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। তখন সকালে আসর বসত "ভারতী" কার্যালয়ে এবং সন্ধ্যার সময়ে বসত গজেনদার বাড়িতে। শিশিরকুমার প্রায়ই হাজিরা দিতেন দুই বৈঠকেই এবং প্রধান কাব্যরস পরিবেশকের ভার গ্রহণ করতেন সংলাপপটু শিশিরকুমারই। যে কোন সাহিত্যিকের সঙ্গেই তিনি অনায়াসে ভাব বিনিময় করতে পারতেন। হাসি, গল্প ও কাব্যপ্রসঙ্গ নিয়ে কেটে গিয়েছে সুদূর অতীতের যে সুমধুর প্রহরগুলি, আর তা ফিরে আসবে না বটে, কিন্তু তাদের স্মরণ করলে মনের মধ্যে আজও শুনতে পাই মাধুর্যের সঙ্গীত।

এই সাহিত্যপ্রীতির জন্যে শিশিরকুমারও চিরদিন আকৃষ্ট করেছেন সাহিত্যিকদের। তাঁর "নাট্যমন্দির" হয়ে উঠেছিল সাহিত্যিকদের অন্যতম বৈঠকের মত। অভিনয় বা মহলা যখন বন্ধ হ'ত, শুরু হ'ত তাঁদের আলাপ-আলোচনা। অনেক রাতের আগে আসর ভাঙত না। তখনকার বৈঠকধারীদের কেউ কেউ এখন স্বর্গগত। কেউ কেউ জরা বা ব্যাধিগ্রস্ত এবং কেউ কেউ জীবনসংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত; আর কোন বৈঠকেই যাবার শক্তি বা সময় তাঁদের নেই। তাঁদের অভাব শিশিরকুমার অনুভব করেন নিশ্চয়ই, তাই মাঝে মাঝে নিজেই পুরাতন বন্ধুদের কাছে এসে দু দণ্ড হাঁপ ছেড়ে যান।

শিশিরকুমারের মত অধ্যয়নশীল ব্যক্তি আমি এ যুগের রঙ্গালয়ে আর একজনও দেখিনি। সাহিত্যজগতেও তাঁর মত পড়ুয়ার সংখ্যা বেশী নয়। বই পড়া তাঁর এক মস্ত নেশার মত, বই বিনা তিনি থাকতে পারেন না। নতুন ভালো বই দেখলেই তখনই তা কেনবার জন্যে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। মাঝে মাঝে বলেন, "হাতে যদি আরো বেশী টাকা পাই, তাহ'লে মনের সাধে আরো বেশী বই কিনতে পারি।"

একদিন কোন অতি-বিখ্যাত ও প্রবীণ নট (এখন স্বর্গত) আমাকে বললেন, "আমাকে একখানা পড়বার মত বই পড়তে দিতে পারো?"

আমি সুধালুম, "পড়বার মত বই মানে তুমি কি বলতে চাও?"

তিনি বললেন, "যা পড়লে নতুন কিছু শিখতে পারা যায়।"

আমি বললুম, "অভিনয় সম্পর্কীয় বই?"

তিনি বললেন, "না, অভিনয় সম্বন্ধে আমার আর নতুন কিছু শেখবার নেই।"

শুনে বিস্মিত হলুম। অভিনেতারা হচ্ছেন শিল্পী এবং সত্যকার শিল্পীরা আমরণ নিজেদের শিক্ষার্থী ব'লেই মনে করেন—"আমার আর নতুন কিছু শেখবার নেই" এমন দম্ভোক্তি তাঁদের মুখে শোভা পায় না। শিশিরকুমার প্রাচীন ও বিদগ্ধ, এবং ভারতীয় নাট্যজগতের সর্বোচ্চ আসন অধিকার ক'রে আছেন, কিন্তু এমন অশোভন উক্তি তাঁর মুখে আমি কোনদিনই শ্রবণ করিনি। নাট্যকলা সম্পর্কীয় নূতন কোন বইয়ের নাম শুনলে তা পাঠ করবার জন্যে আজও তিনি শিক্ষার্থীর মতই আগ্রহ প্রকাশ ক'রে থাকেন। সেই জন্যে নাট্যশাস্ত্রে তাঁর মত হালনাগাদ বা up-to-date ব্যক্তি আমি আর একজনও দেখিনি।

কথাসাহিত্য, নাট্যসাহিত্য, কাব্যসাহিত্য ও চারুকলা সম্পর্কীয় গ্রন্থ পাঠ করবার আগ্রহই তাঁর বিপুল নয়, যেমন তিনি অধ্যয়নশীল, সেই সঙ্গে তেমনি চিন্তাশীলও। তিনি ভাবতে ভাবতে পড়েন এবং পড়তে পড়তে ভাবেন এবং পাঠশেষে যে মতামত প্রকাশ করেন, তা শ্রেষ্ঠ সমালোচকেরই উপযোগী।

সাধারণ দর্শকরা হয়তো উপলব্ধি করতে পারেন না, কিন্তু শিশিরকুমারের প্রত্যেক ভূমিকাভিনয়ের মধ্যে থাকে তাঁর এই তীক্ষ্ম মনীষার প্রভাব। অভিনেতা আছেন দুই রকম—আত্মহারা ও সচেতন। দানীবাবু (ও অমৃতলাল মিত্র) প্রমুখ অভিনেতারা ভূমিকার মধ্যে ডুবে গিয়ে বাঁধা সুরে ভূমিকার কথাগুলি উচ্চারণ ক'রে যেতেন। কিন্তু শিশিরকুমারের কাছে বাঁধা সুর ব'লে কিছু নেই, তাঁর কণ্ঠস্বর সর্বদাই বিভিন্ন শব্দের বিভিন্ন অর্থানুসরণ ক'রেই পরিবর্তিত হয় এবং বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, বাঁধা সুরকে আশ্রয় ক'রে ভূমিকার শব্দগত অর্থ ভুলে তিনি আত্মহারা হয়ে যাননি, অভিনয়কালে তাঁর মস্তিষ্ক হয়ে আছে রীতিমত সক্রিয়। "প্রফুল্ল" ও "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকে যোগেশ ও চাণক্যের ভূমিকায়

দানীবাবু ও শিশিরকুমারের অভিনয়ের এই পার্থক্য খুব সহজেই ধরা পড়ত।

এই কারণেই শিশিরকুমার হচ্ছেন আদর্শ নাট্যাচার্য। তাঁর কাছে ঐতিহ্য ব'লে কিছু নেই। পরম্পরাগত উপদেশবাক্য অনুসারে তিনি কোন কাজ করেন না, প্রত্যেক নূতন পালার নিজস্ব মূল সুর অবলম্বন ক'রে এক একখানি নাটক ও তার বিভিন্ন ভূমিকা তিনি বিভিন্নভাবে আপন বিশেষ ধারণা অনুযায়ী তৈরি ক'রে তোলেন। এবং সেইজন্যই শিশিরকুমারের শিষ্যেরা তাঁর কাছে শিক্ষা পেয়ে শিক্ষার্থী হয়েও প্রকাশ করতে পারেন উচ্চশ্রেণীর নাট্যনৈপুণ্য। অভিনেতা শিশিরকুমারকে সকলেই দেখেন। কিন্তু মহলার সময়ে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার হচ্ছেন অধিকতর চিত্তাকর্ষক। কারণ সেই মহলা দেবার চমৎকার পদ্ধতির মধ্যেই ধরা পড়ে তাঁর অভিনয়ের যথার্থ তাৎপর্য।

আজকাল চারিদিকেই জাতীয় রঙ্গালয় নিয়ে অরণ্যে রোদন শুনতে পাই। এখানে জাতীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করবার মত প্রতিভা ও বহুদর্শিতা আছে একমাত্র শিশিরকুমারেরই। কিন্তু তথাকথিত অরণ্যে রোদনের মধ্যে তাঁর নাম কেউ করে না। তাই যিনি দুই হাত ভ'রে দান করতে পারতেন, নিজের ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি আমাদের অধিকতর মহার্ঘ ঐশ্বর্য দিয়ে দিতে পারলেন না।

এগারো

অসিতকুমার হালদার

১৩১৬ কি ১৩১৭ সালের কথা। আমি তখন "ভারতী" প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। একদিন "ভারতী" সম্পাদিকা ও বঙ্কিম যুগের সর্বপ্রধান মহিলা লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর সানি পার্কের বাড়ির বৈঠকখানায় ব'সে আছি এবং তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করছি, এমন সময়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন বোধ হয় আমরই সমবয়সী একটি তরুণ যুবক। গৌরবর্ণ, সৌম্যমুখ, একহারা দীর্ঘ দেহ। চেহারায় আছে মনীষা ও সংস্কৃতির ছাপ, সহজেই তা দৃষ্টি করে আকৃষ্ট।

স্বর্ণকুমারী দেবী বললেন, "এর নাম অসিতকুমার হালদার, আমাদেরই আত্মীয়।" পরিচয়ের পর হ'ল গল্পসল্প। সাহিত্যের প্রসঙ্গ, চিত্রকলার প্রসঙ্গ। তাঁর মৌখিক আলাপ এবং হাসিখুসিমাখা মুখ ভালো লাগল।

তারপরেও স্বর্ণকুমারী দেবীর ভবনে অসিতকুমারের সঙ্গে দেখা এবং আলাপ-আলোচনা হয়েছে এবং সেই সময়েই পাকা হয়ে গিয়েছে আমদের বন্ধুত্বের বনিয়াদ। বন্ধুত্ব লাভের সুসময় হচ্ছে প্রথম যৌবন। মানুষের বয়স যত বাড়ে, স্বার্থের সংঘাতে দশজনের সঙ্গে যতই মনান্তর ও মতান্তর হ'তে থাকে, নরচরিত্রের মহানুভবতা সম্বন্ধে ততই সে সন্দিহান হয়ে ওঠে। রাম তখন শ্যামকে সহজে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত হয় না। তাই পরিণত বয়সের বন্ধুত্বের মধ্যে সরলতার মাত্রা থাকে অল্প। প্রথম পরিচয়ের পর দুই পক্ষই পরস্পরকে ভালো ক'রে না বাজিয়ে গ্রহণ করতে পারে না। প্রথম দর্শনেই প্রেম হবার সুযোগ থাকে মানুষের যৌবনকালেই।

সেটা ছিল বাংলা চিত্রকলার "রেনেসাঁস" বা নবজন্মের যুগ। তার আগেও বাঙালীরা কি ছবি আঁকতেন না? আঁকতেন বৈ কি,

খুব আঁকতেন। কিন্তু যে বিলাতী পদ্ধতি তাঁদের ধাতে সইত না, তাইতেই শিক্ষিত হয়ে তাঁরা কেবল পাশ্চাত্য শিল্পীদের অনুসরণ করতেন পদে পদে। সেই প্রাণহীন অনুকরণের মধ্যে থাকত না কলালক্ষ্মীর কোন আশীর্বাদই। আগে শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ব'লে শশীকুমার হেশের ছিল খুব নামডাক। তিনিই হচ্ছেন য়ুরোপে শিক্ষিত প্রথম বাঙালী চিত্রকর, বোধ করি ইতালীতেই গিয়ে ছবি আঁকা শিখে এসেছিলেন। প্রতিমূর্তি চিত্রণে তাঁর দক্ষতা ছিল। কিন্তু তাঁর নিজের ধারণা অনুসারে আঁকা সাধারণ ছবি আমি দেখেছি। আঁকতেন তিনি শিক্ষিত নিপুণ হাতেই, কিন্তু কল্পনাকে উল্লেখযোগ্য রূপ দিতে পারতেন না। তাই নিখুঁত অঙ্কনপদ্ধতিও বাঁচিয়ে রাখতে পারে নি তাঁর নামকে, আজ কয়জন লোক তাঁকে চেনে? ছবি যতই বাস্তব হোক, দেশের মাটীর সঙ্গে যোগ না রাখতে পারলে তাকে অস্বাভাবিক ব'লে মনে হবেই। বিলাতী চিত্রপদ্ধতিতে উচ্চশিক্ষিত হয়েও অবনীন্দ্রনাথ ঐ সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যথাসময়েই। নিজ বাসভূমে পরবাসীর মত তিনি থাকতে পারলেন না, আবিষ্কার করলেন প্রাচ্য চিত্রকলাপদ্ধতি, উপহার দিলেন স্বদেশী সৌন্দর্যের সম্পদ। সেই সময়ে তিনি ও নন্দলাল বসু প্রমুখ তাঁর শিষ্যবর্গ নবজীবনের প্রেরণায় প্রবুদ্ধ হয়ে আপন আপন স্বাধীন পরিকল্পনা অনুসারে পরিবেশন করতে লাগলেন নব নব রসরূপ। অসিতকুমার হালদার হচ্ছেন অবনীন্দ্রনাথেরই অন্যতম শিষ্য।

কিন্তু উঠল বিষম সোরগোল। বিলাতী ছাপমারা বোতলে সস্তা দেশী মত খেতে অভ্যাস ক'রে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যাদের রুচি, তারা ছেড়ে কথা কইতে রাজি হ'ল না। প্রাচ্য পদ্ধতিতে আঁকা ছবিগুলির প্রতিলিপি প্রকাশিত হ'ত প্রধানতঃ "প্রবাসী" ও "ভারতী"তে। বিরুদ্ধ দলের মুখপাত্র ছিলেন "সাহিত্য" সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, হঠাৎ রাতারাতি শিল্পসমালোচক সেজে প্রাচ্য চিত্রকলার শিল্পীদের নিয়ে আবোল তাবোল বকতে শুরু করে দিলেন। বলা বাহুল্য আমি ছিলুম প্রাচ্য শিল্পের পক্ষেই এবং তার প্রসঙ্গ নিয়ে সে সময়ে প্রভূত কালিকলম ব্যবহার করতেও ছাড়িনি এবং

প্রাচ্য চিত্রকলার একজন উদীয়মান শিল্পী ব'লেই অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছিলুম অসিতকুমারের দিকে।

তারপর কেটে গেল কয়েকটা বৎসর। সুকিয়া (এখন কৈলাস বোস) স্ট্রীটে নব পর্যায়ের "ভারতী" পত্রিকার কার্যালয়ে গড়ে উঠল আমাদের নূতন আস্তানা। তখন আমাদের মন ও বয়স পরিণত হয়েছে বটে, কিন্তু সে সময়েও আমাদের সকলকেই সর্বদাই সমাচ্ছন্ন ক'রে রাখত কাব্য ও ললিতকলার কল্পলোক। মুখ্য আলোচনার বিষয়ই ছিল আর্ট ও সাহিত্য, এবং সে আলোচনায় সাগ্রহে যোগ দিতেন অসিতকুমারও। দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগল আমাদের সৌহার্দ্য।

"ভারতী"র আস্তানা কেবল সাহিত্যিকদের আকর্ষণ করত না, সেখানে ওঠা-বসা করতেন অনেক বিখ্যাত গায়ক, অভিনেতা ও চিত্রকরও। শেষোক্তদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের কথা আগেই বলেছি, তাঁর শিষ্যদের মধ্যে আসতেন অসিতকুমার, শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী ও শ্রীচারুচন্দ্র রায় প্রভৃতি। এমন বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পী-সমাগম আমি আর কোন সাহিত্যবৈঠকে দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে না। এমন কি ব্যঙ্গরঙ্গরসে বিখ্যাত স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন গোস্বামী একদিন এসে আমাকে বললেন, "হেমেন্দ্র, তোমাদের আস্তানায় গিয়ে আমি কীর্তন শুনিয়ে আসতে চাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "কি কীর্তন চিন্দা? হাসির কীর্তন?"

তিনি বললেন, "না হে ভায়া, না। গম্ভীর কীর্তন, করুণ-কীর্তন। যে কীর্তন শুনে ভাবুক লোকে কাঁদে। ব্যবস্থা করতে পারো?"

চিত্তরঞ্জনকে আমরা সবাই নানা বৈঠকে কৌতুকাভিনয় করতে দেখেছি। শিশিরকুমারের "নাট্যমন্দিরে"ও তিনি অভিনয় করেছেন এবং চলচ্চিত্রেও দেখা দিয়েছেন হাস্যরসাত্মক নানা ভূমিকায়। কিন্তু কীর্তনিয়ারূপে তাঁর পরিচয় জানে না জনসাধারণ, আমিও জানতুম না তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েও।

"ভারতী" কার্যালয়ের তিনতলায় বড় ঘরে মেঝের উপরে শতরঞ্চি ও চাদর বিছিয়ে আসর প্রস্তুত করা হ'ল, আমন্ত্রণ করা হ'ল অনেক

লোককে। নির্দিষ্ট দিনে সাত-আটজন সহকারী ও বাদ্যভাণ্ড নিয়ে চিত্তরঞ্জন এলেন এবং ঘণ্টা দুই ধ'রে সকলকে শুনিয়ে দিলেন রীতিমত কীর্তনগান। সে হচ্ছে উপভোগ্য সঙ্গীত।

"ভারতী"র সে আসর ছিল উচ্চশ্রেণীর বিশ্বজ্জনসভা, তাই তার দিকে ঝুঁকতেন নানা শ্রেণীর শিল্পী। সভ্যদের মধ্যে যে কয়জন আজও ইহলোকে বিদ্যমান আছেন, তার অভাব একান্তভাবে অনুভব করেন তাঁরা সকলেই। এই নষ্টনীড়ের কথা স্মরণ ক'রেই প্রায় দুই যুগ আগে অসিতকুমার (তিনি তখন লক্ষ্ণৌয়ের সরকারি চিত্র-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ) আমাকে একখানি পত্রে লিখেছিলেনঃ "হেমেন, তোমার চিঠিখানি পেয়ে ভারি আনন্দ হ'ল। আমাদের দলের মধ্যে তোমার সহৃদয়তার গর্ব আমরা বরাবরই ক'রে থাকি। কলকাতায় যাই, কিন্তু মনে হয় যেন ডানা ভাঙা—বাসা থেকেও বাসা নেই। আমাদের সেই নীড়ের কথা কি কখনো ভোলা যায় ?"

অসিতকুমার ছবি এঁকেছেন প্রধানতঃ প্রাচ্য চিত্রকলাপদ্ধতি অনুসারেই। তিনি যে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য, তাঁর ছবি দেখলেই এ কথা বোঝা যায়, যদিও তাঁর নিজস্ব 'ষ্টাইল'টুকুও ধরতে বিলম্ব হয় না। বর্তমানের চেয়ে অতীতের ঐতিহ্যের দিকেই তাঁর দৃষ্টি অধিকতর জাগ্রত, কেবল তাঁর কেন, প্রাচ্য চিত্রকলার অধিকাংশ শিল্পী সম্বন্ধেই এ কথা বলা যায়।

প্রাচ্য চিত্রকলাপদ্ধতিকে আজকাল ইংরেজীতে "বেঙ্গল স্কুল" ব'লে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু বেঙ্গল স্কুলের নাম শুনলেই কতিপয় অবাঙালী শিল্প-সমালোচকের মাথা গরম হ'তে শুরু করে। সম্প্রতি পত্রান্তরে শ্রীরমণ নামে এক দক্ষিণী ভদ্রলোক ফতোয়া দিয়েছেন ঃ "তথাকথিত বেঙ্গল স্কুলের প্রতিষ্ঠা বাংলা দেশেই হয়েছিল বটে, কিন্তু তার শিল্পীদের সকলেই বাংলা দেশের লোক নন।" এই অর্থহীন উক্তির দ্বারা ভদ্রলোক কি বোঝাতে চেয়েছেন, বুঝতে পারি নি। বেঙ্গল স্কুলের শিল্পীরা বাংলা দেশের ভিতরেই থাকুন আর বাইরেই থাকুন কিংবা তাঁরা জাতে অবাঙালী হোন, তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ তাঁদের একই গোষ্ঠীভুক্ত ব'লেই মনে করতে হবে। তাঁরা একই আদর্শে অনুপ্রাণিত, একই সাধনমন্ত্রে দীক্ষিত। এই

ধারা চ'লে আসছে বেঙ্গল স্কুলের জন্মের পর থেকেই। অবনীন্দ্রনাথের কাছে মানুষ হয়েছিলেন যে সব শিল্পী, তাঁদের মধ্যে ছিলেন অবাঙালীও। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যরাও (নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মুকুল দে ও দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী প্রভৃতি) বাংলা দেশের ভিতরে এবং বাহিরে নানা চিত্রবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আরো কত অবাঙালী ছাত্রকে তৈরি ক'রে তুলেছেন, তার সংখ্যা আমার জানা নেই। কিন্তু তাঁরা বাংলা দেশের বাইরেই থাকুন, কিংবা অবাঙালীই হউন, তাঁদেরও বলতে হবে বেঙ্গল স্কুলের শিল্পীই। "বেঙ্গল স্কুল প্রাদেশিক নয়, জাতীয় স্কুল।" শ্রীরমণের এ উক্তির মধ্যে নেই কিছুমাত্র নূতনত্ব, কারণ এটাও সর্বসম্মত। বেঙ্গল স্কুল ভারতের সর্বত্র যে জাতীয় শিল্পের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছে, তারই ফলভোগ করছি আমরা সকলে জাতিধর্মনির্বিশেষে।

শ্রীরমণ আরো বলেন, বাংলা চিত্রকলা (অর্থাৎ বেঙ্গল স্কুল) আজ নাকি বন্ধ্যা, তার অবস্থা বন্ধ জলাশয়ের মত। আমার মতে এখনো একথা বলবার সময় হয়নি, কারণ এখনো নন্দলাল, অসিতকুমার ও দেবীপ্রসাদ প্রভৃতি শিল্পীরা তুলিকা ত্যাগ করেন নি, যদিও এ সত্য অস্বীকার্য নয় যে তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন খেয়ালের মাথায় বিপথে গিয়ে আবার নব নব উদ্ভট পাশ্চাত্য "ইজ্‌মে"র মোহে আচ্ছন্ন হ'তে চাইছেন। কিন্তু তাঁদের নাম বেঙ্গল স্কুলের অন্তর্গত করা যায় না এবং তাঁদের কেউ যদি এখানে শিক্ষালাভ ক'রেও থাকেন, তবে আজ তাঁকে বলতে হবে, বেঙ্গল স্কুলের নাম-কাটা ছেলে।

আর এক কথা। সকল আর্টের ক্ষেত্রেই যুগে যুগে বদলে যায় পদ্ধতির পর পদ্ধতি। চিত্রকলাতেও প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত কত পদ্ধতির জন্ম ও প্রাধান্য হয়েছে তা বর্ণনা করতে গেলে আর একটি স্বতন্ত্র ও বৃহৎ প্রবন্ধ রচনা করতে হয়। কিন্তু কোন পদ্ধতিই ব্যর্থ হয়নি। ইমপ্রেসানিজম্‌ বা কিউবিজম্‌ প্রভৃতি আসরে দেখা দিয়েছে ব'লে কি রাফায়েল, মিকেলাঞ্জেলো ও দ্য ভিঞ্চি প্রভৃতির প্রতিভা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে? "বাংলা চিত্রকলা আজ বন্ধ্যা", একথা বলা বিমূঢ়তা। আজ তা সুফলাই হোক আর অফলাই হোক, তার

গৌরব অক্ষয় হয়েই থাকবে। মতিভ্রান্ত ভারতীয় চিত্রকলার দৃষ্টিকে সে ঘরমুখো করতে পেরেছে, এই তার প্রধান গৌরব। প্রথম জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই সে একদল শক্তিশালী, সৃষ্টিক্ষম শিল্পী গঠন করতে পেরেছে, এই তার আর এক গৌরব। তারপর ভারতের দিকে দিকে প্রত্যন্তপ্রদেশ পর্যন্ত আজ সে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে, এই তার আরো একটি গৌরব। এই সব কারণে বাংলা চিত্রকলাপদ্ধতি চিরদিনই অতুলনীয় হয়ে থাকবে।

বাংলা চিত্রকলার নবজাগরণের যুগে যে কয়েকজন শিল্পী অগ্রনেতারূপে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, অসিতকুমার হচ্ছেন তাঁদেরই অন্যতম। কিন্তু তাঁর হাতে কেবল তুলিই চলে না, কলমও চলে অবাধগতিতে। তাঁর গদ্যও আসে, পদ্যও আসে। অল্পদিন হ'ল তিনি কালিদাসের "মেঘদূত" ও "ঋতুসংহার"-এর সচিত্র কাব্যানুবাদ প্রকাশ করেছেন—একাধারে দেখেছি তাঁর কবি ও চিত্রকর রূপ। সুমিষ্ট কবিতা, বিচিত্র চিত্র। এত ভালো লেগেছিল যে, "দৈনিক বসুমতী"তে সুদীর্ঘ সমালোচনার দ্বারা তাঁকে করেছিলুম অভিনন্দিত। কিন্তু চিত্রবিদ্যালয়ের গুরুতর কর্তব্যভার নিয়ে তাঁকে নিযুক্ত হয়ে থাকতে হয়, ইচ্ছামত সাহিত্যচর্চার অবকাশ তিনি পান না। তাই দুঃখ ক'রে আমাকে লিখেছিলেনঃ "সময় আমার বড়ই কম, তাই সাহিত্যচর্চার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তবু চিরকালের অভ্যাস কি ছাড়া যায়? তাই কখনো-সখনো বেরিয়ে পড়ে এক-আধটা লেখা।"

তাঁর সাকিন লক্ষ্ণৌ, আমি আসীন কলকাতায়। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ কেটে গেছে, তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। কালে-ভদ্রে হয়েছে পত্রালাপ। একখানি পত্রে তিনি আশা দিয়েছিলেনঃ "এবার কলকাতায় গেলে তোমার সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ ছাড়ব না।"

শুনলুম, একদিন তিনি দেখা করতে এসেও ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তখন বাড়ির বাইরে। দেখা হয়নি।

তার কয়েক বৎসর পরে প্রখ্যাত প্রমোদ-পরিবেশক স্বর্গীয় হরেন ঘোষের আস্তানায় অভাবিতভাবে হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে

গেল। কিন্তু তাঁর দিকে তাকিয়েই আমার দৃষ্টি হয়ে উঠল সচকিত। স্মৃতির পটে আঁকা আছে যুবক অসিতের ছবি, আর এ অসিত যে বৃদ্ধ—এমন চেহারা দেখবার কল্পনা মনে জাগেনি। ঋজু দেহ নত, কেশে জরার শুভ্রতা, বলিরেখাযুক্ত দেহের ত্বক। আমাকেও দেখে তাঁর মনে নিশ্চয়ই অনুরূপ ভাবের উদয় হয়েছিল। "এই নরদেহ।"

বারো

শ্রীকালিদাস রায় প্রভৃতি

কত ফুল মুকুলেই ঝ'রে পড়ে, আবার কত ফুল খানিক ফুটে উঠেও আর ভালো ক'রে ফোটে না।

সুকান্ত ভট্টাচার্যকে পরলোকে যাত্রা করতে হয়েছে বালকবয়স পার হয়েই—আঠারো উতরে ঊনিশে পা দিয়ে। এই বয়সেই তিনি নিজের জন্যে একটি নূতন পথ কেটে নিয়েছিলেন। কিন্তু দুদিনেই ফুরিয়ে গেল তাঁর সেই পথে পদচারণ করবার মেয়াদ। আঠারো শতাব্দীতে আঠারো বৎসর বয়সে বিলাতের কবি চ্যাটারটন মারা পড়েন। ইংরেজরা এই অকালমৃত্যুর জন্যে আজও দুঃখপ্রকাশ করে। সুকান্তের কথা মনে করলেই আমার চ্যাটারটনের কথা স্মরণ হয়।

উঠতি বয়সে শ্রীমোহিতলাল মজুমদার ও আমি স্বর্গীয় কুমুদনাথ লাহিড়ীর সঙ্গে হামেশাই ওঠা-বসা করতুম। কাব্য-কাকলীর মধ্য দিয়ে কেটে যেত দীর্ঘকাল। কুমুদনাথ খুব ভালো কবিতা লিখতেন। তাঁর স্বকীয়তা ছিল যথেষ্ট, কারুর দ্বারাই হন নি তিনি প্রভাবান্বিত। রবীন্দ্রনাথের দেখাদেখি আজকাল মিলহীন কবিতা লেখার রেওয়াজ হয়েছে। কিন্তু কুমুদনাথ ছাড়া তাঁর সমসাময়িক কোন কবিই বেমিল কবিতারচনা করতেন ব'লে মনে পড়ে না। এখানেও ছিল তাঁর নূতনত্ব। "বিল্বদল" নামে তাঁর রচিত একখানি কবিতার বইও সমালোচকদের দ্বারা সাদরে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু অকালে তিনি মারা গেলেন। লোকেও ভুলে গেল তাঁর কথা।

আবার এমন সব কবিরও নাম করতে পারি, উদীয়মান অবস্থায় অল্পবিস্তর যশ অর্জন ক'রেই ছেড়ে দিয়েছেন যাঁরা কাব্যসাধনা। কেন যে ছেড়ে দিয়েছেন, তা ভালো ক'রে বোঝা যায় না। হ'তে

পারে, তাঁরা হয়তো কবিতারচনা করতেন খেলাচ্ছলেই, ছিল না তাঁদের কবি হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কিংবা হয়তো তাঁদের প্রেরণা ছিল স্বল্পজীবী। যেমন কেমন কোন ছোট নদী গান গেয়ে জলবেণী দুলিয়ে খানিকদূর এগিয়ে হারিয়ে যায় ঊষর মরু-সিকতায়।

এমনি একজন কবি হচ্ছেন শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়। যাঁদের লেখার জোরে চলত "অর্চনা" পত্রিকা, তিনি ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। গদ্যও লিখতেন, পদ্যও লিখতেন—যদিও কবিতার দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী এবং কবিতা রচনা ক'রে তিনি পাঠকদের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর একখানি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছিল, তার নাম "লয়"। একদিক দিয়ে নামটি সার্থক হয়েছে, কারণ তারপর ফণীন্দ্রনাথের আর কোন কাব্যপুঁথি বাজারে দেখা দেয় নি। তিনি আজও বিদ্যমান, কিন্তু কবিতার খাতায় আর কালির আঁচড় কাটেন না। তাঁর ছিল নিজস্ব ভাষা, ভঙ্গি ও বক্তব্য, তাঁর মধ্যে ছিল যথেষ্ট সম্ভাবনা। তিনি ধনী না হ'লেও অর্থাভাবে কষ্ট পান নি, আজও পায়ের উপরে পা দিয়ে ব'সে নিশ্চিন্ত মনে সরকারি পেন্সন ভোগ করছেন। কেন তিনি কবিতাকে ত্যাগ করলেন? নিশ্চয়ই প্রেরণার অভাবে। শক্তির চেয়েও কার্যকরী হচ্ছে প্রেরণা।

তিনি লেখা ছেড়েছেন বটে, কিন্তু "অর্চনা" দলের আরো কেউ কেউ সাহিত্যক্ষেত্রে নাম কিনেছেন এবং আজও লেখনী ত্যাগ করেন নি। যেমন শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় (ফণীন্দ্রনাথের অনুজ)। আমিও "অর্চনা"য় হাতমক্স করতুম—লিখতুম কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ।

ফণীন্দ্রনাথের সঙ্গে জড়িত আছে আমার জীবনস্মৃতির খানিকটা। প্রায় প্রত্যহই তাঁর বাড়ীতে আমাদের একটা সাহিত্য-বৈঠক বসত এবং মাঝে মাঝে সেখানে এসে যোগ দিতেন কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল। খোশগল্পের সঙ্গে সঙ্গে চলত সাহিত্য নিয়ে আলোচনা। অক্ষয়কুমার ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সতীর্থ ও কবিবর বিহারীলালের শিষ্য। আবার বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শনে"র লেখক। তাঁর মুখে শুনতে পেতুম সেকালকার সাহিত্যিকদের কথা। কোন কোন দিন ফণীন্দ্রনাথ হারমোনিয়াম নিয়ে

বসতেন, আর আমি গাইতুম গান। সেই কাঁচা বয়সে জীবনে ছিল না কোন কাজেরই ঝুঁকি, তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় শুধু অকারণ পুলকেই গাইতে পারত প্রাণ ক্ষণিকের গান ক্ষণিক দিনের আলোকে। সেদিন আর ফিরে আসবে না; মানুষের জীবন, সাহিত্য ও চারুকলাও হয়েছে এখন বস্তুতন্ত্রী।

অনেকে অকালে ঝ'রে পড়েছেন এবং অনেকের প্রেরণা অল্প-দিনেই ফুরিয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যে সময়ের কথা বললুম, বাংলা সাহিত্যের দরবারকে তখন মুখরিত ক'রে তুলেছিল বহু কবির কলকণ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, গোবিন্দচন্দ্র দাস ও রজনীকান্ত সেন প্রভৃতি অগ্রজগণ বিরাজমান ছিলেন সগৌরবে। উদীয়মান কবিরূপে প্রশস্তি অর্জন করেছেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রভৃতি। কয়েকজন মহিলা কবিও তখন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন—যেমন কামিনী রায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, সরোজকুমারী দেবী, গিরিন্দ্র-মোহিনী দাসী, মানকুমারী দাসী প্রভৃতি। 'মাইনর' কবিরূপে সুপরিচিত ছিলেন রমণীমোহন ঘোষ, বরদাচরণ মিত্র ও রসময় লাহা প্রভৃতি।

কাব্যজগৎ যখন সরগরম, তখন তাঁদের পরে দেখা দেন শ্রীকালিদাস রায়। বহু পত্রিকার পাতা ওল্টালেই দেখতে পেতুম এই তিনজন কবির কবিতা—জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ও শ্রীকালিদাস রায়।

আজকের পাঠকরা জীবেন্দ্রকুমারকে জানে না। তার দেশ ছিল চট্টগ্রামে। কলকাতার সাহিত্য-পরিষদ-ভবনে একবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি ছিলেন পঙ্গু, পদযুগল ব্যবহার করতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর সাহিত্যশ্রম ছিল অশ্রান্ত। বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর রাশি রাশি রচনা পড়ুয়াদের সামনে এসে হাজির হ'ত। কাব্যকুঞ্জে বাস ক'রেই বোধ হয় তিনি নিজের পঙ্গু দেহের দুঃখ ভুলতে চাইতেন। "নির্মাল্য", "তপোবন" ও

"ধ্যানলোক" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ ক'রে তিনি পরলোক গমন করেন।

কুমুদরঞ্জনও পাড়াগেঁয়ে কবি। বহুকাল আগে একবার মাত্র তাঁকে দেখেছিলুম আমাদের "ভারতী" বৈঠকে। ছোটখাটো একহারা মানুষ, সাদাসিধে বেশভূষা ও কথাবার্তা, কোনরকম চাল নেই। গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষক, নজরুল ইসলাম কিছুদিন তাঁর কাছে ছাত্রজীবন যাপন করেছিলেন। কুমুদরঞ্জনের বয়স এখন সত্তরের কাছাকাছি, কিন্তু যে নিষ্ঠা ও উৎসাহ নিয়ে তিনি কবিজীবন সুরু করেছিলেন, আজও তা সম্পূর্ণ অব্যাহত আছে। আগেও রচনা করতেন রাশি রাশি পদ্য এবং এখনো পত্রিকায় পত্রিকায় কবিতা পরিবেশন করেন ভূরি পরিমাণেই। তিনিই হচ্ছেন সত্যকার স্বভাবকবি। সহর থেকে নিরালা পল্লীপ্রকৃতির শ্যামসুন্দর স্নিগ্ধছায়ায় ব'সে আপন মনে গান গেয়ে যায় বনের পাখী, তিনি হচ্ছেন তারই মত।

কালিদাসও গোড়ার দিকে দস্তুরমত কোমর বেঁধে নিযুক্ত হয়েছিলেন কবিতারচনাকার্যে এবং বেশ কিছুকাল ধ'রে পূর্ণোদ্যমে চালিয়ে গিয়েছিলেন কবিতার কারখানা। কিন্তু ইদানীং তিনি যেন উৎসাহ হারিয়ে হাত গুটিয়ে ব'সে থাকতে চান। সম্পাদকের তাগিদে কখনো-কখনো রচনা করেন দুই একটি কবিতা। কুমুদরঞ্জনের মত কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীও সত্তর বৎসর বয়সেও বিনা তাগিদে পরম উৎসাহে কবিতা রচনা করতেন। কিন্তু করুণানিধান ও কালিদাস ঘাট পার হবার আগেই কবিতার সঙ্গে ক'রে এসেছেন দুয়োরানীর মত ব্যবহার। করুণানিধান তো লেখনী ত্যাগ ক'রেই ব'সে আছেন। কয়েক বৎসর আগে আমি যখন "ছন্দা" পত্রিকার সম্পাদক, করুণানিধানের কাছ থেকে একটি কবিতা প্রার্থনা করি। তিনি পত্রোত্তরে জানালেন, কবিতা টবিতা তাঁর আর আসে না।

কালিদাস কিন্তু একেবারে কলম ছাড়েন নি। মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প পদ্য এবং সেই সঙ্গে অপেক্ষাকৃত বেশী মাত্রায় গদ্য রচনা নিয়ে ব্যাপৃত হয়ে থাকেন। তিনি নাকি স্কুলপাঠ্য পুস্তক লেখেন, যা আমার চোখে পড়বার কথা নয়। কিন্তু বিভিন্ন পত্রিকায়

প্রকাশিত তাঁর সাহিত্যনিবন্ধগুলি আমি প'ড়ে দেখেছি। সেগুলি সুখপাঠ্য রচনা।

তিনি নিজেও শিক্ষাব্রতী। স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখে অর্থ পাওয়া যায়, জীবনধারণের জন্যে যা অত্যন্ত দরকার। কবিতা যশ দিতে পারে, কিন্তু বিত্ত দেবার শক্তি থেকে সে বঞ্চিত। সংসারী হয়ে জীবনের উত্তরার্ধে এই সত্যটা উপলব্ধি ক'রেই হয়তো কবিতার ঝোঁক কমে গিয়েছে কালিদাসের।

হয় "যমুনা", নয় "মর্মবাণী" কার্যালয়ে ব'সে আমি একদিন কবি করুণানিধানের সঙ্গে বাক্যালাপ করছিলুম। এমন সময়ে একটি যুবক ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। দোহারা চেহারা, মুখখানি হাসি-হাসি, কিন্তু সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তার ঘনকৃষ্ণ বর্ণের দিকে। তিনি হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে করুণানিধানকে প্রণাম করলেন।

করুণানিধান আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ইনি কবি কালিদাস রায়।"

মনে মনে ভাবলুম, পুত্রের বর্ণ দেখেই পিতা বোধ হয় নামকরণ করেছিলেন অনেকের মত কানা ছেলেকে পদ্মলোচন ব'লে মনকে দিতে চান নি প্রবোধ।

তারপর জেনেছিলুম কালিদাস কালো চামড়ার তলায় ঢেকে রেখেছেন নিজের পরম শুভ্র ও শুদ্ধ চিত্তটিকে। দলাদলির ধার ধারেন না, বড় বড় সাহিত্যবৈঠকেও তাঁকে দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। জনতা থেকে দূরে একান্তে থাকতেই ভালোবাসতেন। প্রাণ খুলে সমসাময়িকদের প্রশংসা করতে পারেন। যখন আমার "যৌবনের গান" নামে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, তখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হ'ত না বললেই চলে এবং এখনো তাঁর দেখা পাই কালেভদ্রে এখানে ওখানে। হঠাৎ একদিন সবিস্ময়ে দেখলুম, একখানি পত্রিকায় "যৌবনের গানে"র উপরে কালিদাসের লেখা একটি প্রশস্তিপূর্ণ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

কালিদাস কবিতার বই প্রকাশ করেছেন অনেকগুলি—যেমন "কুন্দ", "পর্ণপুট", "বল্লরী", "রসকদম্ব", "ব্রজবেণু", "লাজাঞ্জলি",

"ঋতুমঙ্গল" ও "ক্ষুদকুঁড়া" প্রভৃতি। যখন কাশিমবাজারের স্কুলে পড়তেন, পদ্য লেখা শুরু করেছিলেন তখন থেকেই। মাসিক পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করবার আগে সভায় প্রথম যে কবিতা পাঠ করেন, তার মধ্যে ছিল মদ্য ও মদ্যপায়ীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ। আজও তাঁকে 'পিউরিট্যান' কবি ব'লে বর্ণনা করলে অত্যুক্তি হবে না। স্কুলের চেয়ারে ব'সে হয়েছেন পাকা মাস্টারমশাই—ছেলেদের দেন হিতোপদেশ। বাড়ীতে ফিরে কবির আসনে আসীন হয়েও তিনি লেখেন না আর প্রেমের কবিতা। তিনি বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীর ভক্ত এবং নিজেও পরম বৈষ্ণব। অথচ বৈষ্ণব কবিরা হচ্ছেন প্রধানতঃ প্রেমের কবিই, এটা দেখেও প্রেমকে তিনি 'বয়কট' ক'রে ব'সে আছেন।

মাথার চুল পাকলে কেউ যে প্রেমের কবিতা লেখে, এটাও তিনি পছন্দ করেন না। আমি তখন পঞ্চাশ পার হয়েছি। আমার এক সাহিত্যিক বন্ধু এসে বললেন, "কবি কালিদাস রায় অভিযোগ করছিলেন, এ বয়সে হেমেন্দ্র প্রেমের কবিতা লেখে কেন?"

উত্তরে আমি বললুম, "পঞ্চাশোর্ধ্বেও মনে বনে যাবার ইচ্ছা জাগেনি, তাই।"

তার পরেও তো কেটে গিয়েছে এক যুগ। এই সেদিনও "মাসিক বসুমতী"তে লিখেছি কয়েকটি প্রেমের কবিতা। কবির দেহ নিশ্চয়ই বয়োধর্মের অধীন, কিন্তু কবির মনের কি বয়স আছে? সাহিত্য-গুরু রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন বয়সেও লিখেছেন প্রেমের কবিতা, প্রেমের গান, প্রেমের গল্প। তাঁর একটি কবিতার খানিকটা তুলে দিলুম:

"ওরে কবি সন্ধ্যা হয়ে এল,
কেশে তোমার ধরেছে যে পাক।
ব'সে ব'সে ঊর্ধ্ব পানে চেয়ে
শুনতেছ কি পরকালের ডাক?
কবি কহে, সন্ধ্যা হ'ল বটে,
শুনছি ব'সে ল'য়ে শ্রান্তদেহ
এ পারে ঐ পল্লী হ'তে যদি
আজো হঠাৎ ডাকে আমায় কেহ!

যদি হেথায় বকুলবনচ্ছায়ে
মিলন ঘটে তরুণ-তরুণীতে,
দুটি আঁখির 'পরে দুইটি আঁখি,
মিলিতে চায় দুরন্ত সঙ্গীতে;—
কে তাহাদের মনের কথা ল'য়ে
বীণার তারে তুলবে প্রতিধ্বনি,
আমি যদি ভবের কূলে ব'সে
পরকালের ভালোমন্দই গণি!"

বোধ হয় স্কুলমাস্টারী করলে মানুষের মন বুড়িয়ে যায় তাড়াতাড়ি। কয়েক বৎসর আগে টালিগঞ্জে কালিদাসের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলুম। সদরে বাড়ির নাম লেখা রয়েছে—"সন্ধ্যার কুলায়"। বাড়ির নামেও জীবনসন্ধ্যার ইঙ্গিত! কবির তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আসন্ন অন্ধকারে তিনি শ্রান্ত দেহে বিশ্রাম করবার জন্যে নিজের নীড় বেঁধে নিয়েছেন। কবির পক্ষে এ যেন বড় বাড়াবাড়ি।

কালিদাসকে ভালোবাসি, কিন্তু আজকের কালিদাসকে আমার পছন্দ হয় না। ভাবতে ভালো লাগে সেদিনকার কালিদাসের কথা, যেদিন তিনি কবিতা শুরু করেছিলেন এই ব'লে—"নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।" স্মরণ আছে, কবিতাটি মন্ত্রশক্তির মত পাঠকদের কি ভাবে আকৃষ্ট ক'রেছিল। কবিতাটি ফিরত লোকের মুখে মুখে, তা' মুখস্থ ক'রে ফেলেছিল বালকবালিকারা পর্যন্ত।

স্মরণ আছে, কবিতাটির খ্যাতি দেখে কোন কোন সাহিত্যিকের মনে হয়েছিল হিংসার উদ্রেক। অত্যন্ত অধ্যবসায় সহকারে পুরাতন সাহিত্য হাতড়ে তাঁরা প্রমাণিত করতে চেয়েছিলেন, এ কবিতাটি হচ্ছে রচনাচৌর্যের দৃষ্টান্ত! আসলে কিন্তু কিছুই প্রমাণিত হয়নি।

কালিদাসের পরে আর একজন সুকবি সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দেন শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এবং ঠিক তাঁর পরেই ধূমকেতুর মত আত্মপ্রকাশ করেন নজরুল ইসলাম।

একদিন নাট্য-নিকেতনে (এখন "শ্রীরঙ্গম্") ব'সে অভিনয় দেখছি। আমার পাশেই ঠিক পাশাপাশি আসন গ্রহণ করেছেন

নাট্যকার শ্রীমন্মথনাথ রায় ও কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন।

এমন সময়ে নজরুলের আবির্ভাব।

এসেই তিনি সচীৎকারে ব'লে উঠলেন, "আরে, এ কি তাজ্জব ব্যাপার! রঙ্গালয়ে মন্মথের পাশে সাবিত্রী! হ'ল কি?"

সত্যই তো, সাবিত্রীর সঙ্গে মন্মথ—এমন কথা মহাভারতেও লেখে না। সেখানে যাঁরা ছিলেন, সবাই হো হো ক'রে হেসে উঠলেন।

এমনি ভাবে লোককে হাসাতে পারতেন নজরুল। কিন্তু আজ তাঁর নিজের হাসবার এবং অন্যকে হাসাবার পালা ফুরিয়ে গিয়েছে। ভেবে দুঃখ পাই।

তেরো

যতীন্দ্র গুহ (গোবরবাবু)

স্বর্গীয় বন্ধুবর নরেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন একজন ধনী ও সুরসিক ব্যক্তি। তাঁর বসতবাড়ি ছিল মসজিদবাড়ি স্ট্রীটে পূর্ব-দিকের প্রায় শেষ প্রান্তে। সেইখানে প্রায়ই—বিশেষ ক'রে প্রতি শনিবারে হ'ত বন্ধু-সম্মিলন। যাঁরা উপস্থিত থাকতেন তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন নবীন ও উদীয়মান ব্যারিস্টার। অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরও অভাব ছিল না। নরেনবাবুর সাহিত্যবোধও ছিল, তাই একাধিক সাহিত্যিকও যেতেন তাঁর বৈঠকে। তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছি আমি। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুবৃহৎ গ্রন্থ "বাঙ্গলার ইতিহাস" প্রকাশিত হয়েছিল নরেনবাবুরই অর্থানুকূল্যে।

একদিন সেই বৈঠকে গিয়ে দেখলুম এক অসাধারণ মূর্তি। বিপুলবপু—যেমন লম্বায়, তেমনি চওড়ায়। দেখলেই বোঝা যায়, বিষম জোয়ান তিনি। তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে অমিত-শক্তির প্রত্যেকটি লক্ষণ। বাঙালীদের মধ্যে তেমন চেহারা দুর্লভ।

জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম, তিনি হচ্ছেন নরেনবাবুর আত্মীয় পালোয়ান গোবরবাবু।

গোবরবাবু! তার আগেই তাঁর নাম এর-তার মুখে কিছু কিছু শুনতে পেতুম বটে, কিন্তু সে বিশেষ কিছুই নয়। যেখানে বৃহৎ বৃক্ষের অভাব সেখানে লোকে মস্ত ব'লে ধ'রে নেয় এরণ্ডকেই। কবি বলেছেন, "অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব।" এদেশে তখন কেউ আখড়ায় গিয়ে মাসকয়েক কুস্তি লড়লেই পালোয়ান ব'লে নাম কিনে ফেলত। কিন্তু গোবরবাবু যখন তরুণ (প্রায় বালক) বয়সে [illegible] ইংলণ্ডে যান, তখন তিনি সেখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লদের সগর্বে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন এবং তাঁর কীর্তি-কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল "প্রবাসী" পত্রিকায়।

প্রথমে তাঁর সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা করে স্কটল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর ক্যাম্পবেল। তাকে হার মানতে হ'ল গোবরবাবুর কাছে। তারপর তাঁর সঙ্গে লড়তে আসে জিমি ইসেন। বেজায় তার খাতির, কারণ সে ছিল সমগ্র বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের চ্যাম্পিয়ন—অর্থাৎ সর্ব-শ্রেষ্ঠ বাহাদুর মল্ল। ইংরেজরা মনে মনে ঠিক দিয়ে রেখেছিল যে, এই ছোকরা কালা আদমি তাদের সেরা পালোয়ানের পাল্লায় প'ড়ে নাস্তানাবুদ ও হেরে ভূত হয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ালো অন্যরকম। খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তির পরেই ইসেন বুঝতে পারলে, গোবরবাবুর কাছে সে নিজেই ক্রমেই কাবু হয়ে পড়ছে। তখন নাচার হয়ে, অন্যায় উপায়ের দ্বারা নিজের মান বাঁচাবার জন্যে সে কুস্তি ছেড়ে বক্সিংয়ের প্যাঁচ কষলে—অর্থাৎ গোবরবাবুকে করলে মুষ্ট্যাঘাত। কিন্তু নাছোড়বান্দা গোবরবাবু কুস্তির প্যাঁচেই তাকে করলেন কুপোকাত। "দুর্বল" ব'লে কীর্তিত বাঙালীর ছেলে হ'ল ইংলণ্ডের সর্বজয়ী মল্ল!

"প্রবাসী" পত্রিকায় এই অভাবিত "রোমান্সের" কাহিনী পাঠ করবার পর থেকেই আমি হয়ে প'ড়েছিলুম গোবরবাবুর একান্ত ভক্ত। সাহিত্যে ও ললিতকলায় কোনদিনই বাঙালীর সাধুবাদের অভাব হয়নি। কিন্তু মল্লযুদ্ধেও বাঙালী যে বলদর্পিত ইংরেজদের গর্ব খর্ব করতে পারবে, সেদিন পর্যন্ত এটা ছিল একেবারেই কল্পনাতীত। কিন্তু তখনও আমাদের মন ছিল এমন চেতনাহীন যে বৃটিশ-সিংহের ঘরে গিয়ে তাকে লাঞ্ছিত ও পরাজিত ক'রে প্রথম বাঙালীর ছেলে যেদিন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন, সেদিন পুষ্প-মাল্য, পতাকা নিয়ে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করবার কথা কারুর মনেই উদয় হয়নি। বোধ হয় আমরা ভাবতুম, পালোয়ান উচ্চশ্রেণীর মানুষ ব'লেই গণ্য হ'তে পারে না। আজও কি জাগ্রত হয়েছে আমাদের চেতনা? কত দিকে কত সফরী স্বল্পজলে লাফঝাঁপ মেরে এখানে জনসাধারণের দ্বারা অভিনন্দিত হ'চ্ছে, কিন্তু য়ুরোপ-আমেরিকার প্রথম দিগ্বিজয়ী বাঙালী যোদ্ধাকে তাঁর স্বদেশ আজ পর্যন্ত দিয়েছে কি কোন অভিনন্দন?

নরেনবাবুর মজলিসে জাতির গৌরব এই বঙ্গবীরকে সামনা-সামনি পেয়ে আমার মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

একটা কথা ভেবে প্রায়ই আমার মনে জাগে বিস্ময়। স্বাধীন ভারতের হামবড়া কর্তাব্যক্তিরা আজ বাঙালীকে কাবু ও কোণঠাসা করবার জন্যে কোন চেষ্টারই ত্রুটি করেননি। বাংলার বর্তমান রাজ্যপালও এই সেদিন স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ভারতের অন্য কোন দেশের লোকই বাঙালীকে দু-চোখে দেখতে পারে না। অথচ এই বাঙালী জাতিই উচ্চতর অধিকাংশ বিভাগে সর্বপ্রথমে আধুনিক ভারতের মর্যাদা বাড়াবার চেষ্টা করেছে। বাগ্মিতার জন্যে ইংলণ্ডে সর্বপ্রথমে খ্যাতিলাভ করেছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। আর্য-ধর্ম প্রচারের দ্বারা ভারতের দিকে পৃথিবীর দৃষ্টি সর্বপ্রথমে আকৃষ্ট করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতের অতুলনীয় বৈজ্ঞানিক ব'লে সর্বপ্রথমে খ্যাতিলাভ করেছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। ভারতীয় আধুনিক কাব্য যে বিশ্বসাহিত্যে স্থান পেতে পারে, নোবেল পুরস্কার লাভ ক'রে তা সর্বপ্রথমে প্রমাণিত করেছেন বঙ্গসাহিত্য-গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রাচ্য চিত্রকলাপদ্ধতি প্রবর্তিত ক'রে আধুনিক ভারত-শিল্পকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সর্ব-প্রথমে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতীয় অভিনেতৃ সম্প্রদায় নিয়ে সর্বপ্রথমে পাশ্চাত্য দেশে দেখা দিয়েছেন নাট্যাচার্য শ্রীশিশির-কুমার ভাদুড়ী। ভারতীয় নৃত্যকলাকে নবজন্ম দিয়ে প্রতীচ্যকে অভিভূত করেছেন সর্বপ্রথমে নটনসুর শ্রীউদয়শঙ্কর এবং ভারতবর্ষ যে অধৃষ্য মল্লের দেশ, এ সত্য য়ুরোপের চোখে আঙুল দিয়ে সর্বাগ্রে দেখিয়েছিলেন গোবরবাবু ও শ্রীশরৎকুমার মিত্র; কারণ তাঁরাই গামা, ইমামবক্স, গামু ও আহম্মদ বক্স প্রভৃতিকে সঙ্গে ক'রে সর্বপ্রথমে নিয়ে গিয়েছিলেন য়ুরোপে। এর আগেও আরও দুইজন ভারতীয় পালোয়ান অবশ্য য়ুরোপে গিয়েছিলেন। প্রথম হচ্ছেন প্রাচীন ভুটান সিং; কিন্তু যুবক হেকেনস্মিথের কাছে তিনি পরাজিত হন। দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন গোলাম, ভারতে আজ পর্যন্ত যাঁর নাম অতুলনীয় হয়ে আছে। কিন্তু তুর্কী পালোয়ান আহম্মদ মদ্রালীর কাছে হার মানতে হয়েছিল তাঁকেও। কিন্তু গামা ও

ইমামবক্স য়ুরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ পালোয়ানদের অনায়াসেই ভূমিসাৎ ক'রে অজেয় নাম কিনে দেশে ফিরে আসেন। সেই-ই প্রথম য়ুরোপে ভারতীয় পালোয়ানদের জয়যাত্রার সূত্রপাত।

মল্লযুদ্ধের দিকে গোবরবাবুর প্রবৃত্তি হয়েছিল সহজাতসংস্কারের জন্যেই। বাংলা দেশে এই পুরুষোচিত ক্রীড়ার চর্চা চ'লে আসছে তাঁদের পরিবারে বহুকাল থেকেই। তাঁর পিতামহ অম্বুবাবু ও ক্ষেতুবাবু প্রভৃত অর্থের মালিক হয়েও সাধারণ নিষ্কর্মা ধনীদের মত কমলবিলাসীর জীবনযাপন করতেন না। মুক্তকচ্ছ হয়ে বৈষ্ণবী মায়া নিয়ে তাঁরা মেতে থাকেননি, শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা পেয়ে তাঁরা হয়েছিলেন বীরাচারী শক্তিসাধক। বাড়ীতেই ছিল তাঁদের বিখ্যাত কুস্তির আস্তানা, সেখানকার মাটি গায়ে মাখেননি, ভারতের প্রথম শ্রেণীর পালোয়ানদের মধ্যে এমন লোকের সংখ্যা বেশী নয়। এবং অম্বুবাবু ও ক্ষেতুবাবু নিজেরাও ছিলেন প্রখ্যাত কুস্তিগীর, তাঁদের নাম ফিরত লোকের মুখে মুখে। কেবল বাংলা দেশে নয়, বাংলার বাইরেও। গোবরবাবুর পিতৃদেবকেও আমি দেখেছি। তিনিও কুস্তি লড়তেন কিনা ঠিক জানি না, কিন্তু খুব সম্ভব লড়তেন। কারণ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে তিনিও ছিলেন বিশালকায়। এমন বলী বংশে জন্মগ্রহণ করলে যোদ্ধা না হওয়াই অস্বাভাবিক।

ধীরে ধীরে গোবরবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ জ'মে উঠতে লাগল। এবং ধীরে ধীরে আমার সামনে খুলে যেতে লাগল তাঁর প্রকৃতির নূতন নূতন দিক। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, পালোয়ানরা কেবল কুস্তি লড়ে, মুগুর ভাঁজে ও ডন-বৈঠক দেয় এবং অবসরকালে ভোম হয়ে থাকে ভাঙের নেশায়। জানি না গোবরবাবু বাঙালী ব'লেই এটা সম্ভবপর হয়েছে কি না, কিন্তু তাঁকে দেখে বুঝলুম, পালোয়ানকুলেও প্রহ্লাদ জন্মায়।

নরেনবাবুর বাড়ীতে কেবল গালগল্পের মজলিস বসত না। প্রতি শনিবারে সেখানে নাতিবৃহৎ মাইফেলের আয়োজন হ'ত এবং প্রতি শনিবারের সন্ধ্যায় কেবল নামজাদা স্থানীয় শিল্পীরা নন, বাংলার বাইরেকার ভারতবিখ্যাত গাইয়ে-বাজিয়েও এসে আসরে আসীন হতেন। এমন দিন ছিল না, গোবরবাবু যেদিন সেখানে

হাজিরা না দিতেন। কেবল হাজিরা দেওয়া নয়, তাঁর মুখ দেখলেই বোঝা যেত, সংগীতসুধা পান করছেন তিনি প্রাণমনকান ভ'রে। সস্তায় সমঝদার সাজবার জন্যে থেকে থেকে বাঁধা বুলি কপচে উঠতেন না, চুপ ক'রে ব'সে ব'সে উপভোগ করতেন গানবাজনা। পরে শুনলুম তিনি নিজেও সংগীতশিল্পী, তাঁকে তালিম দিয়েছিলেন প্রখ্যাত ব্যাঞ্জো-বাদক স্বর্গীয় ককুভ খাঁ।

ক্রমে গোবরবাবুর সঙ্গে পরিচয় হ'ল আরো ঘনিষ্ঠ। মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে সাহিত্য সম্পর্কীয় আলোচনাও হ'তে লাগল। বুঝলুম পালোয়ানি প্যাঁচের মধ্যে প'ড়ে তাঁর মস্তিষ্ক আড়ষ্ট হয়ে যায় নি, তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ আছে, সাহিত্য-প্রসঙ্গ তুললেও তাঁর মুখ বন্ধ হয় না, স্বদেশী ও বিদেশী সাহিত্য সম্বন্ধেও খবরাখবর রাখবার জন্যে তাঁর আগ্রহের অভাব নেই।

তারপর প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই বসতুম গিয়ে তাঁর বৈঠকখানায়। আর একজন সাহিত্যিক সেখানে শিকড় গেড়ে বসলেন, তিনি হচ্ছেন শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী। গালগল্প হ'ত, খেলাধুলার আলোচনা হ'ত, দুনিয়ার বিখ্যাত বলবান ব্যক্তিদের কথা হ'ত, সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পের প্রসঙ্গও বাদ দেওয়া হ'ত না। সেখানে আরো যে সব ব্যক্তি উপস্থিত থাকতেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন গোবরবাবুর আখড়ার শিক্ষার্থী পালোয়ান এবং মাঝে মাঝে আসরাসীন হ'তেন বিখ্যাত ভীম ভবানীও। উচ্চতর আলোচনা পরিপাক করবার শক্তি তাঁদের ছিল না বটে, তবে তাঁরা চুপচাপ ব'সে ব'সে শুনতেন আমাদের কথোপকথন। এর আগেই বলেছি, ভীম ভবানী এক সময়ে বিদ্যালয়ে আমার সহপাঠী ছিলেন। পরে তিনি অল্পবয়সেই লেখাপড়া ছেড়ে শক্তিচর্চা নিয়ে মেতে ওঠেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি যদি মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্যে অল্পবিস্তর অবহিত হ'তেন, তাহ'লে সিদ্ধির পথে নিশ্চয়ই হ'তে পারতেন অধিকতর অগ্রসর।

দেহে ও মনে সমানভাবে শিক্ষিত যোদ্ধারা যে কতদূর অগ্রসর হ'তে পারেন, আমেরিকার বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা জেনে টুনির কথা স্মরণ করলেই সে সত্য উপলব্ধি করা যায়। উচ্চশিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে টুনি ছিলেন [illegible]ই একজন, অথচ মুষ্টিযুদ্ধ

নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছিলেন আট নয় বৎসরকাল। এই সময়ের মধ্যে তিনি একবার মাত্র হেরে গিয়েছিলেন প্রখ্যাত যোদ্ধা হ্যারি গ্রেবের কাছে। কিন্তু তারপরেই তাঁকে উপর-উপরি তিনবার হারিয়ে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেন। টুনি যে বৎসরে মুষ্টিযুদ্ধ শুরু করেন, সেই বৎসরেই (১৯১৯ খৃঃ) জ্যাক ডেম্পসি "পৃথিবীজয়ী" উপাধি লাভ করেন। তারপর থেকে তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারে পৃথিবীতে এমন কেউ আর রইল না। একজন মাত্র মুষ্টিযোদ্ধাকে তাঁর সমকক্ষ ব'লে সকলে মনে করত, তিনি হচ্ছেন ফ্রান্সের জর্জেস কার্পেনটিয়ার। কিন্তু ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ডেম্প্‌সি তাঁকেও মাত্র চার রাউণ্ডে হারিয়ে দিলেন। তারই তিন বৎসর পরে টুনিও হারিয়ে দিলেন কার্পেনটিয়ারকে এবং ডেম্পসিকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধের জগতে ডেম্প্‌সি তখন বিরাজ করছেন নেপোলিয়নের মত, তাঁর নাগাল ধরবার জন্যে টুনিকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। অবশেষে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে টুনির সঙ্গে ডেম্প্‌সির শক্তিপরীক্ষা হয় এবং দশ রাউণ্ডের মধ্যে ডেম্প্‌সি হেরে যান। "পৃথিবীজেতা" উপাধি হারিয়ে পূর্ব গৌরব পুনরুদ্ধার করবার জন্যে পর বৎসরেই ডেম্প্‌সি আবার টুনির সঙ্গে মুখোমুখি হন এবং আবার হেরে যান। ডেম্প্‌সির পতনের পর টুনি হলেন পৃথিবীজেতা মুষ্টিযোদ্ধা ও বিপুল বিত্তের অধিকারী, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে গ্রহণ করলেন চিরবিদায়। বললেন, "আমি হাতে বক্সিং-এর দস্তানা পরেছিলুম কেবল টাকা রোজগারের জন্যে। আমার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, আর লড়াই নয়, এবার থেকে লেখাপড়া নিয়ে আমি কাল কাটাতে চাই।" আমেরিকার মুষ্টিযুদ্ধের দীর্ঘ ইতিহাসে দেখা যায়, টুনি হচ্ছেন একমাত্র "হেভি-ওয়েট" যোদ্ধা, পৃথিবীজেতা উপাধি লাভ করবার পরেও যিনি অক্ষুণ্ণ গৌরবে বিদায় নিতে পেরেছিলেন। আর সবাই অতিরিক্ত টাকার লোভে যৌবনসীমা পেরিয়েও বার বার লড়াই করেছেন এবং অবশেষে মান ও উপাধি হারিয়ে স'রে পড়েছেন চোখের আড়ালে। টুনি ছিলেন বিদ্বান, এ ভ্রম তিনি করেননি। এখন তাঁর বয়স তিপ্পান্ন বৎসর চলছে এবং মুষ্টিযুদ্ধের আসর থেকে তিনি বিদায় নিয়েছিলেন

ত্রিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হবার আগেই। কেবল টুনি নন, আমেরিকার আরো কয়েকজন মুষ্টিযোদ্ধা উচ্চশিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন।

সর্বকালেই অতুলনীয় জ্যাক জনসন। শ্বেতাঙ্গরা তাঁকে কোনদিনই হারাতে পারত কি না কে জানে, কিন্তু "পৃথিবীজেতা" উপাধি ত্যাগ না করলে পাছে তাঁকে শ্বেত গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হয়, সেই ভয়ে জ্যাক জনসন দায়ে প'ড়ে জেস উইলার্ড নামে এক নিকৃষ্ট যোদ্ধার কাছে যেচে হার মানতে বাধ্য হন।

জনসন জাতে নিগ্রো এবং পেশায় মুষ্টিযোদ্ধা বটে, কিন্তু তাঁকেও অন্ততঃ বিদ্বৎকল্প বলা যেতে পারে। কারণ সাংবাদিকরা যখনই তাঁর কাছে গিয়েছেন তখন প্রায়ই তাঁর মুখে শুনেছেন দর্শনশাস্ত্রের কথা। ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণীর পালোয়ানদের মধ্যে গোবরবাবু ছাড়া আর কোন শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন ব'লে জানি না। এখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ দুই পালোয়ানই (গামা ও ইমাম) নিরক্ষর।

গোবরবাবু যখন দ্বিতীয় বার ইংলণ্ডে গিয়ে শ্বেতদ্বীপ জয় করেন, তখন মরিস ডিরিয়াজ নামে একজন প্রথম শ্রেণীর পালোয়ান প্যারিস শহরে একটি মস্ত দঙ্গলের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং সেখানে কুস্তি লড়েছিলেন বহু শ্বেতাঙ্গ পালোয়ান। গোবরবাবুও সেই দঙ্গলে যোগ দিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ সেটা ১৯১২ কি ১৩ খৃষ্টাব্দের কথা। জ্যাক জনসন তখন শ্বেতাঙ্গ গুণ্ডাদের অত্যাচারে আমেরিকা ছেড়ে প্যারিসে পালিয়ে এসেছিলেন এবং সেই সময়ে গোবরবাবুর সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় হয়।

কেবল কুস্তির কৌশল নয়, পালোয়ানদের দৈহিক শক্তির উপরেও যথেষ্ট নির্ভর করতে হয়। গায়ের জোরে স্যাণ্ডো যে গামার চেয়ে বলবান ছিলেন, এমন কথা মনে করবার কারণ নেই। গোবরবাবুও একজন মহাবলী ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর মুখে মুষ্টিযোদ্ধা জ্যাক জনসনের সহ্যক্ষমতা ও শারীরিক শক্তির যে বর্ণনা শুনেছি, তা চমকপ্রদ ও বিস্ময়জনক।

বক্সারদের মুষ্টি আর ভারতীয় পালোয়ানদের "রন্দা", এ দুইই হচ্ছে ভয়াবহ ব্যাপার। যাদের অভ্যাস নেই, মহাবলবান হ'লেও বড়

পালোয়ানের হাতের এক রদ্দা খেলে তারা মাটির উপরে আর পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। কিন্তু জ্যাক জনসন একদিন শখ ক'রে গোবরবাবুকে তাঁর ঘাড়ের উপরে রদ্দা মারবার জন্যে আহ্বান করেছিলেন। গোবরবাবু তাঁকে বিশ-পঁচিশবার রদ্দা মারেন সজোরে, কিন্তু জনসন্ একটুও কাতর না হয়ে হাসিমুখে অটলভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিলেন।

তারপর জনসন একটি সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে গিয়ে গোবরবাবুকে বলেন, "এইবারে আমাকে ঘুসি মারো দেখি।" কিন্তু এমনি তাঁর ক্ষিপ্রকারিতা ও পাঁয়তারার কায়দা যে, বহু চেষ্টার পরেও গোবরবাবু জনসনের দেহ স্পর্শ করতেও পারেননি।

গোবরবাবুর বৈঠকখানায় আমরা বেশ কিছুকাল সানন্দে কাটিয়ে দিয়েছিলুম। সন্ধ্যার পর প্রায়ই সেখানে আসতেন অদ্বিতীয় সরদ-বাদক স্বর্গীয় ওস্তাদ করমতুল্লা খাঁ, স্বর্গীয় ওস্তাদ গায়ক জমীরুদ্দিন খাঁ, প্রসিদ্ধ তবলাবাদক স্বর্গীয় দর্শন সিং ও গায়ক-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে প্রভৃতি শিল্পিগণ। গুণীরা বইয়ে দিতেন সুরের সুরধুনী এবং লীলায়িত হয়ে উঠত আমাদের মন তারই ছন্দে ছন্দে। এক-একদিন আমাদের সৌন্দর্যের স্বপ্নভঙ্গ হ'ত প্রায় ভোরের বিহঙ্গকাকলির সঙ্গে সঙ্গে।

তারপর গোবরবাবু আবার দীর্ঘকালের জন্যে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে গেলেন আমেরিকার দিকে।

চৌদ্দ

ইয়াঙ্কিস্থানে বাঙালী মল্ল

অনেক সময় কেবল কৌশলেই প্রতিপক্ষকে কুপোকাত করা যায়। আমি এমন লাঠিয়াল দেখেছি. যার ক্ষুদে একহারা চেহারা একেবারেই নগণ্য। কিন্তু তার সামনে অতিকায়, মহাবলবান ব্যক্তিও লাঠি হাতে ক'রে দাঁড়াতে পারে নি।

কুস্তিতেও প্রতিপক্ষকে কাবু করবার একটা প্রধান উপায় হচ্ছে, প্যাঁচ। কাল্লু পালোয়ানের কাছে কিঙ্কর সিং হেরে গিয়েছিলেন, সে কথা আগেই বলেছি। অথচ কেবল শারীরিক শক্তির উপরেই যদি কুস্তির হারজিত নির্ভর করত, তাহ'লে কাল্লুর সাধ্যও ছিল না কিঙ্করকে হারিয়ে দেবার। কারণ কিঙ্কর যে কাল্লুর চেয়ে ঢের বেশী জোয়ান ছিলেন এ বিষয়ে আমার একটুও সন্দেহ নেই।

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ছে আর একটি কথা। ইতিপূর্বেই গামা বনাম হাসান বক্সের কুস্তির কথা বর্ণনা করেছি। জয়লাভের পর গামা যখন বিজয়গৌরবে উৎফুল্ল হয়ে একটি মস্ত রূপোর গদা কাঁধে ক'রে আখড়ার চারিদিকে পরিক্রমণ করছেন, তখন দর্শকদের আসন থেকে হঠাৎ এক জাপানী ভদ্রলোক উঠে এসে গামাকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করলেন। সবাই তো রীতিমত অবাক, কারণ গামার সঙ্গে জাপানীটির চেহারা দেখাচ্ছিল বালখিল্যের মতই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু জাপানীটি ছিলেন যুযুৎসু যুদ্ধে বিশেষজ্ঞ। বললেন, গামা যদি জামা-কাপড় প'রে আসেন তাহ'লে তিনি তখনি তাঁর সঙ্গে লড়তে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু গামা হচ্ছেন কুস্তির খলিফা, যুযুৎসুর প্যাঁচ তাঁর অজানা, কাজেই জাপানীর প্রস্তাবে রাজী হলেন না। অথচ গামা কেবল প্যাঁচের জোরে লড়েন না, তাঁর দেহেও আছে প্রচণ্ড শক্তি। এমন কথাও জানি, গামা তাঁরও চেয়ে আকারে ঢের বড় ও ভারী

ওজনের বিখ্যাত পালোয়ানকে পিঠে নিয়ে সিধে হয়ে মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

গোবরবাবুও একজন মহাশক্তিধর। বহুকাল আগে বিডন রো নামক রাস্তায় তাঁর যে আখড়া ছিল, সেখানে আমি মাঝে মাঝে কুস্তি লড়া দেখতে যেতুম। সেই আখড়ায় দেখেছিলুম আমি ভীষণ এক মুগুর। যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি গুরুভার—ওজনে হবে কয়েক মণ। ভেবেছিলুম সেটা সেখানে রক্ষিত আছে হয়তো কেবল শোভাবর্ধনের জন্যই, কারণ তেমন মুগুর নিয়ে কেউ যে ব্যায়াম করতে পারে, আমার কাছে তা সম্ভবপর ব'লে মনে হয় নি। কিন্তু পরে শুনলুম, ব্যায়ামের সময়ে গোবরবাবু সেই মুগুর ব্যবহার করেছেন।

সেখানে আর একটি দ্রষ্টব্য জিনিস ছিল। মস্ত বড় একটি পাথরের হাঁসুলি। তারও ওজন বোধ করি দেড় মণের কম হবে না। শুনলুম সেই হাঁসুলি গলায় প'রে গোবরবাবু দেন ডন-বৈঠক। পুরাতন "প্রবাসী" পত্রিকায় হাঁসুলি-পরা গোবরবাবুর একখানি ছবিও প্রকাশিত হয়েছিল।

গোবরবাবুর বৈঠকখানার আনন্দ-আসর উঠে গেল, কারণ প্রধান বৈঠকধারী পাড়ি দিতে চললেন মহাসাগরের ওপারে। তেমন জমাট আসর ভেঙে যাওয়াতে মন একটু খুঁতখুঁত করেছিল বটে কিন্তু বন্ধুবর সিন্ধুপারে যাচ্ছেন শ্বেতাঙ্গদলনে, এটা ভেবে মনের সে খুঁতখুঁতুনি সেরে যেতে দেরি লাগল না।

অতঃপর বাঙালী পাঠকদের অবগতির জন্যে পাশ্চাত্য দেশের মল্লযুদ্ধ সম্বন্ধে দুই-চার কথা বলা দরকার মনে করছি, কারণ তার সঙ্গে ভারতীয় মল্লযুদ্ধের পার্থক্য আছে অল্পবিস্তর। এ দেশে অনেক সময়ে হাল্কা ওজনের পালোয়ানের সঙ্গে ভারী ওজনের পালোয়ানের প্রতিযোগিতা হয় এবং কোনক্রমে প্রতিপক্ষকে একবার চিত ক'রে দিতে পারলেই লড়াই ফতে হয়ে যায়। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের আইন-কানুন আলাদা।

সেখানে কুস্তি হয় প্রায় সমান ওজনের পালোয়ানদের মধ্যে। ওজন অনুসারে পালোয়ানদের শ্রেণী বিভাগ করা হয়, যেমন হেভি ওয়েট, লাইট হেভিওয়েট, মিডল ওয়েট, ওয়েল্টার ওয়েট ও লাইট

ওয়েট প্রভৃতি। বক্সিংয়ের মত কুস্তিতেও সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয় গুরুভার বা হেভি ওয়েট পালোয়ানদের।

গুরুভার পালোয়ানদের মধ্যে বিখ্যাত হয়েছেন টম কোর্নস, জ্যাক কারকিক, ইভান লিউইস, য়ুসুফ (তুর্কী), জর্জ হেকেনস্মিথ, ফ্রাঙ্ক গচ (অজেয় অবস্থাতেই কুস্তি ছেড়ে দেন), জো ষ্টেচার, আর্ল ক্যাডক, ষ্টানিসলস, বিস্কো, টম জেঙ্কিন্স ও ডাঃ রোলার প্রভৃতি।

তিনবার কুস্তি লড়া হয়। যে বেশীবার প্রতিপক্ষকে মাটির উপরে চিত ক'রে ফেলতে পারে, জয়ী হয় সেইই। কিন্তু কেবল চিত করলেই চলে না, ভূপাতিত প্রতিদ্বন্দ্বীর দুই স্কন্ধ এক সময়েই মাটি স্পর্শ করা চাই (এ দেশে গামা ও হাসান বক্সের কুস্তির সময়ে দেখেছি, হাসান বক্সকে আধা-চিত ক'রেই গামা জয়ী ব'লে নাম কিনেছিলেন। পাশ্চাত্য দেশে ও-রকম জয় নাকচ হয়ে যেত)।

বর্তমান শতাব্দীর প্রায় প্রথম থেকে যাঁরা পরে পরে পৃথিবী-জেতা কুস্তিগীর ব'লে পরিচিত হয়েছিলেন, তাঁদের নাম হচ্ছে এই ঃ জর্জ হেকেনস্মিথ (১৯০৩—১৯০৮); ফ্রাঙ্ক গচ (১৯০৮—১৯১৬); জো ষ্টেচার (১৯১৬—১৯১৮); আর্ল ক্যাডক (১৯১৮); জো ষ্টেচার (১৯২০); ডবলিউ বিস্কো (১৯২১); এডওয়ার্ড লুইস (১৯২১) ষ্ট্যানিসলস্ বিস্কো (১৯২২) এবং এডওয়ার্ড লুইস (১৯২২)। লুইসের পর আর কারুর নাম করা বাহুল্য মাত্র, কারণ তিনি পৃথিবী-জেতা থাকতে থাকতেই গোবরবাবুর সঙ্গে তাঁর কুস্তি প্রতিযোগিতা হয়।

য়ুরোপ-আমেরিকাতেও সাধারণতঃ মনে করা হয়, একান্তভাবে পশুশক্তির সাধনা ক'রে কুস্তিগীররা নেমে যায় মনুষ্যত্বের নিম্নতম ধাপে। কিন্তু এডওয়ার্ড লুইস এ শ্রেণীর লোক নন। তিনি শিক্ষিত ও মার্জিত ভদ্রলোক। প্রথম কুস্তি আরম্ভ ক'রে তিনি ডাক্তার রোলার (যিনি ভারতের গামার কাছে পরাজিত হয়েছিলেন), চার্লি কাটলার, ফ্রেড বিল ও আমেরিকাসের কাছে হেরে যান। কিন্তু তারপর একাগ্রচিত্তে সাধনা ক'রে তিনি সত্য সত্যই একজন প্রথম শ্রেণীর দক্ষ ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হয়ে ওঠেন। তিনি একরকম হাতের প্যাঁচ আবিষ্কার করেন, তার চাপে প্রতিদ্বন্দ্বীদের দম বন্ধ হয়ে

আসত। তাঁর এই প্যাঁচ সামলাতে না পেরে সবাই হেরে যেতে লাগল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে নিউ ইয়র্ক শহরে একটি সার্বজনীক কুস্তি প্রতিযোগিতা হয়, সেখানে (নিশ্চয় ভারতবর্ষ ছাড়া) পৃথিবীর সর্ব-দেশের পঞ্চাশ জন বিখ্যাত পালোয়ান যোগ দিয়েছিলেন। লুইস তাঁর দারুণ হাতের প্যাঁচের জোরে পরাজিত করেছিলেন তাঁদের প্রত্যেককেই। সেই থেকে তাঁর নাম হয় ষ্ট্র্যাঙ্গলার (বা শ্বাস-রোধকারী) লুইস।

লুইস প্রথমে হারান পৃথিবীজেতা জো ষ্টেচারকে। তারপর ষ্টানিসলস বিস্কোর কাছে হেরে (১৯২২) ঐ বৎসরেই আবার তাঁকে হারিয়ে পৃথিবীজেতা উপাধি লাভ করেন।

পরে ঐ উপাধি হারিয়েও মল্লসমাজে লুইসের মানমর্যাদা ছিল যথেষ্ট। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপ-আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ থেকে পঁচিশ জন বিখ্যাত পালোয়ান ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে লুইসেরও এখানে আসবার কথা ছিল। কিন্তু তাঁর সৌভাগ্যবশতঃ শেষ পর্যন্ত তিনি আসেন নি, কারণ এলে পরে নিশ্চয়ই তাঁকে মুখে চুণ-কালি মেখে দেশে ফিরে যেতে হ'ত। ভারতীয় মল্লদের কেল্লা রক্ষা করেছেন তখন অপরাজেয় গামা এবং ইমামবক্স। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে আর একজন ভূতপূর্ব পৃথিবীজেতা শ্বেতাঙ্গ মল্ল ষ্টানিসলস বিস্কো পাতিয়ালায় গামার সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা করতে গিয়ে এক মিনিট পূর্ণ হবার আগেই ভূতলশায়ী হয়েছিলেন। এবারেও বিদেশী মল্লদের ক্রমাগত লাফালাফি করতে দেখে গামা ঘোষণা করলেন—"এই আমি ব্যাঙ্কে পাঁচ হাজার টাকা জমা রাখলুম। আমি এক দিনে এক আখড়ায় দাঁড়িয়ে একে একে পঁচিশ জন সাহেবের সঙ্গে লড়ব। যদি কেউ আমাকে হারাতে বা আমার সঙ্গে সমান সমান হ'তে পারেন, তাহ'লে তিনিই পাবেন ঐ পাঁচ হাজার টাকা।" গামা তখন বৃদ্ধ, বয়স ঊনষাট বৎসর। কিন্তু ঐ পঁচিশ জনের একজনও সাহস ক'রে তাঁর সঙ্গে লড়তে রাজী হ'ল না! আর তারা গামা বা ইমামবক্সের সঙ্গে লড়বে কি, তাদের অধিকাংশই হেরে গিয়েছিল ভারতীয় মল্ল-সমাজে তখনও পর্যন্ত অখ্যাতনামা হরবন্স সিংয়েরই কাছে।

আমাদের গোবরবাবু আমেরিকায় যান ষ্ট্র্যাঙ্গলার লুইসেরই সঙ্গে

৯

শক্তিপরীক্ষা করার জন্যে। কিন্তু তিনি তখন পৃথিবীজেতা পালোয়ান এবং গোবরবাবু হচ্ছেন একে কালা আদমি, তার উপরে নবাগত। বহুকাল আগে তিনি ইংলণ্ডের সেরা সেরা পালোয়ানকে ভূমিসাৎ করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর সে পরিচয় বিশেষ কোন কাজে লাগল না। আমেরিকায় কালা আদমিরা হচ্ছে চোখের বালির মত। আমি গোবরবাবুর মুখেই শুনেছি, আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গদের হোটেলে তাঁর প্রবেশাধিকারই ছিল না। যেখানে বর্ণবিদ্বেষ এমন প্রবল, সেখানে সুবিচারের সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে। এমন কি ইংরেজরাও প্রথমে গামা ও ইমামবক্স প্রভৃতিকে আমলে আনতে রাজী হয় নি। আসল কথা, শ্বেতাঙ্গদের মল্লকে কৃষ্ণাঙ্গদের লড়াই করতে যাওয়া অনেকটা বিড়ম্বনারই মত। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের চ্যাম্পিয়ন জিমি ইসেন শেষ পর্যন্ত গোবরবাবুর কাছে হারতে বাধ্য হয়েছিল বটে, কিন্তু লড়তে লড়তে সে যখন মুষ্টিযুদ্ধের আশ্রয় নিয়েছিল, তখন শ্বেতাঙ্গ বিচারক তা "ফাউল" ব'লে গণ্য করে নি। তবু কপাল ঠুকে গোবরবাবু বেরিয়ে পড়েছিলেন ইয়াঙ্কিদের দর্পচূর্ণ করবার জন্যে। তবে নতুন ক'রে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দেবার জন্যে তাঁকে উপরে উঠতে হ'ল সিঁড়ির নিচের ধাপ থেকে।

এখানে আর একটা কথা ব'লে রাখা দরকার। গোবরবাবু ভারতীয় কুস্তি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন মাত্র একবার—তাও পরিণত বয়সে। এবং সেই যুদ্ধই তাঁর শেষ যুদ্ধ। যদিও এ দেশে থাকতে নানা আখড়ায় তিনি কুস্তি লড়েছেন অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ মল্লের সঙ্গেই। শুনেছি একবার ইমামবক্সের সঙ্গেও কুস্তি ল'ড়ে তিনি সমান সমান হয়েছিলেন। তাঁর নিজেরই আখড়ায় ছিলেন মাহিনাকরা প্রথম শ্রেণীর পালোয়ানরা। যদিও গোবরবাবু ভারতীয় কুস্তিগীরদের নাড়ীনক্ষত্রের খবর রাখেন নিজের নখদর্পণে, তবু আখড়ার কুস্তি নিয়ে বাইরে নাড়াচাড়া করার রেওয়াজ নেই।

আখড়ার কুস্তিতে পালোয়ানরা নিজেদের সম্যক শক্তি ব্যবহার করেন না। প্রদর্শনী বা exhibition কুস্তি ও মুষ্টিযুদ্ধেও অনেকটা ঐ ব্যাপারই দেখা যায়। যোদ্ধাদের কাছে তা হচ্ছে প্রায় খেলার সামিল, জনসাধারণকে আনন্দদানই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু

বুদ্ধিমান যোদ্ধারা ঐ কুস্তি বা মুষ্টিযুদ্ধের প্রদর্শনীতে প্রতিপক্ষের শক্তির মাত্রা কতকটা আন্দাজ ক'রে নিতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ সালিভান ও কর্বেটের বিখ্যাত মুষ্টিযুদ্ধের উল্লেখ করা যায়। মুষ্টি-যুদ্ধের ক্ষেত্রে জন এল সালিভান যখন অদ্বিতীয় এবং কারুর কাছে কখনো পরাজিত হন নি, সেই সময়ে উদীয়মান যোদ্ধা জেমস জে কর্বেটের সঙ্গে তাঁর প্রদর্শনী-যুদ্ধের ব্যবস্থা হয়। কর্বেট তার আগেই একজন সাধারণ যোদ্ধার কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু আমেরিকায় তাঁকেই হেভী ওয়েটে সবচেয়ে চতুর যোদ্ধা ব'লে স্বীকার করা হয়। প্রদর্শনী-যুদ্ধে সালিভানের সঙ্গে মাত্র চার রাউন্ড ল'ড়েই কর্বেট তাঁর শক্তির পরিমাণ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আন্দাজ ক'রে নিয়ে পর বৎসরেই (১৮৯২) তাঁকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেন এবং যুদ্ধে জয়ী হয়ে "পৃথিবীজেতা" নাম কেনেন।

সুতরাং প্রথম শ্রেণীর নামজাদা ভারতীয় পালোয়ানদের সঙ্গে বারংবার ধস্তাধস্তি ক'রে গোবরবাবুও যে তাঁদের শক্তির পরিমাপ সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পেরেছিলেন, একথা অনায়াসেই অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু তবু তিনি এদেশী পালোয়ানদের সঙ্গে প্রকাশ্যে কুস্তি না ল'ড়ে বার বার পাশ্চাত্য দেশে গিয়েছেন, সেখানে প্রতিষ্ঠিত করতে ভারতের বিজয়গৌরব। প্রথমবার তিনি গামা ও ইমামবক্স প্রভৃতিকে নিয়ে ইংলণ্ডে গিয়ে সেখানে তাঁদের প্রতিষ্ঠা বাড়িয়ে আসেন। দ্বিতীয়বার নিজেই গিয়ে ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লরূপে পরিচিত হন। তৃতীয়বার তিনি যান আমেরিকায় সর্বোচ্চ "পৃথিবীজেতা" উপাধি অর্জন করবার জন্যে।

কিন্তু এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল করবার জন্যে তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে অসামান্য কায়িক শ্রম। বৎসরের পর বৎসর ধ'রে তিনি শ্বেতাঙ্গ পালোয়ানের পর পালোয়ানকে ধরাশায়ী করেছেন। তাঁর তখনকার কথা নিয়ে আমি যথাসময়ে বাংলা পত্রিকায় আলোচনা করেছি। বাংলা কাগজওয়ালারা যা তা ব্যাপার নিয়ে প্রচুর আবোল তাবোল বকতে পারেন, কিন্তু বাঙালীর এই অতুলনীয় কীর্তি নিয়ে কেউ মাথা ঘামানো দরকার মনে করেন নি। গোবরবাবুর অবদান বাংলা দেশে প্রায় অবিখ্যাত হয়ে আছে। গামা মাত্র দুইজন শ্রেষ্ঠ শ্বেত

পালোয়ানকে (রোলার ও বিস্কো) হারিয়ে নাম কিনেছেন, কিন্তু গোবরবাবু ধূলিলুণ্ঠিত করেছেন দলে দলে শ্বেতাঙ্গ যোদ্ধাকে। ভারতের আর কোন পালোয়ানই এত বেশী শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে জয়ী হন নি।

সবাই যখন হার মেনে পথ ছেড়ে দিলে, তখন বাকি রইল কেবল সর্বোচ্চ শ্রেণীর দুইজন মাত্র অধৃষ্য কুস্তিগীর। গুরুভার ষ্ট্র্যাঙ্গলার এডওয়ার্ড লুইস এবং পৃথিবীজয়ী লঘুতর গুরুভার (লাইট হেভি ওয়েট) অ্যাড স্যান্টেল। গোবরবাবু প্রথমে সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান করলেন অ্যাড স্যান্টেলকে। দুজনে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'লেন। কিন্তু স্যান্টেল দাঁড়াতে পারলেন না গোবরবাবুর সামনে। বাঙালীর ছেলের মাথায় উঠল পৃথিবীজয়ীর মুকুট। আর কোন ভারতীয় মল্ল আজ পর্যন্ত এই সম্মান অর্জন করতে পারেন নি। এর পরে গোবর-বাবুর সামনে রইলেন কেবল ষ্ট্র্যাঙ্গলার লুইস।

পনেরো

বাঙালী মল্লের অভিযান

লাইট-হেভি ওয়েটে পৃথিবীজেতা পদবী লাভ করার মানেই হচ্ছে অসামান্য সম্মানের অধিকারী হওয়া, কারণ সমগ্র পৃথিবীর প্রথম বা সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লের পরেই লাইট-হেভি ওয়েটের আসন। গামা থেকে আরম্ভ ক'রে আর কোন ভারতীয় মল্লই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার সুযোগ গ্রহণ করেন নি। গামা কেবল ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লরূপে "জনবুল বেল্টে"র অধিকারী হয়েছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র গোবরবাবুই ঐ পদবী লাভ করতে পেরেছেন। যে বাংলাদেশে দুই যুগ আগে উচ্চশ্রেণীর কুস্তিগীর ছিল দুর্লভ, সেই সময়েই গোবরবাবু অভাবিত ভাবে প্রমাণিত করে-ছিলেন যে, কেবল জ্ঞান বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ললিতকলার ক্ষেত্রে নয়, বীরাচারীর কর্তব্যপালনেও সকলের পুরোভাগে গিয়ে দাঁড়াতে পারে ব্যাঘ্রভূমি বঙ্গভূমির সন্তান।

ফুটবল খেলার মাঠে মোহনবাগান প্রথম "শীল্ড" বিজয়ী হয়ে অর্জন করেছে চিরস্মরণীয় কীর্তি। মোহনবাগানের সম্মানকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না ক'রেই বলতে পারি, ফুটবলের মাঠে জয়লাভ করা যায় প্রধানত ক্রীড়ানৈপুণ্যের জন্যেই। তার নিরিখ নির্ণীত হয় যদি শারীরিক শক্তি হিসাবে, তাহ'লে এখনো কোন বাঙালী দলই কোন নিম্নতর শ্রেণীর ইংরেজ দলের জয়পতাকাকেও নমিত করতে পারবে কিনা সন্দেহ! তার উপরে আমরা নিম্নতর শ্রেণীর ইংরেজ দলকে হারাতে পারি স্বদেশে ব'সেই। খাস বিলাতে গিয়ে সেখানকার প্রথম শ্রেণীর পেশাদার দলকে হারাতে পারে, ভারতবর্ষে এমন ফুটবল খেলোয়াড়ের দল বোধ করি আজ পর্যন্ত গঠিত হয়নি।

গোবরবাবুর পক্ষে সবচেয়ে শ্লাঘনীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, তাঁর সম্বল ছিল কূট-কৌশলের সঙ্গে অমিত দৈহিক শক্তি। উপরন্তু

সাত সাগরের পারে বিদেশ-বিভুঁয়ে সিংহের বিবরে গিয়ে তিনি পরাস্ত ক'রে এসেছেন পশুরাজকে। কৃষ্ণাঙ্গ-বিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গদের স্বদেশে গিয়ে সেখানকার শ্রেষ্ঠদের বাহুবলে হারিয়ে দিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করবেন বাংলার এক ছেলে, এটা ছিল কল্পনাতীত ব্যাপার।

আগেই বলেছি, পাঞ্জাবকেশরী গামা অতুলনীয় ও ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পালোয়ান হ'লেও, পাশ্চাত্য দেশ তাঁর শক্তি সম্বন্ধে সম্যকরূপে পরিচিত নয়। কারণ তিনি সেখানকার উল্লেখযোগ্য দুইজনের বেশী পালোয়ানের (ডাঃ রোলার ও বিস্কো) সঙ্গে কুস্তি লড়েননি। আর গোবরবাবু পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে সেখানকার সর্বশ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ পালোয়ানদের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধ'রে শক্তিপরীক্ষা করেছেন।

জো স্টেচার হেভি ওয়েটে পৃথিবীজয়ী হয়েছিল দুইবার (১৯১৬ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত; এবং ১৯২০)। বিস্কোও দুইবার ঐ উপাধি লাভ করেছিল। গোবরবাবুর সঙ্গে তাদের লড়াই হয় একাধিকবার। কখনো জিতেছেন গোবরবাবু, কখনো জিতেছে তারা। জিম লণ্ডস্ ও সনেনবার্গও পরে হয়েছিল পৃথিবীজয়ী। প্রথম ব্যক্তি গোবরবাবুর সঙ্গে সমান সমান হয়েছিল এবং শেষোক্ত ব্যক্তি হেরে গিয়েছিল তাঁর কাছে। এ ছাড়া আরো যে কত নামজাদা শ্বেতাঙ্গ পালোয়ান গোবরবাবুর পাল্লায় প'ড়ে ভূমিচুম্বন করেছিল, এখানে তার ফর্দ দাখিল করবার জায়গা নেই। মোট কথা, এত বেশী শ্বেতাঙ্গ পালোয়ানের গর্ব খর্ব করতে পারেননি আর কোন ভারতীয় মল্ল।

অ্যাড স্যান্টেলকে হারাবার পর আমেরিকায় স্ট্র্যাঙ্গলার লুইস ছাড়া গোবরবাবুর যোগ্য আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না। সুতরাং গোবরবাবু তাকেই যুদ্ধে আহ্বান করলেন। কিন্তু তাঁর সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি; অক্ষমতার জন্যে নয়, বিচারকের সমূহ অবিচারে। কালোর অদ্বিতীয়তা যখনই প্রমাণিত হবার উপক্রম হয়, ধলোরা এমনি সব উপায়েই মান বাঁচাবার চেষ্টা করে।

তার আর একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে, জ্যাক জনসন বনাম জেস উইলার্ডের মুষ্টিযুদ্ধ। কালা আদমী পৃথিবীজেতার আসনে

অটলভাবে উপবিষ্ট, এর জন্যে শ্বেতাঙ্গদের মনস্তাপের অবধি ছিল না। তাই আগেই বলেছি, গুপ্তহত্যার ভয় দেখিয়ে জনসনকে হার মানতে বাধ্য করা হয়েছিল, নইলে উইলার্ডের মত যোদ্ধা তাঁর পাশে দাঁড়াবারও যোগ্য ছিল না। উইলার্ড যখনই দ্বিতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর যোদ্ধার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, তখনই পরাজিত হয়েছেন। গানবোট স্মিথ কখনো পৃথিবীজেতা হ'তে পারেননি। জনসনের সামনে গেলে তাঁর অবস্থা হ'ত হয়তো তোপের মুখে উড়ে যাবার মত। তাঁর আর উইলার্ডের দেহের ওজন ছিল যথাক্রমে ১৮৫ ও ২৫০ পাউণ্ড এবং দেহের দীর্ঘতা ছিল যথাক্রমে ৫ ফুট এগারো ইঞ্চি এবং ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি। তবু উইলার্ড জিততে পারেননি। টম ম্যাক্‌মোহন নামে এক সাধারণ যোদ্ধার কাছেও তিনি হেরে গিয়ে-ছিলেন। এমন একটা বাজে লোকের কাছেও শ্বেতাঙ্গদের মান রক্ষার জন্যে জনসন হার মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। উইলার্ড পরে জ্যাক ডেম্পসি ও লুইস ফির্পোর সামনেও দাঁড়াতে পারেননি, অথচ জনসন তারপর বহু যোদ্ধার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বারেই জয়ী হয়েছেন। এমনকি জনসনের বয়স যখন তেতাল্লিশ বৎসর, তখন তাঁর চেয়ে বয়সে সতেরো বছরের ছোট হোমার স্মিথও তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন।

গোবরবাবু ভারতবর্ষে প্রকাশ্যভাবে একবার মাত্র কুস্তি প্রতি-যোগিতায় দাঁড়িয়েছিলেন। সেবারেও বিচার-প্রহসন হয়নি বটে, কিন্তু হয়েছিল বিচার-বিভ্রাট। সে কথা পরে বলব।

আমেরিকায় কুস্তি প্রতিযোগিতা লোকপ্রিয় হয়েছে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ থেকে। কিন্তু সেখানকার পেশাদার কুস্তিগীররা টাকার লোভে প্রায়ই কৃত্রিম যুদ্ধের (বা Mock fight) ব্যবস্থা করত ব'লে কুস্তির প্রতি লোকে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছিল। বর্তমান শতাব্দীতে কুস্তির মান ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে বটে, কিন্তু ১৯২২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার স্ট্র্যাঙ্গলার লুইসের "পৃথিবীজেতা" উপাধি লাভের পর থেকেই মল্লযুদ্ধের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় সকলের দৃষ্টি।

ডাঃ বি এফ রোলারের পেশা হচ্ছে ডাক্তারী, কিন্তু মল্লযুদ্ধেও তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন। শুনেছি অল্পকালের জন্যে

তিনি "পৃথিবীজেতা" উপাধি লাভ করেছিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতরূপে কিছু বলতে পারি না। তবে তিনি প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধা ছিলেন ব'লেই গামার সঙ্গে তাঁর কুস্তি হয়েছিল, অবশ্য সে প্রতিযোগিতায় তিনি হেরে যান। স্ট্র্যাঙ্গলার লুইসও উঠতি বয়সে একবার তাঁর কাছে হেরেছিলেন।

ডাঃ রোলার বলেন, "ফ্রাঙ্ক গচ (তিনি 'পৃথিবীজেতা' উপাধি বজায় থাকতে থাকতেই পূর্ণ গৌরবে অবসর নিয়েছিলেন) একজন মহামল্ল ছিলেন বটে কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাঁর পূর্ণ গৌরবের যুগেও বর্তমান কালের দুই-তিনজন কুস্তিগীর তাঁকে হারিয়ে দিতে পারতেন। গচ্ যখন নাম কিনেছিলেন, তখনকার কুস্তিগীররা ছিলেন মধ্যম শ্রেণীর। স্ট্র্যাঙ্গলার লুইস গচের চেয়ে বলবান আর ওজনে ভারি এবং চাতুর্যে ও গতির ক্ষিপ্রতায় তিনি গচের চেয়ে কম যান না। হাতের প্যাঁচের (head-lock) দ্বারা তিনি গচ্‌কে পরাজিত করতে পারতেন।"

লুইসের মাথার উচ্চতা ছিল ছয় ফুট। উঠতি বয়সে যখন তিনি ডাঃ রোলার প্রভৃতির দ্বারা পরাজিত হয়েছিলেন, তখন তাঁর দেহের ওজন ছিল মাত্র ১৭৫ পাউন্ড। কিন্তু যখন গোবরবাবুর সম্মুখবর্তী হন, তখন ছিলেন দস্তুরমত গুরুভার। গোবরবাবুরও দেহ বিরাট—যেমন দৈর্ঘ্যে (বোধ করি তিনি ছয় ফুটের চেয়ে মাথায় উঁচু), তেমনি প্রস্থে।

লুইসের সবচেয়ে বড় প্যাঁচ ছিল "হেড-লক"। অন্যান্য পালোয়ানরা নিজেদের মাথা এগিয়ে দিয়ে তাঁকে তা অভ্যাস করবার সুযোগ দিতে সম্মত হ'ত না, কারণ সে প্যাঁচ কষলে মানুষের দম বন্ধ হয়ে আসত। লুইস তাই কতকগুলো কাঠের নরমুণ্ড তৈরি করিয়ে নিয়েছিল—সেগুলোর ভিতর হ'ত ফাঁপা। দুভাগ করা ফাঁপা মাথার মাথার ভিতরে থাকত খুব জোরালো স্প্রিং—যেমন থাকে স্যাণ্ডোর গ্রিপ ডাম্বেলের ভিতরে। বাহুর চাপ দিয়ে স্প্রিংয়ের বিরুদ্ধে কাঠের মাথার দুই অংশ এক করতে গেলে দরকার হ'ত একজন মহাবলবান ব্যক্তির চূড়ান্ত শারীরিক শক্তি। এই প্যাঁচ

অভ্যাস করতে করতে লুইসের বাহুর কতকগুলো পেশী অসাধারণ স্ফূর্তিলাভ করেছিল।

কিন্তু ভারতীয় পালোয়ানদেরও মানসিক তূণে সঞ্চিত আছে অসংখ্য মারাত্মক প্যাঁচ, বিলাতী কুস্তিগীররা তার খবর রাখে না। এইজন্যেই গামা ও ইমামবক্স প্রমুখ পালোয়ানদের পাল্লায় প'ড়ে ডাঃ রোলার, বিস্কো ও জন লেম প্রভৃতি বিলাতী যোদ্ধারা কয়েক মিনিটের মধ্যেই হয়েছিলেন পপাত ধরণীতলে। সুতরাং লুইসের "হেড-লকে"র নামে শ্বেতাঙ্গ কুস্তিগীরদের হৃদ্‌কম্প হ'লেও গোবর-বাবুর ভয়ের কারণ ছিল না।

লুইসের সঙ্গে গোবরবাবুর কুস্তি শুরু হ'ল। লুইস ভেবে-ছিল তার "হেড-লকে"র বিষম ধাক্কা সহ্য করতে পারবেন না গোবর-বাবু। কিন্তু তাঁর ভ্রম ভাঙতে দেরি লাগল না। খানিকক্ষণ কুস্তির পর সে গোবরবাবুকে একবার চিত করতে পারল বটে, কিন্তু তাকেও হ'তে হ'ল চিতপাত। গতবারেই বলেছি, পাশ্চাত্য দেশে তিনবার (সময়ে সময়ে পাঁচবারও) কুস্তি লড়বার পর হার-জিত সাব্যস্ত হয়। দুইবারের পর লুইস ও গোবরবাবু হ'লেন সমান সমান। তৃতীয়-বারে যে চিত হবে, হার মানতে হবে তাকেই।

কিন্তু প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তৃতীয়বার অবতীর্ণ হয়েই লুইস নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল, গোবরবাবু বড় সাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বী নন, তাঁর কাছে তার হারবার সম্ভাবনা আছে যথেষ্ট। প্রতিযোগীদের কেউ যখন নিয়মবিরুদ্ধ অন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তখনই বোঝা যায়, নিজের সক্ষমতা সম্বন্ধে তার মনে জেগেছে সন্দেহ। তাই গোবর-বাবুকে কিছুতেই এঁটে উঠতে না পেরে বহুকাল আগে ইংরেজ কুস্তিগীর জিমি ইসেন যা করেছিল, লুইসও তাই করলে—অর্থাৎ কুস্তি ছেড়ে বক্সিংয়ের আশ্রয় নিলে। গোবরবাবুকে করলে সে মুষ্ট্যাঘাত! যেমন অন্যায়কারী যোদ্ধা, তেমনি অসাধু বিচারক। কৃষ্ণাঙ্গের বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধও ন্যায়সঙ্গত, এইটেই হচ্ছে পাশ্চাত্য বিধান। কারণ জিমি ইসেন ঘুষি মারলেও বিচারক "ফাউল" করেছে ব'লে তাকে বসিয়ে দেননি, লুইসও মুষ্টি ব্যবহার

ক'রে পরাজিত ব'লে স্বীকৃত হয় নি—মল্লযুদ্ধের আইন অনুসারে যা হওয়া উচিত।

বিচারক দেখেও কিছু দেখলেন না বটে, কিন্তু গোবরবাবু এতটা ব্যভিচার মুখ বুজে সহ্য করতে পারলেন না। তিনি যখন কুস্তি থামিয়ে বিচারকের দিকে ফিরে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলেন, লুইস তখন পিছনদিক থেকে এসে তাঁর পা ধ'রে প্রচণ্ড এক টান মারলে। অতর্কিতে এমন অভাবিত ভাবে আক্রান্ত হয়ে গোবরবাবু মাটির উপরে আছড়ে পড়লেন এবং মাথায় পাটাতনের চোট লেগে তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হ'য়ে গেলেন।

বিচারক লুইসকেই জয়ী ব'লে মেনে প্রমাণিত করলেন, পাশ্চাত্য দেশেও কাজীর বিচার হয়। এইজন্যেই আমি বলেছিলুম, যেখানে বর্ণবিদ্বেষ প্রবল, সেখানে সুবিচারের আশা থাকে না বললেই চলে।

লুইসের সঙ্গে গোবরবাবুকে আর কুস্তি লড়বার সুযোগ দেওয়া হয় নি। কাজেই তিনি লাইট-হেভি ওয়েটে পৃথিবীজেতা কুস্তিগীরের পদে বহাল থেকেই স্বদেশে প্রত্যাগমন করলেন। এই পদের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে আর তিনি সাগরপারে পাড়ি দেন নি বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশ থেকেও কেউ এসে তাঁকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান ক'রে ঐ পদবী কেড়ে নিতে পারে নি। তাঁর "পৃথিবীজেতা" ব'লে সম্মান অক্ষুণ্ণই আছে।

গোবরবাবু কলকাতায় আবার নিজের বৈঠকে এসে জাঁকিয়ে বসলেন। তাঁর ঘরে আবার আরম্ভ হ'ল আমাদের আনন্দ-সম্মিলন। পুরাতন দিনের গল্প, আমেরিকার গল্প, ললিতকলার গল্প, গান-বাজনাও বাদ পড়ল না।

তারপরই গোবরবাবু বড় গামাকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান ক'রে চারিদিকে জাগিয়ে তুললেন এক বিশেষ উত্তেজনা। পাঞ্জাবকেশরী নামে বিখ্যাত গামা, পৃথিবীর বড় বড় পালোয়ানরাও যাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ভরসা পায় না! একটু চমকিত হলুম বটে, কিন্তু গোবরবাবুর উপরে আমাদের বিশ্বাসের অভাব ছিল না। নিজের ও বড় গামার শক্তি-সামর্থ্য না বুঝে হঠকারীর মত নিশ্চয় তিনি প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হবেন না।

শিবনারায়ণ দাসের গলিতে বাড়ীটার পিছনকার অঙ্গনে কুস্তির এক সুবিস্তৃত আখড়া তৈরী করা হ'ল। নিয়মিতভাবে কুস্তি অভ্যাস করবার জন্যে গোবরবাবু পশ্চিম থেকে আনালেন গুট্টা সিং নামে এক বিখ্যাত পালোয়ানকে। দিনে দিনে তাঁর দেহ অধিকতর তৈরি হয়ে এমন সুগঠিত হয়ে উঠল, দেখে আমাদের চোখ জুড়িয়ে গেল। বাঙালীর তেমন পুরুষসিংহ মূর্তি আমি আর দেখি নি।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রকাণ্ড এক মণ্ডপ প্রস্তুত হ'তে লাগল। কাগজে যখন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে এবং মণ্ডপের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন সার্থক হ'ল সেই প্রবাদবাক্য—"মানুষ গড়ে, ভগবান ভাঙেন"! হঠাৎ দারুণ ডিপথিরিয়া রোগে গোবরবাবু একেবারে শয্যাগত হয়ে পড়লেন, তারপর দীর্ঘকাল ধরে তাঁর প্রাণ নিয়ে টানাটানি। বড় গামার সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা আর হ'ল না। আয়োজন-পর্বেই গোবরবাবুর বহু সহস্র টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল —সবই হ'ল ভস্মে ঘৃতাহুতির মত।

তারপর ১৯২৯ খৃস্টাব্দে গোবরবাবুর সঙ্গে ছোট গামার যখন কুস্তি হয়, তখন ছোট গামা যুবক ও তিনি বয়সে প্রৌঢ়। সে কুস্তি দেখবার সুযোগ আমার হয় নি। কিন্তু ভারতীয় ব্যায়াম ও মল্লযুদ্ধ সম্বন্ধে একজন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ শচীন্দ্র মজুমদার যা বলেছেন, এইখানে আমি সে-কথাগুলি উদ্ধৃত ক'রে দিলুম :

"আমার মনে হয় গোবরবাবুর প্রতি চরম অবিচার করা হয়েছিল। কুস্তির একটা বাঁধাধরা নিয়ম আছে যে লড়তে লড়তে আখড়ার সীমানায় গিয়ে পড়লে বিচারক কুস্তি ক্ষণিকের জন্যে বন্ধ ক'রে প্রতিদ্বন্দ্বীদের আখড়ার মাঝখানে এসে লড়তে হুকুম দেবেন। নূতন ক'রে লড়বার সময়ে পূর্বে যে যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থা থেকে কুস্তি আরম্ভ হবে। গোবরবাবু ও ছোট গামা যখন সীমানার দড়ির উপর গিয়ে পড়লেন, বিচারক তাঁদের আখড়ার মাঝে আসতে হুকুম দিলেন। গোবরবাবু প্রতিপক্ষকে ছাড়লেন বটে কিন্তু প্রতিপক্ষ হুকুম অগ্রাহ্য ক'রে গোবরকে চিত করে দিলেন। দর্শকগণ গামার জয়-জয়কার ক'রে উঠল এবং বিচারকও

ভড়কে গিয়ে তাদের সমর্থন করেন। এ-ধরণের বিচার একাধিকবার কলকাতায় দেখা গেছে।......বিচারকের দোষে একজনের চেষ্টা বিফল হ'লে আপসোস করবার যথেষ্ট কারণ থেকে যায়।"

ছোট গামা কলকাতায় এসে দুইবার কুস্তি লড়েছিলেন বাঙালী মল্লের সঙ্গে এবং দুইবারই জয়ী ব'লে সাব্যস্ত হয়েছিলেন বিচার-বিভ্রাটের ফলে। টীকা অনাবশ্যক।

গোবরবাবুর অসাধারণ শারীরিক শক্তি সম্পর্কীয় কয়েকটি চিত্তাকর্ষক গল্প আমি জানি। কিন্তু পুঁথি বেড়ে যাচ্ছে, অতএব এইখানেই রুদ্ধ হ'ল আমার লেখনীর গতি।

ষোলো

প্রয়োজক প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী

যাঁরা সশরীরে দেখা দেন রঙ্গমঞ্চে ও ছবির পর্দার গায়ে, তাঁদের অনেকের কথা নিয়েই আলোচনা করেছি। কিন্তু যাঁরা যবনিকার অন্তরালে আত্মগোপন ক'রে জনসাধারণের মধ্যে আনন্দ বিতরণ করেন, এবারে এমন একজন কৃতী শিল্পরসিকের সঙ্গে আপনাদের পরিচয়সাধন ক'রে দিতে চাই।

বাংলাদেশে গোড়ার দিকে যাঁরা চলচ্চিত্রের যাত্রাপথ সুগম ক'রে দিয়েছিলেন. প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী হচ্ছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। বাংলা সিনেমার সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে থাকবে চিরদিনই। প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে যখন বাংলা ছবির জন্ম হয়নি, চিত্রব্যবসায়ী ম্যাডান যখন ছোট ছোট বিলাতী ছবি নিয়েই কারবার চালান, প্রিয়বাবু তখন ছিলেন ঐ সম্প্রদায়ের বৈতনিক কর্মচারী। তারপর ম্যাডানরা যখন বাংলা ছবি তোলার ব্যবসা ফেঁদে বসলেন, তখন তিনি হয়ে দাঁড়ালেন তাঁদের ডানহাতের মত। সেই নির্বাক যুগে চিত্রপরিচালক রূপেও তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

আজকাল তো দেখছি ভুঁইফোঁড় পরিচালকের যুগ চলছে। বর্ষার আগাছার মত পরিচালক দেখা দেন দিকে দিকে। দু'দিন আগেও যাঁরা ছিলেন নামগোত্রহীন অচেনা কোথাকার কে, হঠাৎ তাঁরা উড়ে এসে জুড়ে বসেন চিত্রজগতের সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ কর্মীর আসন দখল ক'রে। কিন্তু বর্ষা ফুরোয়, আগাছা শুকোয় এবং তারপর হয়ে যায় নিশ্চিহ্ন। এই সব কাল-কা-যোগীর পাল্লায় প'ড়ে হাল-বাংলার চলচ্ছবির অবস্থা ক্রমশই সঙীন হয়ে উঠছে।

অনেকে পুঁথিগত বিদ্যার জোরে পরিচালকের আসন অধিকার করতে চান। বিলাতী সিনেমার টেকনিক ও কার্যপ্রণালী নিয়ে কেতাব লেখা হয়েছে রাশি রাশি, রাম-শ্যামও সস্তার বাজার থেকে

তা খরিদ করতে পারে। সেই সব মুখস্থ ক'রে তোতাপাখীর মত বড় বড় বুলি আওড়াতে শিখেই অনেক আরসোলা-জাতীয় ব্যক্তি নিজেদের পক্ষী-জাতীয় জীব ব'লে মনে করেন।

কিন্তু সেই সব বিজাতীয় শিল্পনির্দেশ অনুসারে চ'লে যাঁরা বাংলা ছবির কাজ চালাতে চান, বাধা পেতে হয় তাঁদের পদে পদেই। বাংলা স্টুডিয়োর আবহ হচ্ছে একেবারে অন্যরকম। যেমন ইংরেজী ব্যাকরণ শিখে সংস্কৃত রচনাবলীতে দখল জন্মায় না, তেমনি বিলাতী সিনেমার পুঁথিগত টেকনিক আয়ত্ত ক'রে কেউ বাংলা ছবির কাজও চালাতে পারবেন না। এখানকার স্টুডিয়োর অবস্থা ও কার্যপদ্ধতি, কর্মী ও শিল্পীদের ধাত বা মনের গড়ন, ছবির বিষয়-বস্তু এবং দর্শকদের রুচি ও প্রকৃতি একেবারেই স্বতন্ত্র। বিদেশী পুঁথি থেকে লব্ধ 'থিয়োরেটিক্যাল' বা সূত্রাত্মক জ্ঞান এখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাজে লাগে না।

সূত্রাত্মক জ্ঞান নয়, পদে পদে অগ্রসর হয়ে বা বাধা পেয়ে এবং হাতে-নাতে কাজ করবার দুর্লভ সুযোগ গ্রহণ ক'রে প্রিয়বাবু অর্জন করেছিলেন 'প্র্যাকটিক্যাল' বা ব্যবহারিক জ্ঞান। শিশু বাংলা ছবির লালনভার পেয়ে তাঁর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষার পর পরীক্ষা ক'রে তিনি যে মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, এখন এদেশে আর কারুর তা আছে ব'লে মনে হয় না। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র বা নৃত্য প্রভৃতি হচ্ছে ব্যক্তিগত আর্ট। ও-সব ক্ষেত্রে শিল্পীরা কোন 'থিয়োরি' বা সূত্র নিয়ে নিজে নিজেই একান্তে ব'সে পরীক্ষা করতে পারেন। কিন্তু চলচ্চিত্র হচ্ছে এমন একটি আর্ট, যা নানা শ্রেণীর বহু শিল্পী ও কর্মীর সঙ্ঘবদ্ধ সহযোগিতা লাভ না করলে সম্পূর্ণ ও নিখুঁত হয়ে উঠতে পারে না; পরিচালককে করতে হয় বহুজনের মুখাপেক্ষা। এইজন্যেই সূত্রাত্মক জ্ঞানের চেয়ে ব্যবহারিক জ্ঞানই তাঁর পক্ষে বেশী কাজ করে।

ম্যাডান কোম্পানী এক সময়ে জুড়ি চালাতে চেয়েছিলেন— চিত্রাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চাভিনয়। ছবির মুলুকে তাঁদের ব্যবসায় একচেটে হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সাধারণ নাট্যজগতে তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করেনি। তবু শেষোক্ত ক্ষেত্রে

ম্যাডানদের কর্মতৎপরতা বাংলা নাট্যকলার ধারাকে বাহিত করেছিল প্রশস্ততর নূতন এক খাতে। বর্তমান কালের নাট্যাচার্য শিশির-কুমার সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করেন তাঁদেরই আমন্ত্রণে এবং তাঁরাই এনেছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ীকেও। সেই সময়ে ম্যাডান-দের রঙ্গালয়ের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন প্রিয়বাবুই। সেই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

প্রথম যেদিন তাঁকে দেখি, তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করবার সুযোগ হয়নি। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের কথা। শিশিরকুমার সাধারণ রঙ্গালয়ে আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই জনসাধারণের কাছ থেকে অতুলনীয় অভিনন্দন লাভ করলেন দেখে মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় বন্ধুবর উপেন্দ্রকুমার মিত্রও যুগোপযোগী কোন নূতন ও শক্তিশালী অভিনেতাকে নিজের সম্প্রদায়ভুক্ত করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সেই সময়ে সৌখীন নাট্যজগতে শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্রের খুব ডাকনাম। আমি তখনও তাঁর অভিনয় দেখিনি বটে, কিন্তু কারুর কারুর মুখে শুনতুম, শিল্পী হিসাবে তিনি নাকি শিশিরকুমারেরও চেয়ে শ্রেষ্ঠ। উপেনবাবুর কানেও বোধ করি এমনি কোন কথা উঠেছিল। একদিন তিনি আমার বাড়ীতে এসে অনুরোধ করলেন, নরেশচন্দ্রকে মিনার্ভা থিয়েটারে নিয়ে আসবার জন্যে।

আমি তখন নরেশচন্দ্রকে চিনতুম না, তাই স্বর্গীয় নাট্যশিল্পী রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় নরেশচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হলুম এবং তাঁর কাছে উপস্থিত করলুম উপেনবাবুর প্রস্তাব। নরেশচন্দ্র তখনি রাজী হয়ে গেলেন।

কিন্তু ম্যাডানরা যে শিশিরকুমারের সঙ্গে নরেশচন্দ্রকেও নিজেদের দলে টানবার জন্যে চেষ্টা করছেন, তখন পর্যন্ত এ কথা আমি জানতুম না। যেদিন উপেনবাবুর সঙ্গে নরেশচন্দ্রের বন্দোবস্ত পাকা হয়ে যাবার কথা, ঠিক সেইদিনই হস্তদন্তের মত প্রিয়বাবু মিনার্ভা থিয়েটারে এসে উপস্থিত। তিনি অনেক বোঝালেন, কিন্তু নরেশচন্দ্র কিছুতেই বোঝ মানলেন না। তিনি মিনার্ভা থিয়েটারেই যোগদান করলেন।

কিছুদিন পরে শিশিরকুমার আবার ডুব মারলেন। ম্যাডানদের রঙ্গালয়ে তাঁর বদলে দেখা দিতে লাগলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী। ওখানে খোলা হ'ল স্বর্গীয় বন্ধুবর মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের "মুক্তার মুক্তি" নাটিকা। সেই সূত্রে প্রায় প্রত্যহই আমি ওখানে যাতায়াত করতুম। প্রিয়বাবু তখনও সেখানকার তত্ত্বাবধায়ক—এক সঙ্গে তিনি সিনেমার ও থিয়েটারের কার্য পরিচালনা করেন। সেই সময়েই তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

নাট্যকার হবার লোভে বা কোন থিয়েটারের জন্যে নয়, স্বর্গত কবিবন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুরোধে ভিক্টর হুগোকে অবলম্বন ক'রে আমি একখানি নাটক রচনা করি। রচনাটি আমার বন্ধুদের ভালো লেগেছিল। প্রিয়বাবু সেই নাটকখানি ম্যাডানদের রঙ্গালয়ে মঞ্চস্থ করবার জন্যে তোড়জোড় করতে লাগলেন। নটনটীদের সামনে বসে নাটকখানি আমি পাঠ ক'রে শোনালুম। ভূমিকালিপি পর্যন্ত বিলি হয়ে গেল—কিন্তু ঐ পর্যন্ত।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ তখন ওখানকার বৈতনিক বাঁধা নাট্যকার। তিনি থাকতে ওখানে আর কারুর নাটক অভিনীত হয়, এটা তাঁর মনঃপূত হ'ল না, তিনি বালকের মত কাতর হয়ে পড়লেন। আমিও প্রাচীন নাট্যকারের মনে ব্যথা দিতে চাইলুম না, মনোনীত নাটক তুলে নিয়ে আমি চ'লে এলুম।

তার কিছুদিন পরে ম্যাডানদের রঙ্গালয় উঠে গেল। প্রিয়বাবু আবার চলচ্চিত্র নিয়ে নিযুক্ত হয়ে রইলেন। কয়েক বৎসর তাঁর সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। কিন্তু তাঁর কার্যকলাপের সব খবর পেতুম। কয়েকখানি নির্বাক চিত্র তুলে তিনি যখন ম্যাডানদের সম্প্রদায় ছেড়ে দিয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম সম্প্রদায়ে যোগদান করেন, ছবি তখন কথক হয়ে উঠেছে। প্রিয়বাবুর পরিচালনায় ওঠে "যমুনাপুলিনে" চিত্র। তারপর তিনি গঠন করেন নিজস্ব চিত্র-সম্প্রদায়—"ইণ্ডিয়া ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিজ"। পরে তার নাম হয় "কালী ফিল্ম"।

তারপর ওখানে যখন তিনকড়ি চক্রবর্তীর পরিচালনায় "ঋণমুক্তি" ছবি উঠছে, প্রিয়বাবু সেই সময়ে আবার আমাকে স্মরণ

করলেন। বললেন, "ঋণমুক্তির জন্যে আপনাকে গান রচনা আর নৃত্য পরিকল্পনা করতে হবে।" তাঁর কথা রাখলুম। কালী ফিল্মের অবস্থা তখন বিশেষ উন্নত নয়। নতুন সম্প্রদায়, আধুনিক কালের উপযোগী স্টুডিয়ো তখনও নির্মিত হয়নি, কৃত্রিম আলোক ব্যবহার করবার উপায় নেই, নানা দিকে নানা অসুবিধার মধ্যে ছবি তুলতে হয়। তবু "ঋণমুক্তি" ছবি হিসাবে মন্দ হয়নি।

তার কিছুদিন পরে প্রিয়বাবু হঠাৎ একদিন আমার বাড়ীতে এসে উপস্থিত। বললেন, "হেমেন্দ্রবাবু, আপনার 'মণিকাঞ্চন' উপন্যাস অবলম্বন ক'রে আমি একখানি ছবি তুলতে চাই। চিত্র-নাট্যও আমি লিখে ফেলেছি।" দুজনেই দুজনের পুরাতন বন্ধু। দেনাপাওনা বা 'কণ্ট্রাক্টে'র কোন কথাই উঠল না, ছবি তোলা শুরু হয়ে গেল। ব'লে রাখি, কাগজে-কলমে লেখাপড়া না ক'রেও আমি ঠকিনি এবং তিনিও ঠকেননি, কারণ ঐ ছবি যখন "তরুণী" নামে বাজারে বেরোয়, তখন তার চাহিদা হয়েছিল বিস্ময়কর। শুনতে পাই, কালী ফিল্মের আর কোন ছবিই "তরুণী"র মত টাকা আনতে পারেনি।

প্রিয়বাবু আগে ছিলেন পরিচালক, পরে হন প্রয়োজক। কিন্তু তাঁর মস্ত গুণ এই যে, কারুর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না ক'রেও প্রত্যেক বিভাগের কর্মিগণকে তিনি যথানির্দিষ্ট পথে চালনা করতে পারেন। আমার মতে শ্রেষ্ঠ প্রয়োগকর্তার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে, তাঁর আদেশকে শোনায় অনুরোধের মত, তাই তিনি 'হাঁ' বললে কেউ 'না' বলতে পারে না। এই হিসাবে প্রিয়বাবু হচ্ছেন একজন শ্রেষ্ঠ প্রয়োজক তথা পরিচালক।

প্রিয়বাবু প্রিয়ংবদ, দেহ দীর্ঘ, সুগঠিত ও পুরুষোচিত—দশজনের ভিতর থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর নম্রতায় ও সৌজন্যে প্রীত হয় সকলেই। কালী ফিল্ম স্টুডিয়োয় শিল্প সংক্রান্ত কর্তব্য নিয়ে আমাকে বহুদিন নিযুক্ত থাকতে হয়েছে—কোন কোন দিন ষোলো-সতেরো ঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে গিয়েছে আন্দাজও করতে পারিনি। প্রিয়বাবুর কাছ থেকে বরাবরই লাভ করেছি বন্ধুজনসুলভ মিষ্ট ব্যবহার এবং আদরযত্ন। কালী ফিল্মে

আমরা ছিলুম একটি সুখী পরিবারের মত। কাজের খাতিরে আমাকে আরো কয়েকটি স্টুডিয়োর সংস্রবে আসতে হয়েছে, কিন্তু আর কোথাও গিয়ে বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিনি। কোন কোন কাঁচ ও কাঁচা প্রযোজক ও পরিচালককেও দস্তুরমত এক-একটি চীজ্ ব'লে মনে হয়েছে। চিত্রজগতে প্রিয়বাবুর পিছনে রয়েছে কত বৎসরের অভিজ্ঞতা, কিন্তু কোনদিনই তাঁর মধ্যে আমি হাম-বড়া ভাব লক্ষ্য করিনি। নতুন কোন suggestion বা ইঙ্গিত দিলে তৎক্ষণাৎ তিনি তা গ্রহণ করেছেন। এমনি সব নানা কারণে আমাদের চিত্র-জগতে প্রিয়বাবুকে আমি একজন অসাধারণ লোক ব'লেই মনে করি।

সতেরো

নরেশচন্দ্র মিত্র

১৯২১ খৃষ্টাব্দের কথা। বাংলা অভিনয়-ধারার মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বাঙালীরা যা করতে পারলে না, পার্সী ম্যাডানদের দ্বারা সাধিত হ'ল সেই কর্তব্য। প্রফেসর এবং য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের প্রথিতযশাঃ শৌখীন অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ী সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগ দিয়ে ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসে আত্মপ্রকাশ করলেন আলমগীরের ভূমিকায়।

য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের নাট্য-সম্প্রদায়ের কথা নিয়ে সাধারণ দর্শকরা বড় একটা মাথা ঘামাতো না। সেখানকার শিল্পীরা বিশেষভাবে ছাত্র-সমাজের কাছেই সুপরিচিত ছিলেন। হঠাৎ সেখান থেকে শিশিরকুমারের মত একজন যুগান্তকারী শিল্পীর অভাবিত আবির্ভাব দেখে বিস্মিত জনসাধারণের তথা থিয়েটারের মালিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল ঐ ইনষ্টিটিউটের দিকে।

শৌখীন রঙ্গালয়ের প্রতি ছিল না আমার বিশেষ শ্রদ্ধা। প্রায়ই দেখেছি, নিতান্ত অচলরাও সেখানে অত্যন্ত সচল ব'লে বিখ্যাত হন। তাই আবাল্য নাট্যকলার অনুরাগী হয়েও ইনষ্টিটিউটের কোন নাট্যানুষ্ঠানেই উপস্থিত থাকবার জন্যে আমার মনে জাগেনি আগ্রহ। শিশিরকুমারের আবির্ভাবের পর আমিও ইনষ্টিটিউট সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠলুম। সেখানে ভালো অভিনেতা আছেন আরো কে কে, বিশেষজ্ঞদের কাছে সেই খোঁজ নিতে লাগলুম। কেবল আমি নই, থিয়েটারের মালিকরাও নিচ্ছিলেন খোঁজ-খবর। লোকপরম্পরায় শোনা গেল সেখানকার আর একজন প্রতিভাবান অভিনেতার নাম তিনি শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র।

১৯২২ খৃষ্টাব্দ। একদিন মিনার্ভা থিয়েটারের মালিক স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মিত্র ও সেখানকার অধ্যক্ষ স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় আমার

বাড়ীতে এসে যে প্রস্তাব করলেন তার সারমর্ম হচ্ছে এই: ম্যাডানরা শিশিরবাবুকে নামিয়ে অন্য সব থিয়েটারের চাহিদা কমিয়ে দিয়েছে। দর্শকরা দেখতে চায় শিক্ষিত ও নূতন অভিনেতাদের মুখ। য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের নরেশবাবুর খুব নামডাক শোনা যায়। শিশিরবাবুর "চাণক্যে"র সঙ্গে কাত্যায়নের ভূমিকায় তিনি নাকি অতুলনীয় অভিনয় করেন। তাঁকে যাতে সাধারণ রঙ্গালয়ে—অর্থাৎ মিনার্ভা থিয়েটারে নামাতে পারা যায়, সেজন্যে আমাকে সাহায্য করতে হবে।

সাহায্য তো করব. কিন্তু নরেশচন্দ্রের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, তখনও পর্যন্ত তাঁকে আমি চোখেও দেখিনি। কাকে অবলম্বন ক'রে তাঁর সঙ্গে করব সংযোগ স্থাপন?

সিমলা পাহাড়ের পদস্থ সরকারী কর্মচারী ও শৌখীন অভিনেতা স্বর্গীয় রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় দীর্ঘকালের ছুটি নিয়ে তখন কলকাতায় এসেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে আমার অল্পস্বল্প পরিচয় হয়েছিল। তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করলুম, "নরেশচন্দ্র মিত্রকে চেনেন?"

তিনি বললেন, "চিনি বৈকি।"

আমি বললুম, "মিনার্ভার কর্তারা নরেশবাবুকে নিজেদের দলে টানতে চান, আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেবেন?"

রাধিকানন্দ কেবল সম্মত হলেন না, সেই সঙ্গে বললেন, "আমিও মিনার্ভা থিয়েটারে নামতে চাই।"

নরেশচন্দ্র ও রাধিকানন্দের সঙ্গে ইনষ্টিটিউটের আর একজন ভালো অভিনেতাও মিনার্ভা থিয়েটারে যোগ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি পিছিয়ে যান। তাঁর নাম শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

ইতিমধ্যে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে দেখা। তিনি আমাদের এক বৈঠকে প্রায়ই আসতেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, "নরেশবাবু কেমন অভিনয় করেন?"

শিশিরকুমার বললেন, "নরেশ একজন গ্রেট আর্টিষ্ট।"

—"রাধিকানন্দ?"

—"ভালো অভিনেতা।"

সেই বৈঠকেই একদিন নরেশচন্দ্রকে নিয়ে এলেন রাধিকানন্দ। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হ'ল।

যথাসময়ে মিনার্ভা থিয়েটারের সঙ্গে নরেশচন্দ্র ও রাধিকানন্দের বন্দোবস্ত পাকা হয়ে গেল। ওখানকার কর্তৃপক্ষ সগর্বে ঘোষণা করলেন, "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকের পুনরভিনয়ে "য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের কোহিনুর" শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র চাণক্যের ভূমিকা গ্রহণ করবেন। এটা হচ্ছে শিশিরকুমারের আত্মপ্রকাশের কয়েক মাস পরের ঘটনা।

ইনষ্টিটিউটে শিশিরকুমার চাণক্যের ভূমিকায় যথেষ্ট যশ অর্জন করেছিলেন। কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ে তখন পর্যন্ত চাণক্য সেজে তিনি বোধ করি দেখা দেন নি, অন্ততঃ আমার স্মরণ হচ্ছে না। সাধারণ রঙ্গালয়ে ঐ ভূমিকায় তখন একা দানীবাবুরই জয়জয়কার, অন্য কেউ চাণক্য সাজতে ভরসা করতেন না।

শিশিরকুমার নবাগত, সাধারণ নাট্যজগতে উদীয়মান। সেখানে দানীবাবুর তখন একাধিপত্য। সেই সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন রঙ্গালয় যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ দানীবাবুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভূমিকার জন্যে নির্বাচিত করবেন সাধারণ নাট্যজগতে নামগোত্রহীন একজন তরুণ শিল্পীকে, এতটা কেউ কল্পনা করতেও পারেন নি। জনসাধারণ রীতিমত কৌতূহলী হয়ে উঠল। আমিও নরেশচন্দ্রের সাহস দেখে অল্পবিস্তর বিস্মিত হয়েছিলুম। কারণ সেই প্রথম আবির্ভাবকালেই হবে তাঁর শক্তির অগ্নিপরীক্ষা। নূতন ভূমিকা নয়। বহু-অভিনীত ও বহু-প্রশংসিত চাণক্যের ভূমিকায় তাঁকে দেখলে লোকে দানীবাবুর সঙ্গে করবে তাঁর তুলনা। প্রথম অভিনয়েই তিনি যদি উতরে যেতে না পারেন, তবে ভবিষ্যতে তাঁর পথ হবে না কুসুমাস্তৃত। মনে হয়েছিল, এ রকম ঝুঁকি নিয়ে নরেশচন্দ্র বুদ্ধিমানের কাজ করলেন না। তিনি কিন্তু অবিচলিত। অসঙ্কোচে মহলা দিতে লাগলেন। আত্মশক্তির উপরে ছিল তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস।

অভিনয়ের রাত্রি হ'ল সমাগত। বহু পুরাতন নাটক "চন্দ্রগুপ্ত",

চাণক্যের ভূমিকায় নেই দানীবাবু, অ্যাণ্টিগোনাসের ভূমিকায় নেই প্রথিতনামা ক্ষেত্রনাথ মিত্র, তবু নবাগত নরেশচন্দ্র ও রাধিকানন্দকে দেখবার জন্যে প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ হয়ে গেল বৃহতী জনতায়। বুঝলুম, আলমগীরের ভূমিকায় নবীন নট শিশিরকুমারের আশ্চর্য সাফল্য দেখে শিক্ষিত ও নূতন নটদের উপরে বেড়ে উঠেছে জনসাধারণের শ্রদ্ধা।

এবং নরেশচন্দ্রও কারুকে হতাশ করলেন না। চাণক্যের ভূমিকায় তিনি দিলেন একটি সম্পূর্ণ নূতন ধারণা। তাঁর ভাষণ, অঙ্গহার এবং অভিনয়ভঙ্গী হ'ল এমন অভিনব যে, দানীবাবুর সঙ্গে কেউ তাঁর তুলনা করবার অবসরই পেলে না। সকলেই বুঝলে, তাঁর নিজস্ব আছে যথেষ্ট। আমিও বুঝলুম, শিশিরকুমারের কথাই সত্য। নরেশচন্দ্র হচ্ছেন "গ্রেট আর্টিষ্ট।"

চাণক্যের পর "প্যালারামের স্বাদেশিকতা" হাস্যনাট্যে মিঃ জেকবের ভূমিকা। ছোট একটি সাহেবের ভূমিকা, কিন্তু অসাধারণ নাট্য-নিপুণতায় ছোটও যে কতটা বড় হয়ে উঠতে পারে, তার অকাট্য প্রমাণ দিলেন নরেশচন্দ্র। তারপর "নসীরাম" নাটকেও করলেন চমৎকার অভিনয়।

শেষোক্ত নাট্যাভিনয়ে ঘটল একটি বিপদজনক ঘটনা! রঙ্গমঞ্চের চোরা দ্বার (trap-door) ভেদ ক'রে একখানি রথ আত্মপ্রকাশ ক'রে ধরাধাম থেকে শূন্যে গোলকধামে অদৃশ্য হয়ে যেত এবং নরেশচন্দ্র একদিন সত্য সত্যই স্বর্গধামে যেতে যেতে কোনরকমে করলেন নশ্বর দেহের মধ্যে আত্মার অস্তিত্ব রক্ষা। রথের ভিতরে ছিলেন তিনি এবং আর একজন অভিনেত্রী। অদৃশ্য তার অবলম্বন ক'রে রথ শূন্যে উঠে যখন প্রায় লোকের চোখের আড়ালে চ'লে গিয়েছে—অর্থাৎ রঙ্গালয়ের ছাদের কাছাকাছি হয়েছে, তখন হঠাৎ কল গেল বিগড়ে, রথখানা ঝুপ ক'রে শূন্য থেকে নেমে এসে তীরবেগে চোরা দ্বারের ভিতর দিয়ে চ'লে গেল আবার চোখের আড়ালে—অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চের তলায়! সর্বনাশ ভেবে আঁতকে উঠলুম আমরা। সেটা নাটকের শেষ দৃশ্য। যবনিকা ফেলে দেওয়া হ'ল। সকলেই মঞ্চের উপরে ছুটে গেলেন। প্রত্যেকেরই ধারণা হ'ল হয় জীবন্ত অবস্থায়

কারুকে পাওয়া যাবে না, নয়তো পাওয়া যাবে সাংঘাতিকভাবে আহত অবস্থায়।

হঠাৎ দেখা গেল, অভিনেত্রীটি চোরা দ্বার দিয়ে মঞ্চের উপরে উঠে এল—তার চোখে-মুখে দারুণ আতঙ্ক। তারপর মঞ্চের উপর থেকে সবেগে দৌড় মেরে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। শুনেছি সেই বিষম দৌড় শেষ হয়েছিল একেবারে তার বাসায় গিয়ে।

নরেশচন্দ্রও আবিষ্কৃত হলেন জীবন্ত—কিন্তু আহত অবস্থায়। চোরা দ্বার দিয়ে রথ যখন পাতালে নামে তখন রঙ্গমঞ্চের প্রান্তের সঙ্গে হয় তাঁর হাতের কনুইয়ের সঙ্ঘর্ষ। কনুইয়ের হাড় একেবারে চুরমার হয়ে যায় নি বটে, কিন্তু সেই কনুই নিয়ে তাঁকে ভুগতে হয়েছিল বেশ কিছুকাল।

শুনলুম, রথ যখন নেমে এসেছিল মাটি থেকে ইঞ্চি কয়েক উপরে, তখন রথারোহীদের সৌভাগ্যক্রমে বিগড়ে-যাওয়া কল নাকি আবার আপনা-আপনিই ঠিক হয়ে যায়। তা নইলে নরেশচন্দ্র সূক্ষ্ম দেহ নিয়ে গোলকধামে যেতেন কিনা জানি না, তবে সশরীরে আজ যে ধরাধামে বিদ্যমান থাকতেন না, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁকে রক্ষা করেছেন ভগবান।

যতদূর মনে পড়ে, এই দুর্ঘটনার পর "নসীরামে"র অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। এবং নরেশচন্দ্রও ব্যক্তিগত কারণে মিনার্ভা থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দিয়ে তাজমহল ফিল্ম কোম্পানীতে যোগদান করেন। তারপর চিত্রজগতে হয় তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। ছবি তখনও কথা কইতে শেখেনি।

তারপর জনসাধারণের সঙ্গে নরেশচন্দ্রের আবার দেখা হয় ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে। ষ্টার রঙ্গমঞ্চে আর্ট থিয়েটার লিমিটেড খোলেন "কর্ণার্জুন" এবং নরেশচন্দ্র গ্রহণ করেন শকুনির ভূমিকা। এই পালাটি কেবল লোকপ্রিয়তার জন্যে নয়, অন্য এক কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। "কর্ণার্জুন" নাট্যাভিনয়েই সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ে সর্বপ্রথমে দেখা দেন তিনকড়ি চক্রবর্তী, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অভিনেতৃগণ। "শকুনি" হচ্ছে নরেশচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভূমিকা এবং আমার মতে

সমগ্র "কর্ণার্জুন" পালায় "শকুনি"র উপরে টেক্কা মারতে পারেন নি আর কেউ।

তারপর নরেশচন্দ্র নানা রঙ্গালয়ে অভিনয় করেছেন অসংখ্য ভূমিকায়, এখানে তার ফর্দ দাখিল করবার জায়গা নেই। তাঁর মত চৌকস নটের সংখ্যা বেশী নয়। গম্ভীর, হাস্যরসাত্মক ও "সিরিয়ো-কমিক" প্রভৃতি সকল শ্রেণীর ভূমিকাতেই তিনি অর্জন করেছেন অসামান্য কৃতিত্ব। তিনি যে গীতি-সংবলিত ভূমিকারও মর্যাদা রক্ষা করতে পারেন, "পুণ্ডরীক" নাট্যাভিনয়ে সে প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। নবযুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের মধ্যে এখন এক জহরলাল গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়া গান গাইবার শক্তি আর কারুর নেই। এ-শক্তি যাঁদের ছিল, তাঁরা এখন স্বর্গত কিংবা বিদায় নিয়েছেন রঙ্গালয় থেকে। যেমন তিনকড়ি চক্রবর্তী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও জীবন গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।

নরেশচন্দ্র কেবল নট নন, সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারেন নাট্যাচার্যের কর্তব্যও। তাঁর কাছ থেকে শিক্ষালাভ ক'রে নাম কিনেছেন এ যুগের বহু নট-নটীই। আমি তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি দেখেছি। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর শিক্ষক।

চলচ্চিত্র-জগতেও নট, পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার হিসাবে আছে তাঁর যথেষ্ট অবদান। কখনো অভিনেতা এবং কখনো পরিচালকরূপে তিনি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছেন একাধিকবার। তাঁর দ্বারা পরিচালিত "স্বয়ংসিদ্ধা" ও "কঙ্কাল" প্রভৃতি চিত্রের জনপ্রিয়তা স্মরণীয়।

ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসাবে আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। এক সময়ে বহু রাত্রির অধিকাংশ তাঁর সঙ্গে একত্রে যাপন করেছি। মধ্য রাত্রে রঙ্গালয়ে হ'ত যখন যবনিকাপাত, বসত তখন আমাদের বন্ধুসভা। সেখানে হাজির থাকতেন তিনি, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং আরো কেউ কেউ। রসালাপে এবং গল্পগুজবে কেটে যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা. ভোরের পাখীর ঘুম ভাঙবার সময় যে এসেছে, কারুর থাকত না সে খেয়াল। মাঝে মাঝে সে আসরে এসে যোগ দিতেন শিশির-

কুমার ভাদুড়ী। আসর সেদিন জমজমাট হয়ে উঠত, কারণ শিশিরকুমারের সংলাপের তুলনা নেই।

জানি, সে সব দিন আর ফিরবে না। মানুষের জীবনের একটি কঠিন সত্য হচ্ছে, উপভোগ্য অতীত কোনদিন বর্তমানে পরিণত হয় না। কিন্তু যারা জীবনসন্ধ্যায় এসে উপস্থিত হয়েছে, অতীতের সুখস্মৃতিই হচ্ছে তাদের আনন্দের প্রধান সম্বল।

আঠারো

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বোধ হয় সেটা ১৩২০ (কিম্বা ১৩২১ সাল)। আমি তখন আড়ালে থেকে "যমুনা" পত্রিকা সম্পাদন করছি—যদিও ছাপার হরফে সম্পাদক ব'লে পরিচিত ছিলেন স্বর্গীয় ফণীন্দ্রনাথ পাল।

সেই সময়ে সৌরীন প্রায়ই আসতেন "যমুনা" কার্যালয়ে। মূর্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অশ্রান্ত গল্পগুজবে আসর মুখরিত ক'রে রাখেন। পেশায় পুলিশ কোর্টের উকিল। কিন্তু ওকালতির চেয়ে টান বেশী সাহিত্যের দিকেই। তাই পুলিশ কোর্টে তাঁর মন টিকত না। যখন তখন সেখান থেকে পিঠটান দিয়ে তিনি মেলামেশা করতে যেতেন সাহিত্যিকদের সঙ্গে।

"যমুনা" কার্যালয়ে সৌরীনের সঙ্গে আমার চোখাচোখি হ'ত বটে. কিন্তু কথা বলাবলি হ'ত না। তিনি আসতেন, আর পাঁচজনের সঙ্গে কথাবার্তা কইতেন, আমি চুপ ক'রে ব'সে ব'সে শুনতুম।

সৌরীনের আসল পরিচয় পেয়েছিলুম আরো কয়েক বৎসর আগে। "ভারতী"তে ছোট গল্পে বিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়ে তিনি তখনকার একজন শক্তিশালী উদীয়মান লেখক ব'লে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ঝরঝরে হালকা ভাষা, সরল এবং মধুর। রচনা-ভঙ্গিটিও আমার খুব ভালো লাগত এবং আজও লাগে—কারণ তাঁর ভাষা এখনো দরিদ্র হয়ে পড়েনি। এবং সেই সময়েই তিনি সাহিত্য-জগৎ থেকে নাট্য-জগতেও দৃষ্টিপাত করতে ছাড়েন নি। ১৯০৮ ও ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ষ্টার থিয়েটারে সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনীত হয় তাঁর দ্বারা রচিত দুখানি কৌতুক-নাট্য—"বৎকিঞ্চিৎ" ও "দশচক্র"।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রথম বয়স থেকেই। ভাগলপুরে ব'সে শরৎচন্দ্র একটি তরুণ লেখকদের দল গ'ড়ে

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

তুলেছিলেন। তখন শরৎচন্দ্রের নামও কেউ জানত না এবং কেউ চিনত না সেই সব তরুণকে। তাঁদের নাম হচ্ছে স্বর্গীয়া নিরুপমা দেবী, স্বর্গীয় গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। ভাগলপুরের দল যে হাতে-লেখা পত্রিকায় লেখনী চালনা করতেন, তার নাম ছিল "ছায়া"। শরৎচন্দ্রের উঠতি বয়সের বহু রচনাই পরে "ছায়া" পত্রিকার অঙ্ক ছেড়ে প্রকাশ্য সাহিত্যক্ষেত্রে এসে দেখা দিয়েছে।

সৌরীনের বাড়ী কলকাতায়, কাজেই ভাগলপুরে তিনি স্থায়ী হ'তে পারেন নি। উপেন্দ্রনাথও কলকাতায় চ'লে আসেন। কিন্তু এখানে এসেও তাঁরা সাহিত্যের নেশা ছাড়তে পারলেন না। সাহিত্য-চর্চায় উৎসাহী আরো কয়েকজন তরুণকে নিয়ে গঠন করলেন "ভবানীপুর সাহিত্য সমিতি"। এখানকার হাতে-লেখা পত্রিকার নাম হ'ল "তরণী"।

"ছায়া" ও "তরণী" করত গুরু-শিষ্যের সংবাদবহন। ডাকযোগে তারা আনাগোনা করত কলকাতায় এবং ভাগলপুরে। পরস্পরকে কঠিন ভাষায় ভর্ৎসনা করতেও ছাড়ত না।

তারপর আদ্যলীলার আসর ছেড়ে সৌরীন এসে যোগ দিলেন "ভারতী"র সঙ্গে। তখন সরলা দেবী ছিলেন "ভারতী"র সম্পাদিকা। কিছুকাল দক্ষ হস্তে পত্রিকা চালিয়ে বিবাহ ক'রে তাঁকে পাঞ্জাবে চ'লে যেতে হয়। সেই সময়ে সৌরীন কলকাতায় থেকে সরলা দেবীর নির্দেশ অনুসারে "ভারতী"র কাজ চালিয়ে যেতেন।

তারপর সৌরীন যে কীর্তি স্থাপন করলেন, বাংলা সাহিত্যের দরবারে তা হচ্ছে একটি বিশেষরূপে উল্লেখ্য ঘটনা।

সাহিত্যসাধনা ছেড়ে শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুনে গিয়ে হয়েছেন মাছিমারা কেরানী। তাঁর নিজের মুখেই প্রকাশ, "এর পরেই সাহিত্যের সঙ্গে হলো আমার ছাড়াছাড়ি, ভুলেই গেলাম যে জীবনে একটা ছত্রও কোনোদিন লিখেছি। দীর্ঘকাল কাটলো প্রবাসে—ইতিমধ্যে কবিকে (রবীন্দ্রনাথ) কেন্দ্র ক'রে কি ক'রে যে নবীন বাঙ্গলা সাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে ভ'রে উঠলো আমি তার কোনো খবরই জানিনে।"

শরৎচন্দ্র নিরুদ্দেশ। কিন্তু তাঁর রচনার পাণ্ডুলিপিগুলি যে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জিম্মায় আছে, সৌরীন এ খবরটা জানতেন। সুরেন্দ্রনাথের কাছ থেকে তিনি "বড়দিদি" উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি আনিয়ে শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাতসারেই "ভারতী"তে তিন কিস্তিতে ছাপিয়ে দিলেন (১৯০৭ খৃঃ)। তার ফলেই শরৎচন্দ্রের রচনার সঙ্গে হয় জনসাধারণের প্রথম পরিচয় সাধন। শরতের চাঁদের মুখ থেকে মেঘের ঘোমটা প্রথম খুলে দেন সৌরীন্দ্রমোহনই। এজন্যে তিনি অভিনন্দন পেতে পারেন।

তারপর কেটে গেল আরো কয়েক বৎসর। শরৎচন্দ্র অজ্ঞাতবাসে। সাহিত্য নিয়ে নেই তাঁর কিছুমাত্র মাথাব্যথা। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে কিছুদিনের জন্যে ছুটি নিয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন।

সে সময়ে ফণীন্দ্রনাথ পাল চালাচ্ছেন "যমুনা" পত্রিকা, তার সঙ্গে তখনও আমার সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি। শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় পত্রিকা চালনায় ফণীবাবুকে সাহায্য করতেন। তাঁরা দুজনেই শরৎচন্দ্রকে ধ'রে বসলেন, "যমুনা"র জন্যে আবার লেখনী ধারণ করতে।

সৌরীন লিখেছেনঃ "যমুনা-সম্পাদক ফণীন্দ্র পাল আমায় ধরিয়াছেন—যে 'যমুনা'কে তিনি জীবন-সর্বস্ব করিতে চান, আমার সহযোগিতা চাহেন। শরৎচন্দ্র আসিলে তাঁকে ধরিলাম—এই যমুনার জন্য লিখিতে হইবে।"

শরৎচন্দ্র বলিলেন—একখানা উপন্যাস 'চরিত্রহীন' লিখিতেছি। পড়িয়া দ্যাখো চলে কি না।

প্রায় পাঁচ আনা অংশ লেখা 'চরিত্রহীনে'র কাপি তিনি আমার হাতে দিলেন। পড়িলাম। শরৎচন্দ্র কহিলেন—নায়িকা কিরণময়ী। তার এখনো দেখা পাওনি। খুব বড় বই হইবে।

'চরিত্রহীন' যমুনায় ছাপা হইবে স্থির হইয়া গেল। তিনি অনিলা দেবী ছদ্ম নামে 'নারীর মূল্য' আমায় দিয়া বলিলেন—আমার নাম প্রকাশ করিয়ো না। আপাতত যমুনায় ছাপাও।

তাই ছাপানো হইল। তারপর দিলেন গল্প—'রামের সুমতি'।

যমুনায় ছাপা হইল। বৈশাখের যমুনার জন্যে আবার গল্প দিলেন—'পথনির্দেশ'।"

সৌরীন্দ্রমোহন ও উপেন্দ্রনাথ মধ্যস্থ হয়ে না দাঁড়ালে এবং লেখার জন্যে পীড়াপীড়ি না করলে শরৎচন্দ্র যে সাহিত্যক্ষেত্রে পুনরাগমন করতেন, এ কথা জোর ক'রে বলা যায় না।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা ব'লে নি। শরৎচন্দ্রের একটি মজার শখ ছিল। তিনি যে সব লেখককে নিজের শিষ্যস্থানীয় ব'লে মনে করতেন, তাঁদের প্রত্যেককে উপহার দিতেন একটি ক'রে ভালো ফাউণ্টেন পেন। তাঁর একখানি পত্রে দেখি, নিরুপমা দেবী ও সৌরীনের জন্যেও তিনি ফাউণ্টেন পেন ঠিক ক'রে রেখেছেন।

যমুনা কার্যালয়ে একদিন আমাকে বললেন, "হেমেন্দ্র, তুমি যদি আমাকে গুরু ব'লে মানো, তাহলে তোমাকেও একটি ফাউণ্টেন পেন দেব।"

তার ছেলেমানুষি কথা শুনে মনে মনে হেসে বললুম, "আপনি আমার শ্রদ্ধাভাজন। কিন্তু আমার গুরু রবীন্দ্রনাথ। আর কারুকে তো গুরু ব'লে মানতে পারব না।" বলা বাহুল্য, আমার ভাগ্যে আর ফাউণ্টেন পেন লাভ হয় নি।

প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপরে "ভারতী" সম্পাদনার ভার দিয়ে স্বর্ণকুমারী দেবী অবকাশ গ্রহণ করলেন। সেই সময়ে মণিলালের বাল্যবন্ধু সৌরীন্দ্রমোহন হন "ভারতী"র সহযোগী সম্পাদক। আমি তখন সাপ্তাহিক পত্রিকা "মর্মবাণী"র সহকারী সম্পাদক। কিন্তু মণিলালের আহ্বানে আমিও যোগ দি "ভারতী"র দলে। ঐখানেই সৌরীনের সঙ্গে আমার মৌখিক কথোপকথন সুরু হয়। ক্রমে ক্রমে বেড়ে ওঠে আমাদের সৌহার্দ্য। কেবল "ভারতী"র বৈঠকে আড্ডা দিয়েই আমাদের তৃপ্তি হয় না, কোনদিন আদালত থেকে ধড়াচূড়ো না বদলেই তিনি সোজা চ'লে আসেন আমার কাছে, কোনদিন আমিই সিধে গিয়ে উঠি তাঁর বাড়ীতে। দুজনেই নাট্যকলার অনুরাগী, একসঙ্গে গিয়ে বসি এ রঙ্গালয়ে, ও রঙ্গালয়ে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মিনার্ভা থিয়েটারে সৌরীনের লেখা "রুমেলা"

নাটক অভিনীত হয়। তারপর "নাট্যমন্দিরে" ও "আর্ট থিয়েটারে" তাঁর আরো দুখানি কৌতুক-নাটিকার অভিনয় হয়—"হারানো রতন" ও "লাখ টাকা"। শেষোক্ত নাটকে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী প্রধান হাস্যরসাশ্রিত ভূমিকায় যে চমৎকার অভিনয় এবং "মেক-আপে" যে বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করেছিলেন, তা আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। এই শ্রেণীর লঘু হাস্যনাট্য রচনায় সৌরীন্দ্রমোহন প্রভৃত দক্ষতা জাহির করেছেন। কিন্তু নবযুগের বাংলা নাট্যকলা কিছুদূর অগ্রসর হয়েই নিছক হাসির পালা প্রায় সাঙ্গ ক'রে দিয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাই অমৃতলাল বসুর মত অতুলনীয় হাস্যনাট্যকার আর এখানে আসর জমাবার সুযোগ পাবেন না। সৌরীন্দ্রমোহনও আর হাস্যনাট্য রচনায় নিযুক্ত হন না। বাঙালী দর্শকদের গোমড়া মুখ দেখলে হাসির পালা বাঁধবার সাধ হয় কার?

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আমিও "প্রেমের প্রেমারা" নামে একখানি দুই অঙ্কের হাসির নাটিকা রচনা করেছিলুম। মণিলাল ও সৌরীনের চেষ্টায় পালাটি মিনার্ভা থিয়েটারে গৃহীত হয়। আমি তখন দেওঘরে। সৌরীন নিজেই সানন্দে একখানি পত্রে আমাকে সেই খবরটি দেন এবং নিজেই উদ্‌যোগী হয়ে অভিনয় সম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থা পাকা ক'রে ফেলেন।

শিশিরকুমারের প্রথম অভিনয় দেখি তাঁরই মধ্যস্থতায়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ। একদিন তিনি আমার কাছে এসে বললেন, "হেমেন্দ্র, আজ ষ্টার রঙ্গমঞ্চে বিখ্যাত শৌখীন অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ী "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" নাটকে ভীমের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। টিকিট বেচে অভিনয়, কারণ 'সাহায্য-রজনী'। আমি একখানা টিকিট কিনেছি, তুমিও একখানা নাও।"

পুরনো নাটক, শৌখীন অভিনয়। তার উপরে পুরুষরা সাজবে মেয়ে, আমার কাছে যা অসহনীয়। মনে বিশেষ কৌতূহল না থাকলেও সৌরীনের আগ্রহে শেষ পর্যন্ত অভিনয় দেখতে গেলুম। গিয়ে ঠকিনি। সে রাত্রে যে বিস্ময়কর নাট্যপ্রতিভার নিদর্শন দেখেছিলুম, ক্ষীয়মাণ গিরিশোত্তর যুগের নাট্যজগতে তা ছিল সম্পূর্ণরূপেই অপ্রত্যাশিত। সৌরীন রঙ্গমঞ্চের নেপথ্য

থেকে সংবাদ সংগ্রহ ক'রে আনলেন: শৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়ে শিশিরবাবুর এই শেষ অভিনয়। এর পর তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন সাধারণ রঙ্গালয়ে।

সৌরীন আগে লিখতেন ছোট গল্প এবং মাঝে মাঝে কবিতাও। তারপর উপন্যাস রচনাতেও নিপুণ হাতের পরিচয় দেন। সরল রচনার ওস্তাদ ব'লে তিনি শিশুসাহিত্যেও কৃতী লেখকরূপে রীতিমত নাম কিনেছেন। তাঁর লেখা কেতাবের নামের ফর্দ হবে সুদীর্ঘ। এত লিখেও তাঁর লেখার উৎসাহ ফুরিয়ে যায় নি। আজও তিনি লিখছেন, অশ্রান্তভাবেই লিখছেন। তাঁর সাহিত্যশ্রম উল্লেখনীয়।

চলচ্চিত্র যখন বোবা, তাঁর রচিত উপন্যাস "পিয়ারী" চিত্রে রূপায়িত হয়েছিল। নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী চন্দ্রাবতী সেই প্রথম দেখা দেন চলচ্চিত্রপটে। গল্প ভালো। কিন্তু যা সচরাচর হয়ে থাকে, পরিচালনার দোষে ছবিখানি জমে নি। কিন্তু হালে সৌরীন অর্জন করেছেন যশের 'লরেল'। তাঁর উপন্যাস অবলম্বনে রচিত "বাবলা" এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ বাংলা চিত্র ব'লে সমাদৃত হয়েছে। বন্ধুর সাফল্যে আমিও আনন্দিত।

সৌরীন আজ প্রাচীন। বয়সে আমার চেয়ে চার-পাঁচ বৎসরের বড়। কিন্তু এখনো বালকোচিত স্বভাব ছাড়তে পারেননি। থেকে থেকে কেন যে তিনি অভিমান করবেন, নিজেকে উপেক্ষিত ভেবে মুখভার ক'রে থাকবেন, তার হদিস পাওয়া কঠিন। হঠাৎ রাগেন, আবার হঠাৎ ঠান্ডা হন। বৈশাখের চড়া রোদ, আবার আষাঢ়ের মেদুর ছায়া। শেষ যেদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখন তিনি বৈশাখী তপ্ততার দ্বারা আক্রান্ত। আমি বলেছিলুম, "ভাই, আমরা দুজনেই আজ জীবনের প্রান্তদেশে এসে পড়েছি। যা অকিঞ্চিৎকর, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার বয়স কি আর আছে?"

উনিশ

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

পুরাতন বন্ধু। কিছু-কম পাঁচ যুগ আগে প্রেমাঙ্কুরের সঙ্গে হয় আমার প্রথম পরিচয়। পৃথিবীর নাট্যশালায় আজও আমার যে দুই-চারজন সত্যকার মরমী বন্ধু বিদ্যমান আছেন, তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন প্রেমাঙ্কুর। আমার কাছে তিনি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বা প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক নন, আমার কাছে তিনি বন্ধু—কেবল বন্ধুই। এই বিষাক্ত দুনিয়ায় অকপট বন্ধুলাভ যে কতটা দুর্ঘট, দুনিয়াদারিতে ভুক্তভোগীর কাছে তা অবিদিত থাকবার কথা নয়।

প্রেমাঙ্কুরের সঙ্গে যখন আমার প্রথম পরিচয় হয়, তখন তিনি সাহিত্যিক ছিলেন না, ছিলেন কেবল সাহিত্যরসিক। কিন্তু লেখক হবার জন্যে তখনই যে গোপনে হাতমক্স সুরু করেছেন, সে প্রমাণ পেয়েছিলুম অল্পদিন পরেই।

সুধাকৃষ্ণ বাগচী এক তৃতীয় শ্রেণীর যুবক, তার মূলমন্ত্র ছিল—"ভুলিয়াও সত্য কথা কহিবে না।" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের "জাহ্নবী" নামে মাসিক কাগজ উঠে যাবার কয়েক বৎসর পরে সে ঐ নামেই আর একখানি পত্রিকা প্রকাশ করে। নামে সেই-ই ছিল সম্পাদক, কিন্তু তার রচনাশক্তি বা সম্পাদকের উপযোগী বিদ্যা-বুদ্ধি ছিল না। পত্রিকা পরিচালনার ভার নিয়ে যে কয়েকজন তরুণ যুবক তখন "জাহ্নবী" কার্যালয়ে ওঠা-বসা করতেন, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই আজ বিভিন্ন বিভাগে হয়েছেন দেশের ও দশের কাছে সুপরিচিত। তাঁরা হচ্ছেন শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (পরে অধুনালুপ্ত দৈনিক "ভারতে"র সম্পাদক), শ্রীঅমল হোম (পরে "মিউনিসিপ্যাল গেজেটে"র সম্পাদক এবং এখন সরকারের প্রচার-সচিব), শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার (পরে "মৌচাক" সম্পাদক ও বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক), শ্রীচারুচন্দ্র রায় (পরে চিত্রকর ও চিত্র-পরিচালক-

রূপে নাম কেনেন) এবং শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী (পরে ঔপন্যাসিক ও চিত্র-পরিচালক)। এই দলে আর একজনও ছিলেন, পরে ভেস্তে গিয়েছেন কেবল তিনিই। তাঁর নাম শ্রীনরেশচন্দ্র দত্ত। কার্যক্ষেত্রে আরম্ভ করেছিলেন তিনি আশাপ্রদ জীবন। কাজ করতেন সুরেন্দ্রনাথের বিখ্যাত দৈনিক "বেঙ্গলী"র সম্পাদকীয় বিভাগে। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে "বেঙ্গলী"কে ছেড়ে অবলম্বন করলেন মসীর বদলে অসি—অর্থাৎ সৈনিকবৃত্তি। দেশে ফিরে হলেন সাবডেপুটি। ঐ পর্যন্ত।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটা কথা মনে হচ্ছে। প্রেমাঙ্কুর আর আমারও জীবন হয়তো বদলে যেত। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট সেনাদলে ভর্তি হবার জন্যে বাঙালী যুবকদের আহবান করেন। প্রেমাঙ্কুর ও আমি পরামর্শের পর স্থির করলুম, আমরাও ধারণ করব মসীর বদলে অসি। বিপুল উৎসাহে আমি একদিন যথাস্থানে গিয়ে সেনাদলে নাম লিখিয়ে এলুম। প্রেমাঙ্কুর তো তখন থেকেই সেকালকার গোরা সৈনিকদের মত খাটো ক'রে চুল ছাঁটতে শুরু ক'রে দিলেন। দুজনে মিলে দেখতে লাগলুম যুদ্ধক্ষেত্রের রক্তাক্ত স্বপ্ন। সে যাত্রা সৈনিক হবে ব'লে নাম লিখিয়েছিল প্রায় ছয় শত জন বাঙালী যুবক। কিন্তু হঠাৎ গভর্ণমেণ্টের মত গেল বদলে। বললেন, না, আপাততঃ আর বাঙালী ফৌজের দরকার নেই। প্রথম ছয় শত জনের নাম খারিজ ক'রে দেওয়া হ'ল। কিছুদিন পরে আবার এল সরকারি আহবান—বাঙালী ফৌজ চাই। নতুন ক'রে সবাই নাম লেখাও। আমাদের ভিতর থেকে সে আহবানে সাড়া দিলেন কেবল নরেশচন্দ্র। প্রেমাঙ্কুরের ও আমার সে প্রবৃত্তি আর হ'ল না। প্রথম বারেই প্রত্যাখ্যাত হয়ে জুড়িয়ে গিয়েছিল আমাদের প্রতপ্ত উৎসাহ। ভুল করেছি ব'লে মনে হচ্ছে না। কারণ আজ জেনেছি অসির চেয়ে মসীর শক্তিই বেশী। সারা পৃথিবীতে এখন এই যে "কোল্ড ওয়ার" বা "ঠাণ্ডা যুদ্ধ" চলছে, তার প্রধান অস্ত্রই তো হচ্ছে কালি ও কলম।

যাক্। "জাহ্নবী" কার্যালয়ের কথা হচ্ছিল। ওখানে আমিও

প্রত্যহ যেতুম বটে, কিন্তু পত্রিকা পরিচালনার সঙ্গে আমার কোন সংস্রব ছিল না। আমি ছিলুম "জাহ্নবী"র নিয়মিত লেখক। যে তরুণদের দলটি নিয়ে "জাহ্নবী"র বৈঠকটি গঠিত হয়, তাঁদের মধ্যে সাহিত্যক্ষেত্রে আমিই ছিলুম তখন সবচেয়ে অগ্রসর, কারণ সে সময়ে "ভারতী", "প্রবাসী", "সাহিত্য", "নব্যভারত", "মানসী", "অর্চনা" ও "জন্মভূমি" এবং অন্যান্য বহু পত্রিকায় আমার অনেক প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা প্রকাশিত হ'ত।

মনে ছিল তখন ভবিষ্যতের কত সম্ভাবনার ইঙ্গিত, সাহিত্যের রূপকথাই ছিল আমাদের আনন্দের একমাত্র সম্বল। সাহিত্যের মাদকতা আমাদের মত্ত ক'রে তুলেছিল এবং সে নেশার ঘোর আজও কাটেনি। তখনও পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান ছিল, যদিও তখনকার অধিকাংশ উদীয়মান সাহিত্যিকের গুরুস্থানীয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথই। নাট্যসাহিত্যে চলছে তখন দ্বিজেন্দ্রলালের যুগ। "বিন্দুর ছেলে" ও "রামের সুমতি" প্রভৃতি গল্প বোধ হয় তখনও বেরোয়নি কিম্বা সবে বেরিয়েছে, কিন্তু সুপরিচিত লেখক হিসাবে জনসাধারণের বা আমাদের মনে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কোন স্থানই ছিল না।

বয়সে ছিলুম সকলেই তরুণ, বয়সের ধর্মকে অস্বীকার করতেও পারতুম না। ঝোঁকের মাথায় প্রায়ই তুমুল তর্কাতর্কির ঝড়ের ভিতরে গিয়ে পড়তুম। এখন সেই বালকতার কথা মনে করলেও হাসি পায়, কিন্তু তখন সেই তর্কের হার-জিতের উপরে নির্ভর করত যেন আমাদের সমস্ত মানসম্ভ্রম। দু পক্ষের একমাত্র লক্ষ্য থাকত, সুযুক্তি বা কুযুক্তির সাহায্যে যেমন ক'রেই হোক প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ করা। কিন্তু মুখ তো বন্ধ হ'তই না, বরং আরো বেশী ক'রে খুলে যেত।

একবার তর্ক বাধল বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন ক'রে। একপক্ষে ছিলুম প্রেমাঙ্কুরের সঙ্গে আমি এবং অন্য পক্ষে প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। অন্যেরা থাকতেন মধ্যস্থের মত। বাকবিতণ্ডা চরমে উঠলে উত্তেজিত হয়ে তারস্বরে চীৎকার করতুম আমরা তিনজনেই। তর্ক শুরু হ'ত সন্ধ্যার আগে "জাহ্নবী" কার্যালয়ে। সন্ধ্যার পর

আসত রাত্রি। কার্যালয় বন্ধ হয়ে যেত। তবু বন্ধ হ'ত না আমাদের বাকপ্রপঞ্চ। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের জনবহুল ফুটপাথের উপরে আমাদের তর্ক চলত অশ্রান্তভাবে। ওদিকে হেদুয়া আর এদিকে শ্রীমানী মার্কেট। ওদিক থেকে এদিকে আসি, আবার এদিক থেকে যাই ওদিকে এবং চলতে চলতে ফোটাই অনবরত কথার খই। মাঝে মাঝে হঠাৎ এত জোরে ছুঁড়ি বাক্যবন্দুক যে, রাজপথের চলমান পথিকরা চমকে ও থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়ে অবাক্ হয়ে তাকায় আমাদের মুখের দিকে। ক্রমে রাত বাড়ে, পথ জনবিরল হয়ে পড়ে, কিন্তু তর্ক থামে না। প্রেমাঙ্কুর ও প্রভাত থাকেন এক পাড়ায়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের আশেপাশে এবং আমি তখন থাকতুম পাথুরিয়াঘাটায় আমাদের পৈতৃক বাড়িতে। আমি যদি হই বাড়িমুখো, অন্য কেউ আমার সঙ্গ ছাড়তে নারাজ। বিডন স্ট্রীট ধ'রে চিৎপুর রোডের মোড়। তর্ক তখনও প্রবল। তাকে আধা-খ্যাঁচড়া রেখে কারুরই বাড়ি যেতে মন সরে না। সবাই ঢুকি বিডন গার্ডেনে। আবার বসে তর্কসভা। মধ্য রাত্রি। বাধ্য হয়ে সবাই উঠে দাঁড়াই। প্রেমাঙ্কুর ও প্রভাত প্রভৃতি নিজেদের পাড়ার দিকে পদচালনা করেন। হঠাৎ আমার মনে হয়, তূণের কতিপয় চোখা চোখা বাক্যবাণ এখনো ছোঁড়া হয় নি। আমিও সেইগুলি ব্যবহার করতে করতে আবার চলি তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে। বিডন স্ট্রীটের আধখানা পার হয়ে আবার কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে। তবু তর্ক থেকে যায় অমীমাংসিত। সেদিন অতৃপ্ত মনে সবাই বাড়ি ফিরলুম বটে, কিন্তু তর্কের খেই ধরা হ'ল আবার পরদিন। এমনি চলল দিনের পর দিন। প্রত্যেকেই নাছোড়বান্দা।

পাড়ার লোকেরা দস্তুরমত অতিষ্ঠ। প্রেমাঙ্কুরের পিতৃদেবের কাছে গিয়ে তারা নালিশ করলেন, "মশাই, আপনার ছেলে আর তার বন্ধুদের উপদ্রবে এ-পাড়া থেকে ঘুমের পাট উঠে যেতে বসেছে। রোজ দুপুর রাত্রে তারা 'বঙ্কিমচন্দ্র' আর 'রবীন্দ্রনাথ' ব'লে এমন ভয়ানক জোরে বীভৎস তর্জনগর্জন করে যে, ঘুমোতে ঘুমোতে আমাদের আঁতকে জেগে উঠতে হয়। এ ভয়ানক কাণ্ড বন্ধ না করলে আমাদের প্রাণ তো আর বাঁচে না।"

চীৎকারে আমাদের মধ্যে প্রভাতই ছিলেন অগ্রগণ্য। তাঁর একার কণ্ঠে ছিল চারজনের সম্মিলিত কণ্ঠের চীৎকার করবার শক্তি।

তর্কাতর্কি একেবারে ব্যর্থ হ'ত না। তার মধ্যে থেকে পেয়েছি আমার কয়েকটি নূতন রচনার উপাদান। প্রেমাঙ্কুরও রবীন্দ্রনাথের "রাজা ও রাণী"কে বিশ্লেষণ ক'রে প্রকাণ্ড একখানি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ক'রে ফেলেছিলেন।

প্রেমাঙ্কুরের সঙ্গে স্থাপিত হ'ল আমার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। প্রতিদিনই কেউ কারুকে না দেখে থাকতে পারি না। পরে পরে "যমুনা", "মর্মবাণী", "সঙ্কল্প" ও "ভারতী" প্রভৃতি পত্রিকার আসরে, বিভিন্ন বন্ধুবাড়ীর বৈঠকে, থিয়েটারে, সিনেমায়, গান-বাজনার মজলিসে—এমন কি কুস্তির আখড়ায় ও খেলাধূলোর মাঠেও আমাদের দু'জনের আবির্ভাব হ'ত একসঙ্গে মানিকজোড়ের মত। এইভাবে কেটে গিয়েছে বৎসরের পর বৎসর, বহু বৎসর। শহরের ভিতরে এবং বাহিরে কত দিন রাত কাটিয়েছি এক শয্যায়।

কিন্তু জীবনসংগ্রাম একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও বিক্ষিপ্ত করে ইতস্তত, তাদের টেনে নিয়ে যায় পরস্পরের চোখের আড়ালে। আমি শিকড় গেড়ে মোতায়েন আছি সাহিত্য-ক্ষেত্রেই, কিন্তু প্রেমাঙ্কুর যেদিন থেকে প্রবেশ করেছেন সিনেমা জগতে, সেই দিন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় ন' মাসে ছ' মাসে। তবে আমাদের মনের সম্পর্ক যে আজও একটুও শিথিল হয়নি, মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লেই সেটুকু বুঝতে বিলম্ব হয় না।

গোড়ার দিকেও তিনি আর একবার বেশ কিছুকালের জন্যে সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দিয়ে চাকরিতে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিছুকাল পরে আবার হন বেকার। কিন্তু তাঁর মতন একজন মনীষী ব্যক্তির অলস হয়ে ব'সে থাকাটা আমার ভালো লাগেনি। সেই সময়ে স্বর্গীয় ললিতমোহন গুপ্ত "হিন্দুস্থান" নামে একখানি ভালো দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং আমি ছিলুম তার একজন নিয়মিত লেখক। প্রেমাঙ্কুরকেও আমি "হিন্দুস্থানে"র সম্পাদকীয় বিভাগে ভিড়িয়ে নি (পত্রিকাখানি ছয় বৎসর ধ'রে চলেছিল)। তারপর থেকে তাঁর লেখনী হয়ে ওঠে রীতিমত সচল। পরে পরে তিনি রচনা করেন

অনেকগুলি জনপ্রিয় গল্প ও কয়েকখানি উপন্যাস। ক্রমে ক্রমে বেড়ে ওঠে তাঁর হাতযশ। পরিচিত হন তিনি "ভারতী" গোষ্ঠীভুক্ত অন্যতম বিখ্যাত লেখকরূপে। তাঁর সাহিত্য সাধনার সম্যক পরিচয় দেবার স্থান এখানে নেই। তবে এটুকু উল্লেখ করা চলে যে, জীবনের পূর্বার্ধে তিনি লোকপ্রিয় সুলেখক ব'লে সুনাম কিনেছিলেন বটে, কিন্তু "মহাস্থবির জাতক" রচনা ক'রে সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন প্রাচীন বয়সেই। প্রায় দুই যুগ আগে একখানি নাটক রচনা করেছিলেন—"তখৎ-এ-তাউস"। সম্প্রতি তা মঞ্চস্থ হয়েছে শিশির-কুমারের "শ্রীরঙ্গমে"। বাল্যকাল থেকেই তাঁর ঝোঁক ছিল নাট্যকলার দিকে। তরুণ বয়সেই তিনি শৌখীন অভিনয়ে যোগ দিতেন এবং পরিণত বয়সে এই নাট্যানুরাগের জন্যেই আকৃষ্ট হন চলচ্চিত্রের দিকে। কেবল পরিচালনায় নয়, চিত্রাভিনয়েও তাঁর দক্ষতা আছে। কয়েক বৎসর পূর্বে নিউ থিয়েটারের "পুনর্জন্ম" কথাচিত্রে তিনি অভিনয় করেছিলেন প্রধান ভূমিকায়।

বন্ধুরা সকলেই তাঁর সঙ্গ প্রার্থনা করে। তাঁর উপস্থিতিতে সরস ও সজীব হয়ে ওঠে যে কোন শ্রেণীর বৈঠক। মিশতে পারেন তিনি শিল্পীদের সঙ্গে শিল্পীর মত, আবার রাম-শ্যামের সঙ্গে রাম-শ্যামের মত। তাঁর মুখে হাসির বুলি ও হাসির গল্প জ'মে ওঠে অপূর্বভাবে। এমন গল্পিয়া মানুষ আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে আমি আর দেখিনি। অতি সাধারণ কথা তাঁর ভাষণ-ভঙ্গিতে হয়ে ওঠে অতি অসাধারণ। আজ তিনি রোগজর্জর, জরাকাতর, কিন্তু এখনো মন তাঁর হয়ে আছে চিরহরিৎ, কথায় কথায় সেখান থেকে উচ্ছ্বলিত হয়ে ওঠে হাসিরাঙা রসের ফোয়ারা।

একদিন বৈকালে বাড়ীর ত্রিতলে রচনাকার্যে নিযুক্ত হয়ে আছি, হঠাৎ রাস্তা থেকে ডাক শুনলুম, "হেমেন্দ্র, হেমেন্দ্র!"

জানলার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কে?"

—"আমি প্রেমাঙ্কুর।"

বহু—বহুকাল অদর্শনের পর আচম্বিতে প্রেমাঙ্কুরের এই অভাবিত আবির্ভাব কেন? নিচে গিয়ে সুধালুম, "ব্যাপার কি?"

প্রেমাঙ্কুর অভিভূত কণ্ঠে বললেন, "বাড়ীতে ব'সে থাকতে থাকতে

হঠাৎ মনে হ'ল, দুনিয়ায় আমি একা। তুমি ছাড়া আমার আর কোন বন্ধু নেই। তাই ছুটতে ছুটতে তোমার কাছেই চ'লে এসেছি।।"

অজিতকুমার চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে আমরা "ভারতী"র আসরে বাস করতুম একটি সুখী পরিবারের মত। সে আসর ভেঙে গেছে, প্রায় সব দীপ নিবে গেছে। দু-তিনটি জীবনদীপ এখনো টিমটিম ক'রে জ্বলছে বটে, কিন্তু তাদেরও তেল ফুরোতে দেরি নেই।

কুড়ি

অহীন্দ্র চৌধুরী

মাত্র দুই বৎসর। মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে বাংলা নাট্যকলার মোড় ঘুরে গেল একেবারে। যা ছিল ক্ষীণ, জরাজর্জর, লাভ করলে তা তাজা রক্ত, উত্তপ্ত যৌবন। পুরাতন সরে দাঁড়াল পিছনে, নূতন এগিয়ে এল সামনে। এই অভাবিত আকস্মিক পরিবর্তন বিস্ময়কর।

মনোমোহন থিয়েটারে বৃদ্ধ দানীবাবু করছিলেন নিশ্চিন্তভাবে অতীতের রোমন্থন। পূর্বসঞ্চিত পুঁজি ভাঙিয়ে কোন রকমে চালিয়ে দিচ্ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের জীবদ্দশায় যে দানীবাবুকে একই ভূমিকায় বারংবার দেখে দেখেও আমাদের আশা মিটতে চাইত না, "মনোমোহনে"র নূতন নাটকেও তিনি আর দিতে পারতেন না নূতনত্বের পরিচয়। চলাফেরা, অঙ্গহার, সংলাপ, সব-কিছুর ভিতরেই আগে যা দেখেছি ও শুনেছি, আবার তাইই প্রকাশ পেত। তাঁর সঙ্গে আর যাঁরা অভিনয় করতেন, তাঁরা ছিলেন আবার রীতিমত বাজে মার্কার। বিয়োগান্ত নাটককেও তাঁরা প্রহসনে পরিণত করতে পারতেন অবলীলাক্রমে।

এই ভাঙা হাটে প্রথমে এসে দাঁড়ালেন শিশিরকুমার। তাঁর কয়েক মাস পরে এলেন রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও নরেশচন্দ্র মিত্র। তারই অল্পদিন পরে দেখা দিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী। এবং তারপর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে আমরা এক সঙ্গে লাভ করলুম দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, তিনকড়ি চক্রবর্তী ও অহীন্দ্র চৌধুরীকে। ভাঙা হাট জমে আবার সরগরম হয়ে উঠল। এ সব হচ্ছে মাত্র দুই বৎসরের ঘটনা।

'রেনেসাঁস' পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে লেগেছিল আরো কিছুকাল। শেষোক্ত দলের শিল্পীরা যখন দেখা দেন, শিশিরকুমার ছিলেন তখন যবনিকার অন্তরালে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে নাট্যজগতে হয় তাঁর পুনঃপ্রবেশ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হয় "মনোমোহনে"র পতন। ক্রমে

শিশিরকুমারের চারি পাশে এসে দাঁড়ালেন ললিতমোহন লাহিড়ী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন চৌধুরী, অমিতাভ বসু, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রবি রায় ও জীবন গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। লুপ্ত হয়ে গেল বাংলা রঙ্গালয়ের গতানুগতিক ধারা। নূতন স্রোত এল পুরাতন খাতে। সেই স্রোত এখনো চলছে। তখনকার নবীনরা আজ হয়েছেন প্রবীণ। অনেকে পরলোকে গিয়েছেন। তাঁদের স্থান গ্রহণ করেছেন নূতন নূতন শিল্পী। সৌভাগ্যক্রমে এখানকার সর্বাগ্রগণ্য ও সৃষ্টিক্ষম দুইজন শিল্পী আজও সক্রীয় অবস্থায় আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। ওঁদের একজন হচ্ছেন শিশিরকুমার, আর একজন অহীন্দ্র চৌধুরী।

নবযুগের অধিকাংশ অভিনেতার মত অহীন্দ্রেরও হাতে খড়ি হয়নি সাধারণ রঙ্গালয়ে। তাঁরও নাট্যসাধনা শুরু হয়েছিল শৌখীন নাট্যজগতেই। কেবল তাই নয়। পেশাদার রঙ্গালয়ে মঞ্চাভিনয়ে যোগ দেবার আগেই তিনি চলচ্চিত্রের পর্দাতেও দেখা দিয়ে নিজের নৈপুণ্যে প্রকাশ করেছিলেন। অধুনালুপ্ত বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা "কল্লোলে"র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ডাঃ কালিদাস নাগের ভ্রাতা স্বর্গীয় গোকুলচন্দ্র নাগ প্রভৃতির চেষ্টায় "ফোটো প্লে সিণ্ডিকেট অফ ইণ্ডিয়া" নামে একটি চিত্র-প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। তার প্রথম ছবির নাম "সোল অফ এ স্লেভ"। নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন অহীন্দ্র চৌধুরী। তাঁর অভিনয় বেশ উতরে গিয়েছিল।

সাধারণ রঙ্গালয়ে তাঁর প্রথম ভূমিকা হচ্ছে "কর্ণার্জুন" নাটকে অর্জুন। প্রথম আবির্ভাবেই তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিলেন প্রত্যেক দর্শকের দৃষ্টি। দীর্ঘ, সুঠাম ও বলিষ্ঠ দেহ এবং সুশ্রী মুখ, নায়কের উপযোগী আদর্শ চেহারা। গম্ভীর, উদাত্ত ও ভাবব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর। গলায় স্বরের খেলায় বেশী বৈচিত্র্য না থাকলেও ভাবের অভিব্যক্তি প্রদর্শিত হয় সুকৌশলে। সংলাপ ও অঙ্গহারের মধ্যে সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে একজন জাত-অভিনেতা এবং পরিপক্ক শক্তি নিয়েই রঙ্গমঞ্চে দেখা দিয়েছেন, তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সকলে সে কথা উপলব্ধি করতে পেরেছিল।

অদূর ভবিষ্যতেই তিনি নাম কিনবেন, এটুকু অনুমান করতে আমার বিলম্ব হয়নি। নাট্যজগতে নিজেকে আমি 'ভেটার‍্যান' দর্শক ব'লে মনে করতে পারি (ভেটার‍্যান অভিনেতা যদি থাকতে পারে, তবে ভেটার‍্যান দর্শকই বা থাকবে না কেন?)। বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত অভিনয় দেখে দেখে মাথার চুল পাকিয়ে ফেললুম, একবার দেখলেই চিনতে পারি ভালো অভিনেতাকে। তাই অহীন্দ্র চৌধুরীকেও চিনতে বিলম্ব হয়নি।

কিন্তু একজন উঁচুদরের চৌকস শিল্পীকে যাচাই করতে হ'লে অর্জুন ভূমিকাটি বেশী কাজে লাগবে না। শিপীর শ্রেষ্ঠতার আদর্শ কি, তিনি কতটা উঁচুতে ও কতটা বৈচিত্র্য দেখাতে পারেন, সে প্রমাণ পেতে গেলে দরকার অন্য রকম ভূমিকার। "কর্ণার্জুনে"র পর অহীন্দ্র আরো কোন কোন নাটকে দেখা দেন। প্রতিবারেই করেন উল্লেখযোগ্য অভিনয়। কিন্তু সে সব ক্ষেত্রেও তাঁর যথার্থ শক্তি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করতে পারিনি।

তারপরেই হ'ল তাঁর প্রকৃত আত্মপ্রকাশ। উপর উপরি রবীন্দ্রনাথের দুইখানি নাটকে ("চিরকুমার সভা" ও "গৃহপ্রবেশ") তিনি যথাক্রমে গ্রহণ করলেন চন্দ্র ও যতীনের ভূমিকা। দুটি ভূমিকাই সম্পূর্ণরূপে পরস্পরবিরোধী। একটি হাস্যতরল ও আর একটি অশ্রুসজল। চন্দ্রবাবু নিজে হাসেন না, বরং গম্ভীর হয়েই থাকেন, কিন্তু লোকে তাঁর ভাবভঙ্গি, চলনবলন, অন্যমনস্কতা ও মুদ্রাদোষ প্রভৃতি দেখে হেসে খায় লুটোপুটি। অনেকটা এই শ্রেণীর অধ্যাপককে বাস্তবজীবনেও আবিষ্কার করা অসম্ভব হবে না। চন্দ্রের ভূমিকায় অহীন্দ্রের অপরূপ অভিনয় নাট্যজগতে কেবল আলোড়ন ও উত্তেজনা সৃষ্টিই করলে না, সেই সঙ্গে সকলকে দেখিয়ে দিলে কতখানি উন্নত শক্তির অধিকারী তিনি। ভূমিকার উপযোগী প্রকৃতি-নির্দেশক রঙ্গসজ্জার দ্বারাও তিনি দর্শকদের করলেন চমৎকৃত।

তারপর যতীনের ভূমিকা। অত্যন্ত কঠিন ভূমিকা। কেবল সুকঠিন নয়, বাংলা রঙ্গালয়ের এমন নূতন রকম ভূমিকা আর কখনো দেখা যায় নি—আগেও না, পরেও না। একটিমাত্র দৃশ্য,

নাটকের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যাধিগ্রস্ত, মৃত্যুন্মুখ, উত্থান-শক্তিহীন যতীন শয্যাশায়ী অবস্থায় সংলাপ চালিয়ে যাবে হিমীর (শ্রীমতী নীহারবালা) সঙ্গে। মেলো-ড্রামাটিক ভাবভঙ্গি ও প্যাঁচ দেখাবার, চীৎকার ও রঙ্গমঞ্চ পরিক্রমণ করবার এতটুকু সুযোগ নেই, তবু সেই নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চেষ্ট অবস্থাতেই নাটকের প্রাণবস্তু ফুটিয়ে তুলে এবং ভাবাভিব্যক্তির চরমে উঠে কেবল সংলাপ সম্বল ক'রেই অহীন্দ্র সকলকে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখতেন। দুইবার দেখেছি "গৃহপ্রবেশ" এবং দুইবারই অহীন্দ্রের অনুপম শক্তি দেখে বিস্মিত হেয় ফিরে এসেছি। আরো দেখবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাংলা রঙ্গালয়ের অরসিক দর্শকদের অনাদরে "গৃহপ্রবেশের"র পরমায়ু হয়েছিল অতিশয় সংক্ষিপ্ত। "গৃহপ্রবেশে"র মধ্যে যে আধুনিক উচ্চতর শ্রেণীর নাটকীয় ক্রিয়া ছিল, তা শারীরিক নয়, সম্পূর্ণরূপেই আন্তরিক। তাই প্রাকৃতজনদের পক্ষে তা হয়েছিল রীতিমত গুরুপাক। রুশিয়ার নাট্যকার লিওনিড আন্দ্রীভ এই শ্রেণীর নাটক-রচনার পক্ষপাতী ছিলেন। শেষ বয়সে আমাদের গিরিশচন্দ্রও এই শ্রেণীর নাটকরচনার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু মৃত্যু তাঁর বাসনা পূর্ণ হ'তে দেয়নি।

ব্যবসায়ের দিক দিয়ে "গৃহপ্রবেশ" জমল না। কিন্তু গৌরবের দিক দিয়ে আর্ট থিয়েটার হ'ল প্রভূত লাভবান এবং যশের দিক দিয়ে অহীন্দ্রের তারকা হ'ল নিরতিশয় ঊর্ধ্বগামী। সবাই বুঝলে, তিনি কেবল বাংলা দেশের একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা নন, কোন কোন বিভাগে সত্য সত্যই অতুলনীয়।

'ষ্টারে' মঞ্চস্থ হ'ল "চন্দ্রগুপ্ত", অহীন্দ্র সেলুকসের ভূমিকায়। প্রথমে সেলুকস সাজতেন প্রিয়নাথ ঘোষ, তারপর কুঞ্জলাল চক্রবর্তী প্রভৃতি। তাঁদের দেখানো সেলুকসের ছবি মুছে দিলে অহীন্দ্রের অভিনয়।

বিজ্ঞাপিত হ'ল, অহীন্দ্র দেখা দেবেন ক্ষীরোদপ্রসাদের "আলমগীর" নাটকের নামভূমিকায়। কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ে ঐ বিশেষ ভূমিকাটিতে অবিস্মরণীয় অসাধারণ অভিনয় ক'রে শিশিরকুমার কিনেছিলেন এমন তুলনাহীন নাম যে, অন্য কোন শ্রেষ্ঠ

অভিনেতাও ওর দিকে লক্ষ্য দৃষ্টিতে তাকাতে সাহস করতেন না। নির্মলেন্দু লাহিড়ীও আলমগীর সেজেছিলেন বটে, কিন্তু মফস্বলে। অহীন্দ্রের দুঃসাহস দেখে সকলেই বিস্মিত। আমিও কৌতূহলী হয়ে নির্দিষ্ট দিনে অহীন্দ্রের অভিনয় না দেখে থাকতে পারলুম না। তারপর অভিনয় দেখে বুঝলুম, তিনি হচ্ছেন দস্তুরমত সুকৌশলী শিল্পী। জানি না যে কোন কারণে তিনি ঐ ভূমিকাটি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন কিনা, কিন্তু শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মতই নিজের মান রক্ষা ক'রে তিনি দিলেন বিশেষ চাতুর্যের পরিচয়। কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পীই যে কোন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করতে পারেন না, যে ভূমিকা রামের উপযোগী, তা শ্যামের উপযোগী না হ'তেও পারে। আলমগীর ভূমিকাটি অহীন্দ্রের উপযোগী ভূমিকা নয়। কিন্তু তবু তাঁর অভিনয় নিরেস হ'ল না। ঐ ভূমিকাটির স্থানে স্থানে সংলাপের মধ্যে আছে যথেষ্ট উচ্ছ্বাস, কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনের দ্বারা শিশিরকুমার যা চমৎকারভাবে অভিব্যক্ত করেন। অহীন্দ্র কিন্তু সেভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশের চেষ্টা করলেন না, তাঁর সংলাপ হ'ল কাটা কাটা। আলমগীর ভূমিকায় তিনি দিলেন একটি সম্পূর্ণ নূতন ধারণা, তাঁর সঙ্গে কেউ শিশিরকুমারের তুলনা করবার অবসরই পেলে না। এমন কি তাঁর রঙ্গসজ্জা পর্যন্ত হ'ল অভিনব।

দ্বিজেন্দ্রলালের জীবদ্দশায় তাঁর "সাজাহন" ও "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকের কয়েকটি ভূমিকার উপযোগী অভিনয় হয়নি। চন্দ্রগুপ্ত, আণ্টিগোনাস ও সেলুকস প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে জীবন্ত ক'রে তুলেছেন নবযুগের অভিনেতারাই। তাঁর "সাজাহানে"র নাম-ভূমিকাকেও সর্বপ্রথমে যথার্থ মর্যাদা দিয়েছেন অহীন্দ্র চৌধুরীই।

আরো কত ভূমিকায় অহীন্দ্র করেছেন স্মরণীয় অভিনয়। এখানে তার ফর্দ দাখিল করা সম্ভব নয়। চলচ্চিত্রক্ষেত্রেও আছে তাঁর ব্যাপক প্রাধান্য। মঞ্চের উপরে এবং পর্দার গায়ে তাঁকে দেখা গিয়েছে যত ভূমিকায়, তত বোধ হয় আর কারুকেই নয়। আজ প্রাচীন বয়সেও তিনি অশ্রান্তভাবে দেখা দিচ্ছেন নানা শ্রেণীর ভূমিকার পর ভূমিকায়। অসাধারণ তাঁর সহনশক্তি। এক এক দিন

দিবাভাগে তিনি যোগ দিয়েছেন চিত্রাভিনয়ে এবং রাত্রে করেছেন একাধিক রঙ্গালয়ে একাধিক ভূমিকায় অভিনয়। কেবল গম্ভীর ও উচ্চশ্রেণীর হাস্যরসাত্মক ভূমিকায় নয়, 'লো-কমিক' অভিনয়েও তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব দেখেছিলুম "লাখটাকা" হাস্যনাট্যের একটি ভূমিকায়।

ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের সুযোগ পেয়েছি অসংখ্যবার। বাকপ্রপঞ্চে অহীন্দ্রের উল্লেখযোগ্য অসাধারণতা নেই বটে, আগে আগে রঙ্গালয়ের অভিনয় শেষ ক'রে প্রায়ই তিনি আমার বাড়িতে পদার্পণ করতেন। হরেক রকম আলাপ-আলোচনায় কেটে যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা, আমাদের অজ্ঞাতসারেই। তারপর যখন রাত্রে 'ডিনার' খেতে বসতুম, তখন হয়তো কলরব করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে ভোরের পাখীরা।

একদিন রাত দুপুরে হঠাৎ আমার খেয়াল হ'ল, কলকাতার কাছাকাছি কোন ডাকবাংলোয় বেড়িয়ে আসতে।

অহীন্দ্র বললেন, "কালকাতার খুব কাছে ডাকবাংলো আছে রাজারহাট বিষ্ণুপুরে।"

বললুম, "চল তবে যাই সেখানে।"

অহীন্দ্রও নারাজ নন। তখনি এল ট্যাক্সি। আমরা যাত্রা করলুম রাজারহাট বিষ্ণুপুরে। উল্লেখযোগ্য ডাকবাংলো নয় বটে, কিন্তু বন্ধুর সান্নিধ্য সব স্থানকেই ক'রে তোলে সুমধুর। সেখানেই রাত কাবার ক'রে ফিরে এলুম পরদিনের ভোরবেলায়।

কিন্তু "তে হি নো দিবসা গতাঃ"।

একুশ

কৃষ্ণচন্দ্র দে

আধুনিক বাংলার লোকপ্রিয় সঙ্গীত-ধুরন্ধরদের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র দে উর্ধ্বাসনের অধিকারী। সে আসনের উচ্চতা কতটা, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই; কিন্তু কোন কোন বিভাগে কৃষ্ণচন্দ্রের আর্ট অতুলনীয় ও অননুকরণীয় হয়ে আছে, একথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না।

বয়সে কৃষ্ণচন্দ্র এখন ষাটের পরের ধাপে এসে পড়েছেন (তাঁর জন্ম ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে)। স্বর্গীয় বন্ধুবর নরেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ীতে প্রথম যেদিন তাঁর গান শুনি, তখন তিনি বয়সে যুবক। সেদিন শিক্ষার্থী হ'লেও তিনি ছিলেন নামজাদা উদীয়মান গায়ক। তারও বহু বৎসর পরে যখন ওস্তাদ ব'লে সর্বত্র সমাদৃত হয়েছেন, তখনও সঙ্গীতকলার প্রত্যেক বিভাগে নতুন কিছু শেখবার জন্যে তাঁকে শিক্ষার্থীর মত আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখেছি। লাটিনে চলতি উক্তি আছে—আর্ট অনন্ত, কিন্তু জীবন হচ্ছে সংক্ষিপ্ত। সংস্কৃতেও অনুরূপ বাণী আছে—"অনন্ত শাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং স্বল্পাশ্চ আয়ুঃবহবশ্চ বিঘ্নাঃ।" এমন শ্রেষ্ঠ শিল্পী আমি কয়েকজন দেখেছি, যাঁরা ভুলে যেতে চান এই পরম সত্যটি। কৃষ্ণচন্দ্র এ শ্রেণীর শিল্পী নন। নিয়তি তাঁকে দয়া করেনি। ভগবান তাঁকে চক্ষুষ্মান ক'রেই পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বাল্য বয়স পর্যন্ত দুই চোখ দিয়ে তিনি উপভোগ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন সুন্দরী এই বসুন্ধরার দৃশ্যসঙ্গীত—আলোছায়ার ছন্দ, ইন্দ্রধনুবর্ণের আনন্দ, কান্তারশৈলের সৌন্দর্য ও চলমান তরঙ্গিনীর নৃত্য। কিন্তু কৈশোরেই বঞ্চিত হন দৃষ্টির ঐশ্বর্য থেকে। জন্মান্ধ চোখের মর্যাদা ততটা বোঝে না। কিন্তু চক্ষুরত্ন লাভ ক'রেও তা থেকে বঞ্চিত হওয়া, এর চেয়ে চরম দুর্ভাগ্য কল্পনা করা যায় না।

বন্ধ হয়ে গেল লেখাপড়া। ভগবানদত্ত দৃষ্টি হারালেন বটে, কিন্তু নিয়তি তাঁর ভগবানদত্ত সুকণ্ঠ কেড়ে নিতে পারলে না। কৃষ্ণচন্দ্র সংগীতসাধনায় নিযুক্ত হয়ে রইলেন একান্তভাবে। ষোলো বৎসর বয়সে স্বর্গত সংগীতবিদ শশিমোহন দে'র শিষ্যত্ব স্বীকার করলেন এবং তারপর সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, গয়ার মোহিনীপ্রসাদ, প্রফেসর বদন খাঁ ও করমতুল্লা খাঁ প্রভৃতির কাছে সাগরেদি ক'রে টপ্পা, ঠুংরী ও খেয়ালে নিপুণতা অর্জন করেন। কীর্তনবিদের কাছে কীর্তন শিক্ষা করেছেন পরিণত বয়সেও। শুনেছি ওস্তাদ জমীরুদ্দীন খাঁও তাঁকে কোন কোন বিষয়ে সাহায্য করেছেন।

অন্ধ হয়ে বিদ্যালয় ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর বাড়ীর লেখাপড়া বন্ধ হয়নি। একাধিক ভাষায় তিনি অর্জন করেছেন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। আলাপ ক'রে বুঝেছি, তাঁর মধ্যে আছে যথেষ্ট সাহিত্যবোধ ও কাব্যানুরাগ—অধিকাংশ ওস্তাদ গায়কের মধ্যে যার অভাব অনুভব করেছি।

প্রথমে পূর্বোক্ত নরেনবাবুর বাড়ীতে এবং পরে বিশ্ববিখ্যাত পালোয়ান শ্রীযতীন্দ্র গুহ বা গোবরবাবুর বাড়ীতে প্রায়ই বসত উচ্চশ্রেণীর গানবাজনার বৈঠক। গান গাইতেন স্বর্গীয় ওস্তাদ জমীরুদ্দীন গাঁ ও কৃষ্ণচন্দ্র। তাঁদের গান শেষ হ'লেও প্রায় মধ্যরাত্রে শরদ নিয়ে বসতেন অনন্যসাধারণ শিল্পী করমতুল্লা খাঁ সাহেব। তবলায় সংগত করতেন স্বর্গীয় দর্শন সিং। সময়ে সময়ে আসর ভাঙ্গত শেষ রাতে। জমীরুদ্দীন ও কৃষ্ণচন্দ্রের গানের ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত।

আমাদের ওস্তাদ গায়কদের গানের গলা হয় অত্যন্ত শিক্ষিত এবং সংগীতকলার কোন কলকৌশলই তাঁদের অজানা থাকে না। শাস্ত্রের সব বিধিনিষেধ মেনে তাঁরা গান গেয়ে যেতে পারেন যন্ত্রচালিতবৎ, কোথাও একটু-আধটু এদিক-ওদিক হ'তে দেখা যায় না। এ হিসাবে তাঁদের নিখুঁত বলতে বাধে না। কৃষ্ণচন্দ্রও আগে গান গাইতেন ঐ ভাবেই।

কিন্তু ক্রমে ধীরে ধীরে বদলে আসে তাঁর গান গাইবার পদ্ধতি। আগেই বলেছি, কৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যে আছে প্রভূত কাব্যরস, মানে না

বুঝে সুরে কেবল কথা আওড়ানো নিয়েই তিনি তুষ্ট হয়ে থাকতে পারলেন না, কথার অর্থ অনুসারে সুরের ভিতরে দিতে লাগলেন চমৎকার ভাবব্যঞ্জনা (expression)। একে নাটকীয় কোন-কিছু (Dramatic) বলুন, বা কল্পপন্থা (Romantic) ব'লেই ধরে নিন; কিন্তু এই পদ্ধতিতে গানের ভিতরে যে যথেষ্ট প্রাণসঞ্চার করা যায়, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। সর্বপ্রথমে বাঙলা গানের ঐ ভাবব্যঞ্জনার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং সেই জন্যেই রবীন্দ্র-সঙ্গীতে কথা ও সুর সর্বদাই আপন আপন মর্যাদা বাঁচিয়ে পরস্পরকে সাহায্য করতে পারে।

গ্রামোফোনের রেকর্ডে বিশ্বনাথ ধামারী, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ও অঘোরনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি স্বর্গীয় সঙ্গীতাচার্যদের বাংলা গান ধরা আছে। সেগুলি শুনলেই উপলব্ধি করতে পারবেন, তাঁদের গানের মধ্যে আছে সুরতাললয়ের প্রচুর মুনশীয়ানা এবং তাঁরা প্রত্যেকেই নিখুঁত গায়ক হিসাবে। কিন্তু যাঁরা গানের শব্দগত ভাবব্যঞ্জনা খুঁজবেন, তাঁদের গানে তাঁরা সে জিনিসটি খুঁজে পাবেন না। ঐ সব সুরে তাঁরা যদি অন্য গানের কথাও ব্যবহার করেন, তাহ'লেও ইতরবিশেষ হবে না। ওস্তাদ গায়কদের মধ্যে সর্বপ্রথমে কৃষ্ণচন্দ্রই গানের এই ভাবব্যঞ্জনার দিকে ঝোঁক দেন। তিনি যখন প্রথম রঙ্গালয়ের সংস্পর্শে আসেন, তখনই এই বিষয়টি বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিশির-সম্প্রদায়ের বা রবীন্দ্রনাথের,—কার প্রভাবে এই পরিবর্তন সাধিত হয় তা আমি বলতে পারি না।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রথম যখন নাট্য-সম্প্রদায় গঠন করেন, তখন দুইজন সঙ্গীতবিদ তাঁর সম্প্রদায়ে যোগ দিয়েছিলেন—স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণচন্দ্র। গুরুদাস ছিলেন কলাবিদ রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দৌহিত্র এবং য়ুরোপীয় সঙ্গীত ও রবীন্দ্র-নাথের গান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন তখন ওস্তাদ গায়কদের অন্যতম। তাঁরা দুজনেই সম্প্রদায়ের প্রথম পালা “বসন্তলীলা”র সুর সংযোজনার ভার গ্রহণ করলেন।

সেই সময়ে গানের ভূমিকা নিয়ে কৃষ্ণচন্দ্রকে রঙ্গমঞ্চের উপরে

দেখা দেবার জন্যেও অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তিনি বড়ই নারাজ, বললেন, "থিয়েটারে গান গাইলে গায়কসমাজে আমার জাত যাবে।" এদেশে যাঁরা বড় গায়ক হ'তে চেয়েছেন, তাঁরা বরাবরই চলতেন রঙ্গালয়কে এড়িয়ে। বাংলা রঙ্গালয়ে যাঁরা সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন—যেমন রামতারণ সান্ন্যাল, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ও দেবকণ্ঠ বাগচী প্রভৃতি—তাঁরা সঙ্গীতবিদ হ'লেও ওস্তাদ-সমাজের অন্তর্গত ছিলেন না। পাশ্চাত্য দেশে দেখা যায় অন্য রকম ব্যাপার। শালিয়াপিন ও ক্যারুসো প্রমুখ গায়করা ওস্তাদ ব'লে অক্ষয় যশ অর্জন করেছেন রঙ্গালয়ের গীতাভিনয়ে ভূমিকা গ্রহণ ক'রেই। ভাগনর প্রমুখ অমর সুরকাররা সুর সৃষ্টি করেছেন রঙ্গালয়ের গীতিনাট্যের জন্যেই।

যা হোক শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণচন্দ্রকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করানো গেল। "বসন্তলীলা" পালায় তিনি রঙ্গমঞ্চের উপরে অবতীর্ণ হয়ে কয়েকখানি গান গেয়ে লাভ করলেন অপূর্ব অভিনন্দন। তার পরে দেখা দিলেন "সীতা" পালায় বৈতালিকের ভূমিকায়। আমার রচিত "অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে" গানটি তাঁর স্বর্গীয় কণ্ঠের গুণে এমন উতরে গেল যে, তারপর থেকে ফিরতে লাগল পথে পথে লোকের মুখে মুখে। কৃষ্ণচন্দ্রেরও ভ্রম ভেঙে গেল। রঙ্গালয়ের সম্পর্কে এসে গায়কসমাজে তাঁর খ্যাতি একটুও ক্ষুণ্ণ হ'ল না, ওদিকে জনসমাজে হয়ে উঠলেন তিনি অধিকতর লোকপ্রিয়।

তাঁকেও পেয়ে বসল থিয়েটারের নেশা। শিশির-সম্প্রদায় থেকে মিনার্ভা থিয়েটারে, তারপর রঙমহলে তিনি কেবল গানের সুর সংযোজনা নিয়েই নিযুক্ত হয়ে রইলেন না, রঙ্গমঞ্চের উপরেও দেখা দিতে লাগলেন ভূমিকার পর ভূমিকায় এবং প্রমাণিত করলেন, দৃষ্টিহারা হয়েও তিনি করতে পারেন উল্লেখযোগ্য অভিনয়। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি কোন না কোন দিক দিয়ে নাট্য-জগতের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক বজায় না রেখে পারেননি। সাধারণ রঙ্গালয় ছেড়েছেন বটে, কিন্তু বাস করছেন চলচ্চিত্রের জগতে। সেখানেও সুর দিয়েছেন, গান শুনিয়েছেন, অভিনয় দেখিয়েছেন,

পরিচালনা করেছেন। তাঁর মধ্যে উপ্ত ছিল যে গুপ্ত নাট্যনিপুণতা, শিশির-সম্প্রদায়ের প্রসাদেই ফলেছে তাতে সোনার ফসল।

এক সময়ে আমি সংগীত রচনার প্রেরণা লাভ করতুম কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকেই। আমার রচিত গান গাইবার জন্যে তিনি অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করতেন এবং আমার কাছ থেকে চাইতেন গানের পর গান। এবং আমিও সমর্পণ করতুম গানের পর গান তাঁর হাতে। শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, জমীরুদ্দীন খাঁ, হিমাংশু দত্ত সুরসাগর ও শচীন্দ্র দেববর্মণ প্রভৃতি আরো বহু শিল্পী আমার অনেক গানে সুর সংযোজন করেছেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র আমার যত গানে সুর দিয়েছেন তার আর সংখ্যাই হয় না। তাঁর গলায় নিজের গান শোনবার জন্যে আমি উন্মুখ হয়ে থাকতুম এবং বাংলার জনসাধারণের ঔৎসুক্যও যে কম ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া যায় আমার দ্বারা রচিত ও কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বারা গীত "নয়ন য' দিন রইবে বেঁচে তোমার পানেই চাইবো গো", "চোখের জলে মন ভিজিয়ে যায় চ'লে ঐ কোন্ উদাসী", "মন-কুসুমের রংভরা এই পিচকারীটি রাধে", "বঁধু চরণ ধরে বারণ করি টেনো না আর চোখের টানে" ও "শিউলী, আমার প্রাণের সখি, তোমায় আমার লাগছে ভালো" প্রভৃতি আরো বহু গানের অসাধারণ লোকপ্রিয়তা দেখে।

হ্যাঁ, কৃষ্ণচন্দ্রের কণ্ঠের ইন্দ্রজাল উপভোগ করবার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকতুম সত্য সত্যই। তিনিও আমাকে হতাশ করতেন না। প্রতি মাসেই অন্ততঃ একবার ক'রে সদলবলে আমার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হতেন এবং আমাকে শুনিয়ে দিতেন গানের পর গান। খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, গজল এবং আমার রচিত বাংলা গান কিছুই বাদ যেত না। কেটে যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা, রাত্রি হয়ে উঠত গভীর, কিন্তু আমাদের কোনই হুঁস থাকত না, হারিয়ে ফেলতুম সময়ের পরিমাপ।

কখনো কখনো পূর্ণিমার রাত্রে তেতলার ছাদের উপরে বসত গানের আসর। নীলাকাশে চাঁদমুখের রূপোলী হাসি, সামনে জ্যোৎস্নাপুলকিত গঙ্গার চলোর্মি-সংগীত এবং সেই সঙ্গে কৃষ্ণ-চন্দ্রের অমৃতায়মান কণ্ঠে সুরের সুরধনী, এই বিচিত্র ত্রয়ীর

মিলনে দৃশ্য ও শ্রাব্য সৌন্দর্যে চিত্ত হয়ে উঠত ঐশ্বর্যময়। পূর্ণিমার সেই বৈঠকে মাঝে মাঝে এসে যোগ দিতেন চিত্রতারকা কল্যাণীয়া শ্রীমতী চন্দ্রাবতী বা অন্য কোন গুণীজন। তাঁদের উপস্থিতি অধিকতর উপভোগ্য ক'রে তুলত বৈঠককে। আজ থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভ্যাবি,—হায়, সে আনন্দের মুহূর্তগুলি আর ফিরে আসবে না। সৌভাগ্যক্রমে কৃষ্ণচন্দ্র আজও বিদ্যমান বটে, কিন্তু আমার সহধর্মিণীর পরলোকগমনের পর ভেঙে গিয়েছে সেই আনন্দের আসর।

যাঁরা ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীত সাধনায় সিদ্ধ হয়ে ওস্তাদ আখ্যা লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে পনেরো আনা লোকই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মর্যাদা রাখতে পারেন না। অনেকে আবার রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে একান্ত নারাজ। কৃষ্ণচন্দ্র এ শ্রেণীর ওস্তাদ নন। তাঁর কণ্ঠে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে আত্মপ্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সঙ্গীতও। কেবল তাই নয়, যে কোন শ্রেণীর সঙ্গীতে আছে তাঁর অপূর্ব দক্ষতা। এথেকেই বোঝা যায়, তাঁর সিদ্ধ সাধনা সর্বতোমুখী।

কৃষ্ণচন্দ্রের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে একজন আজ প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি হচ্ছেন ত্রিপুরার কুমার শ্রীশচীন্দ্র দেববর্মণ।

বাইশ

দেব-দেবী সংবাদ

দেব হচ্ছেন শ্রীনরেন্দ্র এবং দেবী হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণী। দু'জনেই কবি। এমন মানিকজোড়ের মত একসঙ্গে থেকে কাব্য-সাধনা করার দৃষ্টান্ত বাংলা দেশে আর আছে ব'লে জানি না।

গদ্য রচনায় দক্ষ এমন একাধিক দম্পতি এখানে আগেও ছিলেন এবং এখনো আছেন। কিন্তু স্বামী ও ভার্যা দু'জনেই কবিতা লেখেন, এমন দম্পতির নাম স্মরণে আনতে পারছি না। তবে একবার এমন সুযোগের সম্ভাবনা হয়েছিল বটে। আমি সরলা দেবী ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথা বলছি। সরলা দেবীর কবিতা সাময়িক পত্রিকায় দেখেছি। তাঁর "অতীত গৌরবকাহিনী মম বাণী" নামক জাতীয় সঙ্গীতটির কথা তো সকলেই জানেন। গল্পলেখক-রূপে বিখ্যাত হবার আগে প্রভাতকুমারও সাময়িক পত্রিকার ("দাসী") জন্যে কবিতা রচনা করতেন। তিনি যখন জনপ্রিয় গল্পলেখক, তখনও তাঁর কবিতায় রচিত একখানি হাস্যনাট্য ধারাবাহিকভাবে "মর্মবাণী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সরলা দেবীর সঙ্গে প্রভাতকুমারের বিয়ের কথা পাকা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরে পাকা ঘুঁটি কেঁচে যায়।

যে যুগে "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, সেই সময়ে নরেন্দ্র দেবের কবিতা দৃষ্টি আকর্ষণ করত মাঝে মাঝে। কিন্তু তখনও আমরা ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইনি। অথচ পরে জেনেছিলুম, আমাদের এই বন্ধুত্বকে বংশানুক্রমিক বলাও চলে। কারণ নরেনের পিতৃদেব ও আমার পিতৃদেবও ছিলেন পরস্পরের সুহৃদ।

আমার সাহিত্যসাধনা তখন খুব জোর চলছে। একদিকে আমি মাসিক "ভারতী"র সেবক, আর একদিকে দৈনিক "হিন্দুস্থানে"র

প্রাত্যহিক লেখক এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান পত্রিকাতেও আমার রচনা প্রকাশিত হয়। কয়েকখানি গ্রন্থও বাজারে দেখা দিয়ে মন্দ অভ্যর্থনা লাভ করেনি। সেই সময়ই একবার দেওঘরে বেড়াতে গিয়ে নরেনের সঙ্গে হঠাৎ আমার আলাপ-পরিচয় হয়ে গেল। এবং অল্প দিন যেতে না যেতেই আমাদের বন্ধুত্বের বাঁধুনি হয়ে উঠল রীতিমত সুদৃঢ়।

"ভারতী" গোষ্ঠীভুক্ত সাহিত্যিকদের বৈঠক তখন জমজম করছে। সে বৈঠকের বাইরে যে সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার মনের মিল হ'ত, আমি তাঁকেই "ভারতী"র দলভুক্ত হবার জন্যে সাদরে আহ্বান করতুম এবং সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন একাধিক বন্ধু। নরেনও তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আমাদের বৈঠকে এসেই তিনি একেবারে জ'মে গেলেন; হয়ে পড়লেন নিয়মিত সভ্য।

অপূর্ব ছিল আমাদের সেই সাহিত্যসভা, কাব্য, সঙ্গীত ও শিল্প নিয়ে সর্বদাই সেখানে চলত কলগুঞ্জন। আজ যাঁরা সাহিত্যে ও শিল্পে অক্ষয় যশের অধিকারী হয়েছেন, তাঁদের অনেকেই সেই কাব্যকুঞ্জের দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন মধুলোভী ভ্রমরের মত। 'ভারতী'র নিজস্ব দলের কথা ছেড়ে দি (সে দলেরও প্রায় সকলেই আজ সুবিখ্যাত), বাহির থেকেও যাঁরা সেখানে এসে সংলাপে যোগ দিয়েছেন, তাঁরা হচ্ছেন স্বর্গীয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র প্রখ্যাত লেখক দীনেশচন্দ্র সেন, গায়ক কবি অতুলপ্রসাদ সেন, কথ্য ভাষার পুরোধা প্রমথ চৌধুরী, "ভারতী"র ভূতপূর্ব সম্পাদিকা সরলা দেবী, "প্রবাসী" সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, গায়ক দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হাসির কবি সুকুমার রায় চৌধুরী, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শিল্প ও সাহিত্যের আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও কবি নজরুল ইসলাম প্রভৃতি।

ঐ সাহিত্যসভা থেকে আমরা সকলেই লাভ করেছি কত প্রেরণা এবং রচনার নব নব উপাদান। ওখান থেকে কয়েক বৎসরের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে, নাটক, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, রসরচনা ও কবিতা ভূরি পরিমাণেই। ওখানে গিয়ে নিয়মিতভাবে আসন গ্রহণ

করলে লেখকদের রচনাশক্তি প্রবৃদ্ধ হয়ে উঠত অধিকতর। নরেনের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। বেড়ে উঠল তাঁর লেখনীর প্রজনন-শক্তি। তিনি লিখতে লাগলেন রাশি রাশি কবিতা। অন্য শ্রেণীর রচনাতেও করলেন হস্তক্ষেপ।

মাঝে মাঝে আমরা দল বেঁধে কলকাতার বাইরে বেরিয়ে পড়তুম। সাধারণতঃ প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, চিত্রশিল্পী চারুচন্দ্র রায়, "মৌচাক" সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকার, নরেন্দ্র দেব ও আমাকে নিয়েই দল গড়া হ'ত। একবার আমরা কটক ও ভুবনেশ্বর হয়ে পুরীতে গিয়েছি, সেখান থেকে যাব কণারকে। কিন্তু নরেনের জন্যে সে যাত্রা আমাদের আর কণারকে যাওয়াই হ'ল না।

পুরীতে সবাই মিলে সাগরে নেমেছি স্নান করব ব'লে। আমি মন্দ সাঁতার জানি না, এক সময়ে গঙ্গায় এপার-ওপার করেছি। কিন্তু পুরীর অশান্ত সমুদ্রকে ভয় করতুম, সেখানে সাঁতার দেবার ভরসা হ'ত না। প্রেমাঙ্কুর জানেন নামমাত্র সাঁতার, হাঁটু জলের বেশী আর অগ্রসর হ'লেন না। সাঁতারু হিসাবে নরেনেরও কোন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের কথা শুনিনি, অথচ দেখলুম তিনি বেশ সোঁ সোঁ ক'রে সমুদ্রের ভিতরে এগিয়ে যাচ্ছেন। আমরা চীৎকার ক'রে তাঁকে সাঁতারে নিরস্ত হ'তে বললুম, কিন্তু তিনি জলের উপরে হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে আরো বেশী দূর এগিয়ে যেতে লাগলেন। আমরা তখন পর্যন্ত বুঝতে পারিনি যে, নরেন মোটেই সাঁতার দিচ্ছিলেন না, তাঁকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল সমুদ্রের "আণ্ডার কারেণ্ট" বা অন্তঃস্রোত। তারপর আমাদের স্তম্ভিত দৃষ্টির সামনেই নরেনের দেহটা তলিয়ে গেল সমুদ্রের ভয়াবহ "ব্রেকার" বা তটে প্রতিহত ভগ্নোর্মিমালার মধ্যে।

চারিদিকে হৈ হৈ রব। তাবৎ স্নানার্থী সভয়ে তাড়াতাড়ি ডাঙায় উঠে পড়ল। প্রেমাঙ্কুর বালকের মত কাঁদতে লাগলেন। আমরা আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে রইলুম—চোখের সামনে সব অন্ধকার।

কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে যাঁকে রাধারাণী দেবীর কেশবীথির প্রান্তে এঁকে দিতে হবে সিন্দূরের রক্তরাগ, এমনভাবে তাঁকে অকালে

লাভ করতে হবে সলিলসমাধি, নিশ্চয়ই তা ছিল না নিয়তির বিধানে।

"ব্রেকারে"র ওপারে সমুদ্রের জল অত্যন্ত শান্ত ও স্বচ্ছ, তলাকার বালুকাশয্যা পর্যন্ত স্পষ্ট ক'রে দেখা যায়। দৈবগতিকে এবং নরেনের সৌভাগ্যক্রমেই সেখানে সন্তরণে নিযুক্ত ছিল কয়েকজন স্থানীয় বালক। তারাই নরেনের চৈতন্যহীন দেহকে আবার ডাঙায় তুলে আনলে।

হ'তে বসেছিল বিয়োগান্ত দৃশ্যের অবতারণা, নরেন নিজেই তাকে পরিণত করলেন প্রহসনে।

বেলাবালুকার উপরে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে নরেনের অচেতন দেহ। তাঁর দুই চক্ষু মুদ্রিত, মুখ হাঁ করা। তাঁর চারিধার ঘিরে বৃহৎ জনতা। ক্রমে বোঝা গেল, ধীরে ধীরে তাঁর সংবিৎ ফিরে আসছে। একদল মাড়োয়ারী স্ত্রীলোক সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্যে হায় হায় করছিল। হঠাৎ নরেন মিটমিট ক'রে তাদের পানে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "রাম নাম সত্য হায়, রাম নাম সত্য হায়।"

মাড়োয়ারী স্ত্রীলোকরা ক্ষাপ্পা। ভাবলে, বাঙালী বাবুটা লোক ঠকাবার জন্যেই এতক্ষণ ঢং ক'রে প'ড়েছিল। তারা গালাগালি দিতে দিতে চ'লে গেল।

স্বর্গীয় কবি গিরিজাকুমার ও তাঁর ভার্যা সুলেখিকা শ্রীমতী তমাললতা বসু তখন কার্মাটারে বাস করছিলেন। তাঁদের আমন্ত্রণে একবার আমরাও সবাই কার্মাটারে গিয়ে হাজির হলুম। সেইখানেই একদিন তরুণী রাধারাণী আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলেন; তখন তাঁর উপাধি ছিল, 'দত্ত'। তখনই তিনি কাব্যসাধনা সুরু ক'রে দিয়েছেন সাময়িক পত্র-পত্রিকায়। তবে সে সময়েই নরেনের সঙ্গে তাঁর চোখের দেখা উভয়ের মনের মিলনের ভিত্তি রচনা করেছিল কি-না বলতে পারি না, কারণ নরেন সে কথা আমাদের কাছে প্রকাশ করেননি ঘুণাক্ষরেও। প্রথম দিনেই রাধারাণী দেবীর সঙ্গে আলাপ ক'রে আমার মনে হয়েছিল তাঁর মুখে চোখে ও ভাষায় আছে মনীষার প্রভাব। পরে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসবার সুযোগ পেয়ে অধিকতর বদ্ধমূল হয়েছে আমার সেই ধারণা।

সেইবারেই আমাদের একটি বৃহৎ দল কার্মাটার থেকে ঝাঁঝায় গিয়েছিল বনভোজনের আনন্দ উপভোগ করতে। সেখানেও নরেনের প্রাণহানি না হোক্, অঙ্গহানি হবার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়েছিল। সে গল্পটাই বা বাকি থাকে কেন।

সবুজ-মাখানো, পাখী-ডাকানো, ছায়া-দোলানো নিরালা বন-ভূমি, তারই ভিতরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে শৈলের পর শৈল এবং তারই ভিতরে জলবীণা বাজাতে বাজাতে ও সূর্যকরে হীরার হার গাঁথতে গাঁথতে উচ্ছল আমোদে বয়ে চলেছে নৃত্যশীলা তটিনী। বনভোজনের পক্ষে আদর্শ জায়গা। আমাদের সম্মিলিত কণ্ঠের আনন্দ-কলরবে মুখরিত হয়ে উঠল সেখানকার বিজনতা।

কিন্তু আচম্বিতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই হ'ল অভাবিত দৃশ্য-পরিবর্তন। অঝোরে নামল অকালবর্ষা এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—বনে বনে থেকে থেকে ঝড় দোলা দিতে লাগল হেঁকে হেঁকে। দেখতে দেখতে পাহাড়ের গা বয়ে হুড় হুড় ক'রে জল নেমে আসায় ক্ষীণা গিরিনদী হয়ে উঠল একেবারেই দুস্তর। আমাদের সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন মহিলা, তাঁদের নিয়েই সকলে অধিকতর বিব্রত হয়ে পড়লেন। সকলেরই অবস্থা হয়ে উঠল ভিজে বিড়ালের মত।

তারপর যেমন সহসা এসেছিল, তেমনি সহসাই অদৃশ্য হয়ে গেল সেই বনবাসী ঝড়বৃষ্টি। আবার রোদ উঠল। তমাললতা দেবী একটা গাছতলায় খিচুড়ির হাঁড়ি চড়িয়ে দিলেন।

সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নরেন খবরদারি করছেন, হঠাৎ সচমকে দেখি তাঁর পিছন দিকে কোমরের উপরে একটা বৃশ্চিক! তেমন ভয়াবহ, সুবৃহৎ ও হৃষ্টপুষ্ট পাহাড়ে-বিছে জীবনে আমি আর কখনো দেখিনি, কামড়ালে আর রক্ষা নেই!

চেঁচিয়ে উঠলুম, "নরেন, তোমার পিঠে একটা মস্ত বিছে!"

ব্যাস, আর কিছু বলতে হ'ল না, ঝাঁকুনি দিয়ে বিপদকে গা থেকে ঝেড়ে ফেলবার জন্যে নরেন চোখ কপালে তুলে এবং দুই বাহু ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত ক'রে এমন আশ্চর্য নর্তন-কুর্দন সুরু ক'রে দিলেন যে, কোথায় লাগে তার কাছে উদয়শঙ্করের তাণ্ডবনৃত্য!

আমার হাতে ছিল একগাছা বৃহৎ লগুড়—যাকে বলে দস্তুরমত

প্রচণ্ড কোঁতকা, তার এক ঘা খেলে বাঘেরও মাথা ফেটে চৌচির হ'তে পারত।

গিরিজাকুমার হস্তদন্তের মত আমার হাত থেকে ফস্ ক'রে সেই লগুড়গাছা টেনে নিয়ে বিছেটাকে নরেনের পিঠের উপরেই মারবার জন্যে দুই হাতে বেগে সেটাকে শূন্যে তুলে ধরলেন।

"কর কি, কর কি গিরিজা!" ব'লে চেঁচিয়ে সামনে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আমি তাঁর দুই হাত চেপে ধরলুম।

সেই বিষম লগুড় প্রহারে বিছেটা মারা পড়ত বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নিশ্চিতরূপে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যেত নরেনের মাজাও।

তারপর বৃশ্চিকটাকে পিঠের উপর থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হয় এবং নরেনেরও তাণ্ডব নাচ থামে।

বাংলা সাহিত্যে মহিলা কবিদের দান আগেও ছিল, এখনো আছে। কিন্তু আগেকার অনেকের দান ছিল মহার্ঘ্য, এখনকার দান তুল্যমূল্য নয়, উপরন্তু অধিকাংশ স্থলেই সেগুলি একান্ত অকিঞ্চিৎকর। অতি-আধুনিক মহিলা কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কেবল শ্রীমতী উমা দেবী।

রাধারাণী প্রাচীন বা অতি আধুনিক যুগের কবি নন, তাঁর স্থান মধ্যবর্তীকালে এবং তিনি সাড়া দেন আধুনিক যুগধর্মের প্রভাবের মধ্যে থেকেই। অতীত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত কাব্য-সাধনার ভিতর দিয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন তিনি একাধিক যুগ। বাংলা সাহিত্যের দরবারে তাঁর উচ্চাসন আজ কায়েমী হয়ে গিয়েছে এবং নিঃসংশয়ে বলা যায়, জীবিত মহিলা কবিদের মধ্যে আর কেউ নেই তাঁর জুড়ি। আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রবীন্দ্রনাথের মুখে তাঁর মনীষার প্রশস্তি। তিনি ঘনিষ্ঠভাবে আকৃষ্ট করেছিলেন কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্রকেও।

আমার এই ব্যক্তিগত স্মৃতিকথাগুলি সমালোচনা নয়, আমি বড় জোর বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ গুণের দিকে ইঙ্গিত-মাত্র ক'রে ক্ষান্ত হ'তে পারি। রাধারাণী অজস্র কবিতা রচনা করেছেন, তার অধিকাংশই তাঁর 'লীলাকমল', 'বুকের বীণা', 'পুর-বাসিনী', 'বিচিত্ররূপিণী', 'আঙিনার ফুল', 'সীঁথিমৌর' ও

'বনবিহগী' কাব্যপুঁথির মধ্যে আশ্রয় লাভ করেছে। স্বল্প পরিসরে এতগুলি কবিতা পুস্তকের সমালোচনা করতে যাওয়ার মানেই হচ্ছে অসম্পূর্ণতার সাহায্যে সমগ্রকে বোঝাবার চেষ্টা করা। কাজেই সে ব্যর্থ চেষ্টা আর করলুম না।

তবে একটা কথা উল্লেখ করতে পারি। প্রায় দুই যুগ আগে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় শ্রীমতী অপরাজিতা দেবীর অপরিচিত নাম-সংবলিত গার্হস্থ্য কবিতার পর কবিতা প্রকাশিত হ'তে থাকে। একেবারে নতুন ধরণের গার্হস্থ্য কবিতা। পুরুষদের মধ্যে কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন কবিতার পটে অপূর্ব ঘরোয়া ছবি এঁকে এদেশে অতুলনীয় হয়ে আছেন। আরো কেউ কেউ কখনো-সখনো ঘরোয়া ছবি এঁকেছেন বটে, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের মত আর কেউ বিশেষ ঝোঁক দেননি এদিকে। তারপরে—বহুকাল পরে অপরাজিতা দেবীই আবার খুলে বসলেন বিচিত্র গার্হস্থ্য চিত্রশালা। তাঁর অনুপম লিপি-কুশলতায় আমাদের নিত্যদৃষ্ট গৃহস্থালীর ছোট ছোট খুঁটিনাটি-গুলিও কাব্য-সৌন্দর্যে সমুজ্জল হয়ে অভিনব রূপ ধারণ করতে লাগল।

কিন্তু কে এই অপরাজিতা দেবী? তিনি যে নূতন লেখিকা নন, তাঁর পরিপক্ক রচনাচাতুর্যই সে প্রমাণ দেয়। নিশ্চয়ই তিনি সিদ্ধ সাধিকা, কিন্তু তবু এর আগে তাঁর দেখা পাইনি কেন?

বেশ কিছুকাল পরে খোঁজখবর নিয়ে এ প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করলুম। যিনিই অপরাজিতা, তিনিই রাধারাণী। যথেষ্ট বিস্মিত হয়েছিলুম। কারণ রাধারাণীর সঙ্গে অপরাজিতার মিল নেই কিছুমাত্র—কি ভাষায়, কি ছন্দে, কি বিষয়বস্তুতে ও কি বর্ণনা-ভঙ্গিতে। এমন সার্থক আত্মগোপন দেখা যায় না।

তেইশ

দিলীপকুমার রায়

দিলীপকুমারের পিতৃদেব প্রখ্যাত কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের কাহিনী মৎলিখিত 'যাঁদের দেখেছি' পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে। সে বোধ হয় চুয়াল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগেকার কথা—ঠিক তারিখ মনে নেই। সেই সময়েই আমি প্রথম দেখি দিলীপকুমারকে। আমি তখন তরুণ যুবক এবং দিলীপকুমার বালক।

তারিখের কথা ভুলেছি বটে, কিন্তু মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে সেদিনের ছবিটি।

একতলার বৈঠকখানা। উত্তর দিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটি টেবিল, তার সামনে চেয়ারে আসীন দ্বিজেন্দ্রলাল। তাঁর দুই পাশে দণ্ডায়মান পুত্র দিলীপকুমার ও কন্যা মায়া দেবী। পূর্ব দিকে উপবিষ্ট আমরা—অর্থাৎ স্বর্গীয় কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল, 'অর্চনা' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস চন্দ্র, সুকবি শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায় ও আমি।

নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র রাণা প্রতাপসিংহকে অবলম্বন ক'রে একখানি ঐতিহাসিক নাটক লিখতে সুরু করেছিলেন। রচনাকার্য কিছুদূর অগ্রসর হবার পর তিনি খবর পান, দ্বিজেন্দ্রলালও রচনা করেছেন 'রাণা প্রতাপ' নাটক। সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্র লেখনী ত্যাগ করেন। পরে সেই অসমাপ্ত নাটকখানি 'অর্চনা'র কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

কৃষ্ণদাসবাবু 'অর্চনা'র সেই সংখ্যাগুলি দ্বিজেন্দ্রলালের সামনের টেবিলের উপরে স্থাপন করলেন। সাগ্রহে সেগুলিকে টেনে নিয়ে তৎক্ষণাৎ পাঠে নিযুক্ত হলেন বালক দিলীপকুমার।

দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে লাগলেন।

বাংলা দেশের ও বিলাতের অভিনয়কলা নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা এবং স্যর হেনরি আর্ভিংয়ের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের তুলনাও করলেন। স্পষ্ট বললেন, আর্ভিংয়ের চেয়ে গিরিশচন্দ্র নিরেস অভিনয় করেন না।

পিতা যখন অভিনেতা হিসাবে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে আর্ভিংয়ের তুলনায় নিযুক্ত, বালক দিলীপকুমারও তখন যে নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে নিজের পিতাকে তুলনা করতে ব্যস্ত হয়ে আছেন, সেটা টের পাওয়া গেল অবিলম্বেই।

হঠাৎ "অর্চনা" থেকে চোখ তুলে তিনি ব'লে উঠলেন, "বাবা, বাবা, গিরিশবাবুর প্রতাপসিংহের চেয়ে তোমার 'রাণা প্রতাপ' আরো ভালো বই হয়েছে!"

পুত্রের কাছ থেকে এই অযাচিত ও অলিখিত "সার্টিফিকেট" লাভ ক'রে দ্বিজেন্দ্রলাল সহাস্যে মুখ ফিরিয়ে করলেন দিলীপ-কুমারের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত। আমাদের সকলেরই মুখে ফুটল কৌতুকহাসি।

দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি কয়েকবার, কিন্তু আর কোনদিন পিতা ও পুত্রকে একসঙ্গে দেখিনি। দ্বিজেন্দ্রলালের পরলোকগমনের পরেও বহুকাল পর্যন্ত দিলীপকুমারের সঙ্গে আমার চোখোচোখি হয়নি। আবার যখন দেখা হ'ল, আমি তখন প্রৌঢ় ও দিলীপকুমার এসে দাঁড়িয়েছেন যৌবনের প্রান্তভাগে।

ইতিমধ্যে তাঁর খবর পেয়েছি মাঝে মাঝে। মন দিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা করছেন। এ'র-ও'র-তাঁর কাছে গান শিখছেন। গোড়ার দিকে তাঁর একজন সংগীতশিক্ষক ছিলেন বকুবাবু (তাঁর ভালো নামটি ঠিক মনে পড়ছে না, তিনি ছিলেন সুগায়ক এবং সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনেতারূপেও অল্পবিস্তর নাম কিনেছিলেন)। তারপর শুনলুম, দিলীপকুমার য়ুরোপে যাত্রা করেছেন।

য়ুরোপ প্রত্যাগত দিলীপকুমারকে অভিনন্দন দেবার জন্যে রামমোহন লাইব্রেরীতে এক সভার আয়োজন করা হয়। সেইখানে আবার তাঁর দেখা পাই এবং প্রথম তাঁর গান শুনি। এবং সঙ্গে

সঙ্গে তাঁর গানের ভক্ত হয়ে পড়ি। সেইদিনই বুঝতে পারি, সঙ্গীতসাধনায় তিনি সিদ্ধির পথে এগিয়ে গিয়েছেন কতখানি! তাঁর একটিমাত্র গানই তাঁকে উঁচুদরের শিল্পী ব'লে চিনিয়ে দিতে পারে।

তারপর এখানে ওখানে দিলীপকুমারের সঙ্গে দেখা হয়। আলাপ জমে। ক্রমে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। নিজের গানের আসর বসলেই তিনি পত্র লিখে আমাকে আমন্ত্রণ করতে ভোলেন না। আমিও "সঙ্গীতসুধা তরে পিপাসিত চিত্ত" নিয়ে যথাস্থানে হাজিরা দিতে ভুলি না—কখনো একাকী এবং কখনো সপরিবারে। এই ভাবে তিনি যে কতদিন আমাদের আনন্দবিধান করেছেন, তার আর সংখ্যা হয় না।

দিলীপকুমারের সঙ্গীতশিক্ষা সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। তিনি কেবল সুবিখ্যাত সঙ্গীতাচার্যদের কাছে তালিম নিয়ে এলেম লাভ করেননি, গোটা ভারতবর্ষ ঘুরে এখানকার অধিকাংশ প্রথম শ্রেণীর ধুরন্ধর গায়ক-গায়িকার সঙ্গেও সম্বন্ধ স্থাপন করতে পেরেছেন। আমি যখন সাপ্তাহিক "বিজলী"র নিয়মিত লেখক, সেই সময়ে ঐ পত্রিকায় দিলীপকুমারের দেশে দেশে সফরের কাহিনী ও গায়ক-গায়িকাদের বিবরণী প্রকাশিত হ'ত। সেই পরম উপাদেয় রচনাগুলি আমি সাগ্রহে পাঠ করতুম। সেগুলি কেবল সুখপাঠ্য নয়, শিক্ষাপ্রদও বটে। উচ্চাঙ্গের ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে দিলীপ-কুমার যে ধারণা পোষণ করেন, ঐ নিবন্ধগুলির মধ্যে তার বিশদ পরিচয় আছে। অধিকাংশ স্থলেই তাঁর ধারণার সঙ্গে আমার ধারণা মিলে যায় অবিকল।

কিন্তু কেবল ভারতীয় সঙ্গীতেই দিলীপকুমার প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন করেননি, য়ুরোপে থাকতে যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করেছেন পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্বন্ধেও। সেখানেও তিনি শুনেছেন অনেক ভালো ভালো শিল্পীর গান এবং তাঁদের কাছ থেকে শিখেছেনও যে অনেক কিছুই, এটুকু অনুমান করাও কঠিন নয়।

তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত পিতার বিখ্যাত পুত্র—চলতি কথায় যাকে বলে "বাপ কো বেটা"। তাঁর বাবা নাটক, কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছেন,

গান গেয়েছেন ও সুরসৃষ্টি করেছেন। দিলীপকুমারও ঔপন্যাসিক, কবি, প্রবন্ধকার, সুরকার ও গায়ক। নাটকও রচনা করেছেন একাধিক। এদেশে বহু পরিবারেই বংশানুক্রমে সঙ্গীতের অনুশীলন চলে। এ-সব পরিবারের শিল্পীদের বলা হয় "ঘরানা গায়ক"। দিলীপ-কুমারও তাই। কেবল তিনি ও তাঁর পিতা নন্, তাঁর পিতামহ কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ও ছিলেন খ্যাতিমান সঙ্গীতবিদ্।

তাঁর উপন্যাস পেয়েছে শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে প্রশংসা। তাঁর কবিতাও লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তি। কিন্তু আমি হচ্ছি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, ও'দের কাছে আমার মতামত তুচ্ছ। তবু এইটুকুই খালি বলতে পারি, দিলীপকুমারকে আমিও সুলেখক ব'লে গণ্য করি বটে, কিন্তু আমি সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট হই তাঁর গানের দিকেই। তাঁর আসল কৃতিত্ব সঙ্গীতক্ষেত্রেই। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, কাব্য ও চিত্র প্রভৃতিকে যেমন ধ'রে রাখা যায়, গান, নাচ ও অভিনয়-কলাকে তেমন চিরস্থায়ী করা যায় না। গায়কের, নর্তকের ও অভিনেতার জীবনদীপ নেবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের ব্যক্তিগত আর্ট চ'লে যায় মানুষের দেখাশোনার বাইরে। তবু লোক পরম্পরায় মুখে মুখে ফেরে তাঁদের নাম। তানসেন আজও মরেন নি। গ্যারিক আজও অমর। পাবলোভা আজও বেঁচে আছেন। দিলীপকুমারকেও বাঁচতে হবে ঐ সঙ্গীতস্মৃতির জগতেই।

বাংলা গানে তিনি এনেছেন একটি অভিনব ঢঙ বা ভঙ্গি, যা সম্পূর্ণরূপেই তাঁর নিজস্ব। যেমন রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাপদ্ধতি, অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কনপদ্ধতি, শিশিরকুমারের অভিনয়পদ্ধতি ও উদয়শঙ্করের নৃত্যপদ্ধতি সম্যকভাবেই তাঁদের ব্যক্তিগত, অগণ্য পদ্ধতির মধ্যেও তারা স্বয়ংপ্রধান হয়ে বিরাজ করে, দিলীপকুমারের গান গাইবার পদ্ধতিও সেই রকম অপূর্ব। ওস্তাদী "ব্যাকরণে"র দ্বারা কণ্টকিত ও উৎপীড়িত না ক'রেও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের দ্বারা যে সর্বশ্রেণীর শ্রোতার শ্রবণেই মধুবর্ষণ করা যায়, দিলীপকুমারের আসরে আসীন হ'লেই পাওয়া যায় সে প্রমাণ। কি উন্মাদনা আছে তাঁর গানে, কি রসের ব্যঞ্জনা আছে তাঁর সুরে, আর কি কলকণ্ঠের অধিকারী ও দরদী গায়ক তিনি! চিত্তও তাঁর

নিমর্ক্ত, কোন গানই তাঁর কাছে উপেক্ষিত নয়। থিয়েটারি গান ও থিয়েটারি সুর ওস্তাদদের আসরে অচ্ছুৎ হয়ে থাকে, দিলীপকুমার তাকেও আদর ক'রে নিজের কণ্ঠে টেনে নেন। বাংলা রঙ্গালয়ে থিয়েটারি সুরে গেয় গিরিশচন্দ্রের একটি সেকেলে গান আছে— "রাঙা জবা কে দিল তোর পায়ে মুঠো মুঠো"। ঐ গান আর ঐ সুর দিলীপকুমারের কণ্ঠগত হয়ে কি সুধাসুমধুর হয়ে উঠেছে, গ্রামোফোনের রেকর্ডে সে প্রমাণ পাকা হয়ে আছে।

ভালো গায়কের গান শোনবার জন্যে দিলীপকুমারের আগ্রহ সর্বদাই সজাগ। আমার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র সতীশচন্দ্র রায় বহুকাল সঙ্গীতসাধনা ক'রে এখন পরলোকগমন করেছেন। এক সময়ে ভালো গায়ক ব'লে তাঁর প্রচুর পসার ছিল। গ্রামোফোনের রেকর্ডেও প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর অনেকগুলি গান। একদিন তাঁর গান শোনবার জন্যে দিলীপকুমার এলেন আমাদের বাড়িতে। তারপরও একাধিকবার তিনি আমাদের বাড়িতে পদার্পণ করেছেন, তবে পরের গান শুনতে নয়, নিজের গান শোনাতে।

তারপর দিলীপকুমার করলেন সন্ন্যাস গ্রহণ, চ'লে গেলেন পণ্ডিচারীর অরবিন্দাশ্রমে। সেখানকার জন্যে দান করলেন নিজের সর্বস্ব। বোধ করি তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েই আর একজন অতুলনীয় সঙ্গীতশিল্পীও পণ্ডিচেরী যাত্রা ক'রে একেবারেই ভেস্তে গিয়েছেন, তাঁর নাম শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু সুখের বিষয় যে দিলীপকুমার সন্ন্যাসী হয়েও সঙ্গীত ও সাহিত্যকে ত্যাগ করেননি।

পণ্ডিচেরীতে গিয়েও আমার সঙ্গে তিনি সম্পর্ক তুলে দেননি। একাধিক পত্রিকার সম্পাদকরূপে যখনই তাঁর রচনা প্রার্থনা করেছি, তখনই তা পেয়েছি। তাছাড়া আমাকে তিনি পত্র লিখতেন প্রায়ই এবং আমাকেও পত্র লেখবার জন্যে অনুরোধ করতেন। তাঁর বহু পত্রই আমি রক্ষা করেছি, সেগুলির মধ্যে আছে সাহিত্য ও সঙ্গীতের কথা। নিজের কথাও আছে। তাঁর একখানি সুদীর্ঘ পত্রের অংশ-বিশেষ এখানে তুলে দিলুম—পত্রের তারিখ হচ্ছে ঊনত্রিশে নভেম্বর, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দঃ

"প্রিয়বরেষু,

আপনার পত্র পেয়ে খুব হাসলাম। আপনার কবিতা ("ছন্দা"র) বেশ লেগেছিল। আপনার গানগুলি পেয়ে সুখী হলুম। দেখব কি করা যায়। সুর মাথায় না এলে মুস্কিল। কিন্তু আপনার আরো কয়েকটা গান পাঠাবেন। প্রেমের গানও দু একটা পাঠাবেন কিন্তু—আমি প্রেমের গান যে একেবারেই গাই না বললে সত্যের অপলাপ করা হয়। সেদিন Chopin-এর একটি জর্মন গানের অনুবাদ করেছি, আপনাকে পাঠাচ্ছি—ঐ ছন্দে মিলে সুরে। যদি ভালো লাগে "ছন্দা"য় ছাপাবেন। কিন্তু ভালো না লাগলে দোহাই ধর্ম, ছাপাবেন না—আমি কিছু মনে করব না।

দেখুন প্রিয়বর, একটা কথা ব'লে রাখি অত্যন্ত সরল বিনয়ে। কাব্যজগতেও আমি সাধ্যমত সত্যপন্থী হ'তে চেষ্টা করি। কিন্তু ফলে অনেক বন্ধু হারিয়েছি—কারুর কারুর কাব্যকে ভালো বলতে না পারার দরুণ। আপনার বন্ধুত্ব আমার কাছে সত্যই কাম্য বলেই ভয় হয়, পাছে আপনার সব গানকে ভালো বলতে না পারলে আপনিও আমাকে বিসর্জন দেন। আপনার একজন প্রিয় কবির কবিতা আমার ভালো লাগে না। তিনি আমাকে বহু উপরোধ করেছেন তাঁর কাব্য সমালোচনা করতে—আমি করতে পারিনি—যদিও তাঁর কাজের কোথাও নিন্দা করিনি—কিন্তু তিনি চ'টে গেলেন মোক্ষম।...... আমার গান কবিতা কিছুও যদি আপনার ভালো না লাগে তবু আপনার প্রীতিকে আমি সমানই চাইব, কেননা আমি সার বুঝি ভালোবাসার অহেতুক স্নেহকে। আপনি আমাকে স্নেহ করেন এইটুকুই আমি চাই—আর কিছু না।......প্রগলভতা মার্জনা করবেনঃ তবে আপনি প্রবীণ লোক, অনেক দেখেছেন শুনেছেন, কাজেই মনে হয় বুঝবেন আমার সঙ্কোচ ও আক্ষেপ। পুজোর সংখ্যা "ছন্দা" একখানা আমাকে পাঠাবেন? যেখানা পাঠিয়েছিলেন সেটি রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন, তাঁর কাছেই আছে" প্রভৃতি।

কিন্তু আমার ভাগ্যে সে দিলীপকুমার আজ একেবারেই বদলে গেছেন। পত্রালাপ বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। কলকাতায় এলেও খবর নেন না বা গানের আসরে আমন্ত্রণ করেন না। কারণ ঠিক জানি

না। তবে একটা কারণ হয়তো এই: কয়েক বৎসর আগে তাঁর রচিত "উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল" পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের সংগীত সম্বন্ধে যথেষ্ট অন্যায্য মতামত প্রকাশ করা হয়েছিল। গুরুস্থানীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে সে সব উক্তি আমি মেনে নিতে পারিনি, আমিও কয়েক সপ্তাহ ধ'রে "দৈনিক বসুমতী"তে তার প্রতিকূল আলোচনা করেছিলুম। দিলীপকুমারের অভিমানের কারণ হয়তো তাই। উপরের পত্রে লিখেছেন, সত্যপন্থী হয়ে তিনি অনেক বন্ধুকে হারিয়েছেন। ঠিক অনুরূপ কারণেই আমিও হারিয়েছি তাঁর বন্ধুত্ব। কিন্তু তবু আমি তাঁর অসাধারণ সংগীত-প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করি। আজও তাঁকে আমি আগেকার মতই ভালোবাসি। সাহিত্যিক বাদ-প্রতিবাদকে ব্যক্তিগত জীবনে টেনে আনতে আমি অভ্যস্ত নই।

চব্বিশ

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

অনেককেই তো দেখলুম—কবি, ঔপন্যাসিক, সম্পাদক, চিত্রকর, ঐতিহাসিক, গায়ক-গায়িকা, নট-নটী, নর্তক—এমন কি মল্ল পর্যন্ত। কিন্তু আধুনিক কোন নাট্যকারের সঙ্গে এখনো পাঠকদের পরিচিত করা হয়নি।

বাংলা নাট্যজগতে স্মরণীয় অবদান রেখে গিয়েছেন মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু, মনোমোহন বসু, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও অমৃতলাল। প্রথমোক্ত দুইজনকে কখনো চোখে দেখবারও সৌভাগ্য হয়নি। বাকি কয়েকজনের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছি এবং তাঁদের কথা নিয়ে অন্যত্র আলোচনাও করেছি।

এটা বাংলা দেশের জল-বাতাসের গুণ কি না জানি না, কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য ক'রে বিস্মিত হ'তে হয়। এখানে নানা বিভাগে যাঁদের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়, বরণীয় ও অতুলনীয়, তাঁরা আত্মপ্রকাশ করেছেন প্রথম দিকেই। রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা পরে পরে পেয়েছি যে সব শক্তিধরকে, আজ তাঁদের সঙ্গে তুলনা করবার মত মানুষ গোটা বাংলা দেশ খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। তুলনা করব কি, বাংলার রাজনীতি আজ প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছে বললেও চলে। কথাসাহিত্যেও আমরা পরে পরে পেয়েছি বঙ্কিম-চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে। আধুনিক কথা-সাহিত্যিকদেরও লেখনী প্রসব করছে কাঁড়ি কাঁড়ি রচনা, কিন্তু সেগুলি ধারে কাটে না ভারে কাটে সে কথা 'বুঝ নর যে জান সন্ধান'! চিত্রকলার ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও যামিনী রায় প্রভৃতিকে সমসাময়িক বলতে পারি। কিন্তু তার পরেই বাংলা চিত্রশিল্পের ধারা হয়ে পড়েছে ক্ষীয়মাণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধ থেকে

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত বাগ্মিতার জন্যে বাংলা দেশ ছিল বিখ্যাত। কিন্তু এখন? কেশবচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র প্রভৃতির বাগবৈদগ্ধের কথা ছেড়েই দি, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল বসুর মত বৈঠকী-সংলাপ জমিয়ে তুলতে পারেন, এমন লোকও আজ দুর্লভ। আরো নানা বিভাগের কথা তোলা যেতে পারে, কিন্তু পুঁথি না বাড়িয়ে কেবল নাট্য-বিভাগের দিকেই দৃষ্টিপাত করা যাক।

এদেশে আমরা যাঁদের প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার ব'লে মনে করি, তাঁদের কেহই আধুনিক যুগের মানুষ নন। সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ে নবযুগ আসবার আগেই তাঁদের দান ফুরিয়ে গিয়েছিল। শিশিরকুমারের আবির্ভাবের পরেও ক্ষীরোদপ্রসাদ কিছুদিন লেখনী চালনা করেছিলেন বটে, কিন্তু তার আগে থেকেই তাঁর শক্তি হয়ে পড়েছিল যথেষ্ট রিক্ত। "আলমগীর" অবলম্বন ক'রেই শিশিরকুমার দেখা দিয়েছিলেন। কিন্তু ও-নাটকখানি বিখ্যাত হয়েছে নাটকত্বের জন্যে নয়, শিশিরকুমারের অভিনয়গুণেই। আসলে গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা নাটকের স্বর্ণযুগ অতীত হয়ে গিয়েছিল। শিশিরকুমারের "নাট্যমন্দির" যখন চলছে, তখন অমৃতলাল ী" নামে একখানি উৎকৃষ্ট নাটক আমাদের উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু ও-রকম একটি কি দুটি রচনা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

গিরিশোত্তর যুগ হচ্ছে বাংলা নাট্যজগতের অন্ধ-যুগ। শিশিরকুমারের আবির্ভাবের আগে এক যুগের মধ্যে একজনমাত্র উল্লেখযোগ্য নূতন অভিনেতার দেখা পাওয়া যায় নি; এবং সাড়া পাওয়া যায় নি একজনমাত্র প্রথম শ্রেণীর নূতন নাট্যকারেরও। এ সময়ে নাটক রচনা ক'রে সুপরিচিত হয়েছিলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, নিশিকান্ত বসু, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীদাশরথি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। এ'দের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনজন ছিলেন প্রায় তুল্যমূল্য। তাঁদের রচনাও ছিল অপেক্ষাকৃত উন্নত। নির্মলশিবেরও কোন কোন রচনা হয়েছিল সহনীয়। বাকি

তিনজন ছিলেন সবচেয়ে লোকপ্রিয় এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীর। তাঁদের নাটকে ছিল না কোন মহৎ ভাব বা নিজস্ব রচনাভঙ্গি। কিন্তু হেটো দর্শকদের গ্রাম্য মনোবৃত্তিকে উত্তেজিত করবার কৌশল আয়ত্তে এনে তাঁরা বাজার একেবারে দখল ক'রে ফেলেছিলেন। কৌতূহলী হয়ে সাহস সঞ্চয় ক'রে ওঁদের তিনজনেরই এক-একখানি নাটকের অভিনয় আমি দেখতে গিয়েছিলুম, কিন্তু তারপরেই আমার কৌতূহল দস্তুরমত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তেমন সব ওঁচা রচনাও যে রঙ্গালয়ের মালিকের সামনে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার খুলে দিতে পারে, সে জ্ঞান আমার ছিল না। তারপরে বহু রাত্রেই রঙ্গালয়ের নেপথ্যে উপস্থিত ছিলুম। মঞ্চের উপরে "বঙ্গে বর্গী" প্রভৃতির অভিনয় চলেছে, কিন্তু কোনদিনই প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে বসবার আগ্রহ হয় নি।

কিন্তু কেবল রাবিসের পর রাবিসের দ্বারা কতদিন একটা জাতির চিত্ত আচ্ছন্ন ক'রে রাখা যায়? দিনে দিনে লোকের চোখ ফুটতে লাগল। প্রেক্ষাগারে শিক্ষিত দর্শকের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ শ্রেণীর পালার চাহিদা কমে এল। বোধ করি নাট্যকারের জনপ্রিয়তা দেখেই শিশিরকুমারও এই দলের একজনের একটি পালা মঞ্চস্থ করেছিলেন। কিন্তু দর্শকেরা তখন সচেতন হয়ে উঠেছে। শিশিরকুমারের প্রতিভাও পালাটিকে দীর্ঘায়ু করতে পারে নি।

"বঙ্গে বর্গী" ও "মোগল-পাঠান" প্রভৃতি নাটকের আসর মাটি হ'ল বটে, কিন্তু নূতন যুগের নূতন নাট্যকারের সাড়া পাওয়া গেল না। অপরেশচন্দ্র, বরদাপ্রসন্ন ও ভূপেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগ দিলেন যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, ওঁরা সকলেই প্রায় সমশ্রেণীর নাট্যকার। এই সময়ে একাধিক রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি নাটক উপর-উপরি অভিনীত হয়। "চিরকুমার সভা", "শোধবোধ", "পরিত্রাণ", "বিসর্জন" ও "শেষরক্ষা" প্রভৃতি। তার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের "গৃহদাহ", "ষোড়শী"। গিরিশোত্তর যুগে এই সময়ে প্রথম রঙ্গালয়ে নাটকের মান বেড়ে ওঠে।

শ্রীমন্মথ রায়ও প্রবেশ করলেন নাট্যজগতে। তাঁর ভাষা ও রচনাভঙ্গি প্রশংসনীয় হ'লেও তাঁর নাটকীয় বিষয়বস্তু ছিল না

আধুনিক। ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্তও একাধিকবার নাট্যজগতে দেখা দিয়েও শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকলেন না। কবি শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়ও নাট্যকাররূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। এসেছিলেন আরো কেউ কেউ, কিন্তু আসর বেশীদিন রাখতে পারেন নি।

বাংলা নাটকের যখন শোচনীয় দুরবস্থা, সেই কুখ্যাত 'মনোমোহন' আমলেই এখানে নূতন নাট্যকার রচিত নবযুগের উপযোগী প্রথম নাটক অভিনীত হয় ১৯২২ খৃষ্টাব্দে। ম্যাডানদের রঙ্গালয়ে খোলা হয় স্বর্গীয় সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের "মুক্তার মুক্তি"। কিন্তু একে শিশিরকুমারকে সদ্য হারিয়ে ম্যাডানদের রঙ্গালয় তখন গৌরবচ্যুত হয়ে পড়েছে, তার উপরে "বঙ্গে বর্গী" ও "মোগল-পাঠানে"র কোলাহলে নাট্যজগৎ এমন পরিপূর্ণ হয়েছিল যে, এই চমৎকার পালাটির দিকে লোকের দৃষ্টি ভালো ক'রে আকৃষ্ট হয় নি। মণিলালের মধ্যে সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট, কিন্তু তিনি অকালেই পরলোকগমন করেন।

এখানে আধুনিক যুগোপযোগী দ্বিতীয় নাটক হচ্ছে শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "রক্তকমল"। চিত্রজগতে সুপরিচিত স্বর্গীয় অনাদিনাথ বসু যখন মনোমোহন থিয়েটারের ভার গ্রহণ করেছেন, সেই সময়েই সেখানে এই পালাটি মঞ্চস্থ হয়। নাটকখানি আমার ভালো লেগেছিল এবং নাট্যমার্গ ত্যাগ না করলে শচীন্দ্রনাথ যে এ বিভাগে স্মরণীয় অবদান রেখে যাবেন, এটাও মনে মনে বুঝতে পেরেছিলুম।

শচীন্দ্রনাথ যখন সাপ্তাহিক "বিজলী" পত্রিকার সম্পাদক এবং আমি তার নিয়মিত লেখক, সেই সময়েই আমরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলুম। কিন্তু সে কেবল মৌখিক পরিচয়। তখন তিনি ছিলেন সাংবাদিক। নাট্যজগৎ যে তাঁর কাছ থেকে কিছু আশা করতে পারে, একথা আমি জানতুম না এবং তিনি নিজেও বোধ হয় জানতেন না।

যতদূর মনে পড়ছে, সুলিখিত ও সুঅভিনীত হ'লেও এবং প্রশংসা অর্জন ক'রেও "রক্তকমল" উচিতমত অর্থ অর্জন করতে পারে নি। তখনকার দিনে নাটক আকারে মস্ত এবং ওজনে

গুরুভার না হ'লে জনসাধারণের চিত্তরোচক হ'ত না। সামাজিক নাটকের একেলে ভঙ্গিও বোধ করি দর্শকদের ভালো লাগত না। এই কারণে শচীন্দ্রনাথের আরো কোন কোন উৎকৃষ্ট রচনা লোকপ্রিয় হয় নি। যেমন "ঝড়ের রাতে" ও "জননী"। বাঙালী দর্শকদের এই অদ্ভুত মনের ভাব আজও পরিবর্তিত হয় নি। এই সেদিনেও "শ্রীরঙ্গমে" অভিনীত পরম উপাদেয় সামাজিক নাটক "পরিচয়" রসিকজনদের খুশি ক'রেও সাধারণ দর্শকদের অভিনন্দন পায় নি। আমাদের জনসাধারণের মন বুড়িয়ে পড়েছে। তারা আজও চলতে চায় সেকেলে বাঁধা রাস্তা ধ'রে, নতুন পথে পা বাড়াতে ভরসা করে না।

কিছুদিন পরে মনোমোহন থিয়েটারের পরিচালক ও মালিক হলেন বন্ধুবর শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহ। প্রথমেই খুললেন শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "জাহাঙ্গীর" এবং তারপর শ্রীমন্মথ রায়ের "মহুয়া"। আমাকেও গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলেন তাঁর রঙ্গালয়ে নৃত্য-পরিকল্পনার জন্যে। শচীন্দ্রনাথও সেখানে নিয়মিতভাবে আনা-গোনা করতেন এবং অল্পকালের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে উঠল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

তারপর সেখানে শচীন্দ্রনাথের "গৈরিক পতাকা" খোলবার আয়োজন হয়। প্রথমে আমার মনে সন্দেহ জেগেছিল, গিরিশচন্দ্রের "ছত্রপতি"র পর শিবাজীকে অবলম্বন ক'রে রচিত আর কোন নাটক দর্শকরা গ্রহণ করবে কি না? কিন্তু পাণ্ডুলিপি পাঠ ক'রে সে সন্দেহ দূর হ'ল। যদিও নাটকখানি পুরাতন আদর্শেই রচিত, তবু তার আখ্যানে নূতনত্ব ও চরিত্রচিত্রণে নিপুণতা ও ভাষায় বিষয়োপযোগী দৃঢ়তা এবং গাম্ভীর্যের পরিচয় পেলুম যথেষ্ট।

পালাটি মঞ্চস্থ করবার জন্যে প্রবোধবাবু প্রচুর পরিশ্রম, অর্থব্যয় ও আয়োজন করেছিলেন। গান রচনা ও নৃত্য পরিকল্পনার ভার পড়েছিল আমার উপর (এবং কোন কোন গানে সুরও দিয়েছিলুম আমি)। তারপর থেকে "নাট্য-নিকেতনে" অভিনীত শচীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকেই আমাকে ঐ দুটি কর্তব্য পালন করতে হয়েছে। যেন একটা বাঁধা-ধরা নিয়ম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে, শচীন্দ্রনাথের

লেখনী নূতন নাটক প্রসব করলেই গান লিখতে ও নাচ দিতে হবে আমাকেই।

তোড়জোড় দেখেই অনুমান করতে পেরেছিলুম, "গৈরিক পতাকা" মন্দ চলবে না। তবে খুব একটা বড় কিছুর আশা করি নি। কিন্তু পালাটি খোলার সঙ্গে সঙ্গেই যে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করলে, সেটা আমরা কেহই কল্পনাতেও আনতে পারি নি। ঐ বাড়ীতেই "সীতা" খোলা হয় এবং তার অসামান্য লোকপ্রিয়তার কথা কারুর কাছেই অবিদিত নেই। কিন্তু "গৈরিক পতাকা" দেখবার জন্যে প্রথম কয়েক রাত্রে প্রেক্ষাগৃহে যে মহতী জনতা সমাগত হয়েছিল তার নিবিড়তা ছিল "সীতা"র চেয়েও বেশী। বিডন ষ্ট্রীট দিয়ে খানিকক্ষণের জন্যে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যেত এবং ভিড় সামলাবার জন্যে পুলিসবাহিনী মোতায়েন রাখতে হ'ত। জনতাকে নিয়মিত করবার জন্যে রঙ্গালয়ের অঙ্গনেও বাঁশের বেড়া বাঁধতে হয়েছিল।

"গৈরিক পতাকা" শচীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা নয়। তিনি তার চেয়ে ভালো একাধিক নাটক রচনা করেছেন। তার গঠন ও আবেদনও অল্পবিস্তর মামুলী। হয়তো সেইটেই তার কাজে লেগে গিয়েছে। আগেই ইঙ্গিতে বলেছি, এদেশী দর্শকদের মন আজও অতি-আধুনিক বাস্তব নাটকের জন্যে প্রস্তুত হয়ে ওঠে নি। নবযুগেও এখানে যে সব নাটক (কর্ণার্জুন, সীতা, আত্মদর্শন, দিগ্বিজয়ী ও গৈরিক পতাকা) সবচেয়ে লোকপ্রিয় হয়েছে, তার কোনখানিরই রচনা-পদ্ধতি আধুনিক নয়। "কিন্নরী"র মত নিম্নশ্রেণীর নাটকেরও পুনরভিনয় দেখবার জন্যে আজও বাংলা রঙ্গালয়ে ভিড় ভেঙে পড়ে।

প্রায় পঁচিশ বৎসর আগে খোলা হয়েছিল "গৈরিক পতাকা", কিন্তু আজও লোকে তাকে দেখতে চায়। অভিনয়ের দিক দিয়ে, নাচ-গানের দিক দিয়ে এবং সাজপোশাক ও দৃশ্যপটাদির দিক দিয়ে "গৈরিক পতাকা" তার পূর্বগৌরব হারিয়ে ফেলেছে, তবু এখনো বিভিন্ন রঙ্গালয়ে তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি চলে।

নাট্য-সমালোচকরা যখন তখন দাবি করেন—নূতন যুগের জন্যে চাই নূতন আদর্শের নাটক। কিন্তু তাঁদের সে দাবি মিটবে কেমন

ক'রে? দাবিদারদের কথামত কাজ করতে গেলে রঙ্গালয়ের পর রঙ্গালয়ে নিবে যাবে সাঁঝের বাতি—যেমন নিবে গিয়েছিল "নাট্যমন্দিরে", রবীন্দ্রনাথের "তপতী" খুলে।

শচীন্দ্রনাথ নূতন যুগের উপযোগী নূতন আদর্শের নাটক রচনা করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ "ঝড়ের রাতে"র নাম করতে পারি। পরিকল্পনা, সংলাপের ভাষা, ভাববৈচিত্র্য, চরিত্রচিত্রণ ও আখ্যানবস্তু প্রভৃতি সব দিকেই নাট্যকারের বিশেষ মুনশীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীও সম্পূর্ণ আধুনিক। শ্রীসতু সেন দৃশ্য পরিকল্পনাতেও প্রভূত আধুনিকতা প্রকাশ করেছিলেন এবং স্বর্গীয় রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী ও নীহারবালা প্রভৃতির অভিনয়ও হয়েছিল অনবদ্য। তবু নাটকখানি বেশীদিন চলেনি। তাঁর "জননী" সম্বন্ধেও ঐ কথা। আরো দুই-তিনখানি নাটকেও শক্তির পরিচয় দিয়েও দর্শকদের হৃদয় হরণ করতে না পেরে, অবশেষে তিনি পুরাতন পদ্ধতিতেই রচনা করলেন "সিরাজদ্দৌলা" এবং সঙ্গে সঙ্গে সার্থক হ'ল তাঁর পরিশ্রম। নাবালক সিরাজের ভূমিকায় বৃদ্ধ নির্মলেন্দু, তাও লোকের চোখে বিসদৃশ ঠেকল না, রাত্রির পর রাত্রি প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল বিপুল জনতায়। "গৈরিক পতাকা"র মত "সিরাজদ্দৌলা"রও পুনরভিনয়ের আয়োজন হয় বিভিন্ন রঙ্গালয়ে। শচীন্দ্রনাথের সমগ্র নাটকাবলীর মধ্যে এই দুটি পালাই যেন প্রধান হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাঁর যে সব নাটক উচ্চতর শ্রেণীর, তা প্রায় অবজ্ঞাত বা উপেক্ষিত হয়ে আছে। বাঙালী নাট্যকারদের কপাল এমনি পাথরচাপা।

শচীন্দ্রনাথ কেবল বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও নব যুগধর্মের পুরোধা নন, বর্তমান কালের প্রধান নাট্যকার ব'লে পরিচিত করতে গেলে তাঁর ছাড়া আর কারুর নাম মনে ওঠে না।

পঁচিশ

ইন্দুবালা

সমাজ-বহির্ভূত সমাজে যে সব কন্যা জন্মগ্রহণ করে, সংগীতের দিকে তারা আকৃষ্ট হয়ে আসছে বোধ হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই। অন্ততঃ ঐতিহাসিকরা যখন যবনিকা তুলে সেকেলে পৃথিবীকে দেখাতে শুরু করেছেন, তখন থেকেই আমাদের চোখে পড়ে এমন এক শ্রেণীর নারী দেহকে পণ্যে পরিণত করেছে ব'লেই যারা বিখ্যাত হয়নি, যাদের খ্যাতির আসল কারণ হচ্ছে সংগীত, কাব্য, নৃত্য এবং অন্যান্য কলাবিদ্যায় পারদর্শিতা। প্রমাণ গ্রীক যুগের সিন্থিয়া, ন্যাথাইনা, লেইস, থেইস, ফিলিস ও ফ্রাইন এবং রোম্যান যুগের হিস্পালা ও থিয়োডোরা প্রভৃতি একাধারে সুখ্যাত ও কুখ্যাত নারীগণ। তাঁদের মরদেহ কবে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সাহিত্যে, ইতিহাসে ও শিল্পে অক্ষয় হয়ে আছে তাঁদের গুণাবলীর অমর স্মৃতি।

আমাদের রামায়ণ ও মহাভারতেও বারংবার উল্লিখিত হয়েছে এই শ্রেণীর নারীদের কথা এবং ইন্দ্রসভার বিখ্যাত কলাবতী অপ্সরাদেরও এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা যায়। গণিকা আজ ঘৃণ্য নামে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আগে পতিতা বেশ্যা বলতে গণিকা বোঝাত না, সত্যকার গণিকা ছিল উচ্চতর শ্রেণীর জীব, এবং সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্রী। বাৎস্যায়নের কামসূত্রের তৃতীয় পরিচ্ছেদের বর্ণনা পাঠ করলে জানা যায়, চৌষট্টি কলায় দখল না থাকলে কেউ গণিকা নাম গ্রহণ করতে পারে না। কেবল দৈহিক সৌন্দর্যের জন্যে নয়, মনীষা এবং সর্ববিধ কলাবিদ্যায় দক্ষতার জন্যে গণিকারা জনসমাজে লাভ করে রীতিমত উচ্চাসন এবং রাজারাজড়ারা ও দেশ-বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাদের দেন অভিনন্দন। তারা হচ্ছে সকলের চোখের ধ্রুবতারা।

ভরতও তাঁর নাট্যশাস্ত্রে বলেছেন, গণিকাকে হ'তে হবে চৌষট্টি কলায় (এবং বিশেষ ক'রে নৃত্য-গীতে), জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও সাহিত্যে অভিজ্ঞ।

একালের কেউ কি বলতে পারেন, "আমার ছেলের জন্যে গণিকার মত বউ ঘরে আনব?" কিন্তু "ললিতবিস্তরে" (লেফ-ম্যানের সংস্করণে) দেখি, রাজা শুদ্ধোধন বলছেন, যুবরাজ সিদ্ধার্থের জন্যে আমি এমন এক বধূ চাই, যে গণিকার মত সকল রকম কলাবিদ্যায় নৈপুণ্য প্রকাশ করতে পারবে।

প্রাচীন ভারতের সিরিমা, সুলাশা, বাসবদত্তা, শ্যামা, পদ্মাবতী, অর্ধকাশী ও অম্বাপালী প্রভৃতি গণিকার নাম সাহিত্যে বিখ্যাত হয়ে আছে। কোন কোন গণিকা ভগবান বুদ্ধদেবেরও করুণা লাভ করতে পেরেছিলেন। অম্বাপালী কবিরূপেও বিখ্যাত। বৌদ্ধ "থেরীগাথা"র মধ্যে আজও তাঁর রচনার অস্তিত্ব আছে।

কেবল প্রাচীনকালে নয়, আধুনিক সভ্যতা যখন বিলক্ষণ শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে উঠেছে সেই সপ্তদশ শতাব্দীর ফ্রান্সেও দেখি, মেরিয়ন ডি লোম ও নিন ডি লেনক্লোস প্রভৃতি বহু গণিকার বাড়ি হয়ে উঠেছে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও বিদ্বজ্জনদের তীর্থের মত। সকলে সেখানে প্রকাশ্যে যাতায়াত করলেও নিন্দিত হতেন না। নিনন ছিলেন গুণী ও গুণগ্রাহী। বালক ভলতারের সঙ্গে আলাপ ক'রে খুশি হয়ে তিনি কেতাব কেনবার জন্যে তাকে অর্থদান করেছিলেন। অমন যে 'পিউরিটান' কবি টেনিসন, তিনিও স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করবার জন্যে ফ্রান্সে গিয়ে এক বিখ্যাত গণিকার বাড়ী বেছে নিতে ইতস্ততঃ করেননি।

আসল কথা, গণিকা হ'লেই কেউ অস্পৃশ্য জীবে পরিণত হয় না; মানুষ করে গুণের আদর। চরিত্রহীন ব'লে কেউ ভিলন, ভার্লেন, বাইরণ ও অস্কার ওয়াইল্ডকে দূরে পরিহার করেনি, বিশ্ব শ্রদ্ধাভরে প্রণত হয় তাঁদের কবিখ্যাতির সামনে। প্রত্যেক শ্রেণীর শিল্পীর সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। আমরা নীরত্যাগী ও ক্ষীরগ্রাহী মরালের মত দোষ বর্জন ক'রে তাঁদের গুণ গ্রহণ করি।

বাংলা দেশে আগে সঙ্গীতনিপুণা ব'লে ভদ্রমহিলাদের বিশেষ

খ্যাতি ছিল না। সঙ্গীত বিভাগের ভার গ্রহণ করেছিলেন সমাজ-বহির্ভূত সমাজেরই কন্যাগণ। বাড়ীতে ব'সেও উচ্চ শ্রেণীর গান শুনতে হ'লে ধনীরা করতেন বাইজীদের আমন্ত্রণ। মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ অতটা উচ্চে উঠতে পারতেন না, বাড়ীর কোন ক্রিয়াকর্মের সময়ে তাঁরা বায়না দিতেন খেমটাওয়ালীদের। আজকাল ভদ্র পরিবারে নাচগানের রেওয়াজ খুব বেড়েছে ব'লে বাইজী এবং খেমটাওয়ালীদের পসার একরকম নেই বললেও চলে। কিন্তু আমাদের বাল্যকালেও তাদের প্রভাব ছিল রীতিমত বাড়ন্ত।

চল্লিশ বৎসর আগেও ভদ্রমহিলাদের মধ্যে ছিল না গায়িকা ব'লে সুপ্রতিষ্ঠ হবার চেষ্টা। উপরন্তু এমন চেষ্টা সমাজপতিদের সমর্থনও লাভ করত না। ধনীদের অন্তঃপুরে কিছু কিছু সৌখীন গানবাজনার চর্চা যে ছিল না, এ কথা বলতে পারি না। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। সে খবর জনসাধারণের কাছে গিয়ে পেঁছিত না। চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কোন প্রখ্যাত মহিলা গায়িকার নাম কেউ জানে না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভগ্নী স্বর্গীয়া অমলা দাশ প্রথম যখন গ্রামোফোনে গান দেন, তখন সেই অভাবিত ব্যাপারে চারিদিকে জেগেছিল বিস্ময়ের সাড়া। তারও অনেক পরে যখন কলকাতায় বেতারে গানের আসর বসে, তখনও গোড়ার দিকে মহিলারা গান গাইবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেননি। সবাক চলচ্চিত্র সম্বন্ধেও ঐ কথাই বলা যায়।

সে যুগে গানের আসর রেখেছিলেন শ্রেণীবিশেষের নারীরাই। গহরজান ও মালকাজান প্রভৃতির কথা এখানে ধর্তব্য নয়, কারণ তাঁরা বাঙালী ছিলেন না। কিন্তু বাঙালী গায়িকাদেরও মধ্যে অনেকে কিনেছিলেন দেশজোড়া নাম। যেমন শ্রীজান, যাদুমণি ও বিনোদিনী প্রভৃতি। যাদুমণির গান আমি শুনেছি, তাঁর গলা ও গাইবার রীতি ছিল চমৎকার। গ্রামোফোনের পুরাতন রেকর্ডে বিনোদিনীর গান এখনো শোনবার সুযোগ আছে। একালের অধিকাংশ মহিলা গায়িকার মত তাঁর গলায় নাকী সুরের উৎপাত ছিল না। তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর গায়িকা। ভরাট, মিষ্ট গলা,—নীচু থেকে উঁচু পর্দায় সমান করতবের কায়দা দেখাতে পারতেন।

তাঁর মত গায়িকা আজও দুর্লভ। তাঁর মৃত্যুর পরে রেকর্ডের গানে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী। তাঁর আসরের গানও আমি শুনেছি। বড় দরদ ছিল তাঁর গলায়।

কোহিনুর থিয়েটার তখন চলছে কি উঠে গেছে ঠিক স্মরণ হচ্ছে না, কিন্তু ঐ রঙ্গমঞ্চেই একটি জলসায় দুইজন বাঙালী গায়িকার গান আমার খুব ভালো লেগেছিল। তাঁরা হচ্ছেন হীরাবাঈ ও ইন্দুবালা. দু'জনেরই ছিল বয়স কাঁচা, কিন্তু গলা পাকা।

হীরাবাঈও আজ খুব নাম করতে পারতেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্যে দীর্ঘকাল ধ'রে তাঁকে গানের আসরের বাইরে থাকতে হয়েছিল। তবে তাঁর গাইবার শক্তি যে অটুট ছিল, ষোলো-সতেরো বৎসর আগে হিন্দুস্থান রেকর্ডে আমার রচিত একটি গান গেয়ে তিনি তা প্রমাণিত করেছিলেন।

আগে এদেশে বড় বড় গায়ক-গায়িকার অভাব ছিল না বটে, কিন্তু তাঁদের মুখে যে-সব বাংলা গান শুনতুম, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রচনা হিসাবে সেগুলি ছিল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তার প্রমাণ পাওয়া যাবে লালচাঁদ বড়াল, গহরজান, বিনোদিনী ও কৃষ্ণভাবিনী প্রভৃতির বাংলা গানের রেকর্ডগুলি শুনলেই। কিন্তু সেই সব কুলিখিত গানের বাজে কথাগুলি নিয়েই তখনকার শিল্পীরা সৃষ্টি করতেন সুরের সুরধুনী। সেদিন কোহিনুর রঙ্গমঞ্চে ইন্দুবালাও ঐ শ্রেণীর বাংলা গানই গেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর কণ্ঠে পেয়েছিলুম আমি সুরের ইন্দ্রজাল। সুস্পষ্ট উচ্চারণ, জোরালো গলা, মেয়েলি ঢং বা নাকী সুর নেই। সুরচিত, কবিত্বপূর্ণ গান পেলে তিনি যে উচ্চতর শ্রেণীর সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারবেন, এমন ধারণা আমার হয়েছিল।

আমার সে ধারণা যে ভ্রান্ত নয়, সেটা প্রমাণিত হ'ল আরো কয়েক বৎসর পরে। বোধ করি ছত্রিশ কি সাঁইত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। রেকর্ডে ইন্দুবালার গলায় কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক রচিত একটি গান ("ওরে মাঝী, তরী হেথা") শুনে একেবারে অভিভূত হয়ে গেলুম। কাব্যের সৌন্দর্য ও সুরের ঐশ্বর্য এমন নিপুণভাবে যিনি এক সঙ্গে পরিবেশন করতে পারেন, শিল্পী হিসাবে নিশ্চয়ই তিনি

অনন্যসাধারণ। বুঝলুম কোহিনুর রঙ্গমঞ্চের জলসায় যে উদীয়মানা গায়িকাকে প্রথম দেখেছিলুম, আজ তিনি পূর্ণগৌরবে সমুদিত হয়েছেন। "উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ" যে তাঁর করতলগত হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমার মনে আর কিছুমাত্র সন্দেহ রইল না। সেই একটিমাত্র গানের জন্যেই তাঁর লোকপ্রিয়তা উঠল চরমে।

তারপর তাঁর কণ্ঠে শুনেছি কত রকমের গীত—হিন্দী বা উর্দু গান, নজরুল ইসলামের গজল, রামপ্রসাদী গান ও থিয়েটারি গান প্রভৃতি, কিন্তু সর্বশ্রেণীর সঙ্গীতেই স্বকীয় রস ও ভঙ্গির পরিচয় দিয়েছে তাঁর অমৃতায়মান কণ্ঠ।

আজকাল ঘরে ঘরে শোনা যায় রেডিয়োর গান। আমার তো প্রায়ই বেতারের গান শুনলে গায়ে আসে জ্বর। বেতারে মেয়েরাই কেবল নাকী সুর ধরেন না, অধিকাংশ পুরুষই যে-গলায় গান শোনান, তা কতকটা কান্নারই সামিল। কিন্তু ইন্দুবালার মেয়ে-গলায় আছে পুরুষালি ভাব এবং ব্যক্তিগতভাবেই তাঁর পরিচয় পেয়ে বুঝেছি, ইন্দুবালার মধ্যে আছে অল্পবিস্তর "Tom-boy" এর বিশেষত্ব। হয়তো এই জন্যেই সৌখীন ও পেশাদার নাট্য-সম্প্রদায়ে তিনি বিভিন্ন পুরুষ ভূমিকায় প্রচুর দক্ষতা প্রকাশ করতে পেরেছেন। "বিষবৃক্ষ" পালায় দেবেন দত্তের ভূমিকায় গান গেয়ে ও অভিনয় ক'রে তিনি যথেষ্ট নাম কিনেছেন। মনোমোহন থিয়েটারে ("জাহাঙ্গীর" নাটকে) একটি পুরুষ ভূমিকায় তাঁকে যে-রকম লাফ-ঝাঁপ মারতে দেখেছিলুম, আর কোন মেয়ের পক্ষে তা সম্ভবপর ব'লে মনে হয় না।

তার আগেই ঐখানে অভিনীত হয়েছিল শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন-গুপ্তের "রক্তকমল" নাটক। তার মধ্যে ছিল নজরুল ইসলাম রচিত গীতাবলী। অভিনয়ের মাঝে মাঝে এক একটি খণ্ড দৃশ্যে কয়েকটি গান গাইবার ভার পেয়েছিলেন ইন্দুবালা। গত তিন যুগের মধ্যে বাংলা রঙ্গালয়ে তেমন উচ্চশ্রেণীর গান আমি শুনিনি। শচীন্দ্র-নাথের সুলিখিত নাটকের অভিনয়ও হয়েছিল উল্লেখযোগ্য। তবু সমগ্র নাট্যাভিনয়ের মধ্যে সবচেয়ে প্রাধান্য লাভ করেছিল মূল নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন ভূমিকায় ইন্দুবালার সেই গানগুলিই।

লোকে বলে, ঈশ্বরদত্ত কণ্ঠস্বর না থাকলে কেউ হ'তে পারে না

শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিশারদ। সুকণ্ঠ ভগবানদত্ত বটে, কিন্তু সেই কণ্ঠকে শিক্ষিত ও মার্জিত করবার জন্যে দরকার হয় কঠোর সঙ্গীত সাধনা। স্বর্গীয় মৈজুদ্দীনের মত বিস্ময়জনক গায়ক ভারতীয় সঙ্গীতজগতে আর কখনো জন্মগ্রহণ করেন নি। সঙ্গীতে তাঁর ছিল অশিক্ষিতপটুত্ব। তিনি নিয়মিতভাবে কণ্ঠসাধনা করেন নি, রাগরাগিণী চিনতেন না, কিন্তু যে কোন বড় ওস্তাদের গান কানে শুনে নিজের কণ্ঠে প্রকাশ করতে পারতেন। হয়তো তিনি ছিলেন জাতিস্মর, তাই তাঁর কাজে লেগেছিল পূর্বজন্মের সঙ্গীত সাধনা। এ ছাড়া তাঁর আশ্চর্য শক্তির আর কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

কিন্তু সুকণ্ঠী ইন্দুবালা সুগায়িকা হননি এমন দৈবী মায়ার লীলায়। তিনি ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করেছেন সৎগুরুর অধীনে থেকে দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার দ্বারা। তাঁর প্রথম গুরু ছিলেন প্রসিদ্ধ ওস্তাদ গৌরীশঙ্কর। এই সঙ্গীতবিদের কাছে আগেকার আরো অনেকে শিক্ষালাভ ক'রে যশস্বী হয়েছিলেন। তারপর গহরজান, এলাহি বক্স ও জমীরুদ্দীন খাঁ প্রভৃতি তাঁকে গান শেখাবার ভার গ্রহণ করেন। সুতরাং ইন্দুবালার সঙ্গীতকুশলতা যে সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, একথা জোর ক'রেই বলা চলে।

স্বর্গীয় ওস্তাদ জমীরুদ্দীন খাঁ ছিলেন আমার বিশেষ বন্ধু ও স্নেহভাজন। তাঁরও ফরমাসে মাঝে মাঝে আমাকে গান রচনা করতে হয়েছে এবং তার পরিবর্তে তিনি আমাকে শুনিয়েছেন অসংখ্য সঙ্গীত। যখন-তখন অযাচিতভাবে আমার বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছেন এবং প্রায়ই শেষ-রাত্রি পর্যন্ত অশ্রান্তভাবে গেয়ে গিয়েছেন গানের পর গান। সব রকম গানই তিনি গাইতে পারতেন, কিন্তু বিশেষ ক'রে ঠুংরি গানে তাঁর জুড়ি মেলা ভার ছিল। সুরকার হিসাবে নজরুল ইসলামও তাঁর কাছে ঋণী। জমীরুদ্দীনের মুখে প্রায়ই ইন্দুবালার সুখ্যাতি শুনতুম। বাংলা দেশের গায়িকাদের মধ্যে ইন্দুবালার শক্তির উপরে ছিল তাঁর অটুট আস্থা।

সেকালের অনেক নটী এবং গায়িকা ছিলেন নিরক্ষর বা অশিক্ষিত। কোন কোন গায়ক এবং বিখ্যাত অভিনেতা পর্যন্ত

প্রাথমিক শিক্ষারও গর্ব করতে পারতেন না। কিন্তু সেকালের মেয়ে হ'লেও ইন্দুবালার মন ছিল লেখাপড়ায়। অল্প বয়সেই ডবল প্রমোশন পেয়ে তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। হয়তো সেই জন্যেই শুদ্ধতা লাভ করেছে তাঁর বাণী।

ছাব্বিশ

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ দিকে একটি বিদ্যালয় ছিল, নাম এডওয়ার্ড ইনষ্টিটিউসন। ছাত্ররা সেখানে নানা ভাষা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতেন। এ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের জন্যে ও-রকম বিলাতী নাম বেছে নেওয়া হয়েছিল কেন জানি না। বোধহয় তখনকার রেওয়াজই ছিল তাই। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত স্বদেশভক্ত বাঙালীরাও কোন-কিছুর নাম রাখার সময়ে মাতৃভাষার কথা ভুলে যেতেন। বেসরকারি বিদ্যালয়, সভা-সমিতি, রঙ্গালয়, মণিহারী দোকান,—এমন কি ব্যবসায় সংক্রান্ত ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলিও বিলাতী নামধারণ ক'রে গর্ব অনুভব করত। কেবল বাংলা সাহিত্য নিয়ে যেখানকার কারবার, সেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও ইংরেজী নামের আশ্রয়েই প্রথমে আত্মপ্রকাশ করেছিল। অধিকন্তু বাঙালী হিন্দুর ছেলেরও নাম রাখা হয়েছে—রিপনচন্দ্র। ঐ নাম ছিল আমার এক বাল্যবন্ধুর। এ রকম রেওয়াজ এখনো একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি। এই হাস্যকর রেওয়াজ নিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা করা যায়, কিন্তু আপাততঃ ধামাচাপা থাক্ সে-সব কথা।

পূর্বোক্ত এডওয়ার্ড ইনষ্টিটিউসনের অধ্যক্ষ ছিলেন বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত স্বর্গীয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। বহু দিনের মেলামেশার ফলে তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে এডওয়ার্ড ইনষ্টিটিউসনের খোলা ছাদে বা ঘরের ভিতরে বসত অমূল্যবাবুর বৈঠক। সে বৈঠক ছিল পরম উপভোগ্য। সেখানে এসে পরস্পরের সঙ্গে সদালাপ করতেন নবীন ও প্রবীণ বহু সাহিত্যিক এবং সাহিত্যরসিক। যেমন প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, অক্ষয়কুমার বড়াল, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারুচন্দ্র মিত্র,

ব্যোমকেশ মুস্তোফী, ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। আমার তখন উঠতি বয়স, মাসিক সাহিত্য ক্ষেত্রে লেখনী চালনা ক'রে নাম হয়েছে অল্পস্বল্প এবং মশগুল হয়ে আছি সাহিত্যের নেশায়। প্রতিদিন সূর্যাস্তের পরেই সাহিত্যসংলাপে যোগ দেবার জন্যে সাগ্রহে পদচালনা করতুম অমূল্যবাবুর বৈঠকের দিকে।

সে সময়ে আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রের আবহ ছিল অন্যরকম। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখনও "যমুনা"র মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেননি, সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পরে প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক ব'লে আর কারুর নাম করবার উপায় ছিল না বটে, কিন্তু ছোট গল্পের বাজার সরগরম ক'রে রেখেছিলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ভালো কবিতার অপ্রতুলতা ছিল না কিছুমাত্র। পূর্ণোদ্যমে একসঙ্গে চলছে রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গোবিন্দচন্দ্র দাস, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির লেখনী। এখনকার চেয়ে তখনকার বাংলা সাহিত্যই কাব্যসম্পদে ছিল অধিকতর সমৃদ্ধ। জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধবৈচিত্র্যের দিক দিয়েও আধুনিক বাংলা সাহিত্য অপেক্ষাকৃত দরিদ্র হয়ে পড়েছে ব'লে মনে হয়। মাসিক পত্রিকাগুলির মধ্যে প্রধান ছিল "ভারতী", "সাহিত্য" ও "প্রবাসী"।

তবে একটা কথা এখানে বলতে পারি। গড়পড়তা হিসাবে মনে হয়, এখনকার সাহিত্যিক তথা সাংবাদিকদের ভাষা আগেকার চেয়ে উন্নত ও তৈরি হয়ে উঠেছে।

সে সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের সাহিত্যজগতে একাধিক অ্যাটম বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন। তিনি সচীৎকারে ঘোষণা করলেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা অর্থহীন ও দুর্নীতিদুষ্ট। অভিযোগ যেমন আকস্মিক তেমনি অভাবিত। সাহিত্যসমাজে জাগ্রত হ'ল উত্তপ্ত উত্তেজনা। দেখা দিলে দুটো দল। রবীন্দ্রনাথ নিজে কোন প্রতিবাদ করলেন না বটে, কিন্তু তাঁর ভক্তরা রেগে আগুন হয়ে উঠলেন। দ্বিজেন্দ্রভক্তরাও আর একটি দল পাকিয়ে বসলেন।

এই দুই দলের কথা কাটাকাটি ও মাতামাতির ঢেউ তখনকার সাহিত্য-বৈঠকগুলিকেও যথেষ্ট নাড়া দিয়েছিল। প্রতিদিনই আমাদের কাণে উঠত নূতন নূতন গুজব ও অম্লমধুর সন্দেশ। অবশেষে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসন "আনন্দ-বিদায়ে"র প্রথমাভিনয় রাত্রে নাট্যকার জনসাধারণের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে ধিক্কৃত হন এবং তারপর থেকে ঐ অশোভন আন্দোলনে ক্রমেই মন্দা প'ড়ে আসে।

স্বর্গীয় নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের একখানি ছোট পত্রিকা ছিল, নাম "জাহ্নবী"। প্রথম বৎসরে আমি তার গ্রাহক ছিলুম। সেই সূত্রে ব্যক্তিগতভাবে আমি নলিনীবাবুর সঙ্গে পরিচিত হই। তারপর নলিনীবাবুর অনুরোধে "জাহ্নবী" পরিচালনায় আমি তাঁকে কিছু কিছু সাহায্য করতে থাকি এবং "জাহ্নবী"র জন্যে রচনা সংগ্রহ করতে গিয়েই সর্বপ্রথম দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দেবেন্দ্রনাথ সেন, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও রসময় লাহা প্রভৃতি তখনকার সুপরিচিত লেখকগণের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের সুযোগ পাই। তাঁরা কেউ লেখা দিয়েছিলেন, কেউ দেননি, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে চেনাশুনো হয়ে গেল, এইটুকুই ছিল আমার লাভ। তবে "জাহ্নবী"র জন্যে দ্বারে দ্বারে ধরণা দিতে বেশী দিন আমার ভালো লাগেনি, তার সঙ্গে আমার সংস্রব ছিল মাত্র এক বৎসরকাল।

তার কতকাল পরে মনে নেই, হঠাৎ একদিন অমূল্যবাবুর বৈঠকে নলিনীবাবুর সঙ্গে এসে হাজির হলেন তরুণ ব্রজেন্দ্রনাথ। তারপর একদিন নয়, আরো কোন কোন দিন ওঁদের দুজনকে একসঙ্গে দেখলুম এবং আমার বুঝতে বিলম্ব হ'ল না যে, ব্রজেন্দ্র-নাথের দ্বারা নলিনীবাবু আমার অভাব পূরণ করে নিয়েছেন। তফাত খালি এই, নলিনীবাবুর সঙ্গে আমার যখন আলাপ হয়, তখন আমি অন্যান্য পত্রিকারও লেখক, কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ হাতমক্স সুরু করেন "জাহ্নবী"তেই। এবং ঐ পত্রিকাতেই তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। অতএব বলতে হবে যে, সাহিত্যক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রনাথের প্রথম পথপ্রদর্শক হচ্ছেন নলিনীবাবুই।

সে সময়ে মাসিকপত্রের সম্পাদকদের কর্তব্য ছিল অনেকটা মধ্যস্থ বা দালালের মত। ছোট-ছোটদের তো কথাই নেই, অনেক বড়

বড় পত্রিকাওয়ালাও লেখার জন্য পারিশ্রমিক দিতেন না বা দিতে পারতেন না। এবং তখনকার মাসিক সাহিত্যের অধিকাংশ প্রখ্যাত লেখকেরও রচনা ছিল না অর্থকরী। সম্পাদকরা রচনা নির্বাচন করতেন না, বেছে বেছে করতেন নামজাদা লেখক নির্বাচন। তারপর দরকার হ'ত কাকুতি, উপরোধ, চাটুবাক্য এবং বারংবার তাগাদা। লেখকদের উপরোধে ঢেঁকি গিলতে হ'ত অবশেষে। রচনা সংগ্রাহকদের হ'তে হ'ত দস্তুরমত নাছোড়বান্দা। ব্রজেন্দ্রনাথ বোধ করি এই শ্রেণীরই সংগ্রাহক ছিলেন. কারণ কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন "জাহ্নবী"র জন্যে একটি কবিতা রচনা ক'রে তার নাম দিয়েছিলেন "ব্রজেন্দ্র-ডাকাত"। যতদূর মনে পড়ে, কবিতাটি ছিল দ্ব্যর্থভাবব্যঞ্জক।

তারপর ব্রজেন্দ্রনাথ নিয়মিতরূপে দেখা দিতে লাগলেন অমূল্য-বাবুর বৈঠকে। রচনা করতে লাগলেন ঐতিহাসিক প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ। অমূল্যবাবুর উপদিষ্ট প্রণালী অনুসারেই তিনি কাজ করতে লাগলেন। কতকগুলি প্রবন্ধ সংগ্রহ ক'রে "বাঙ্গলার বেগম" নামে একখানি পুস্তকও প্রকাশ করলেন। তাঁর অনুরোধে ঐ পুস্তকের জন্যে একখানি ইংরেজী ঐতিহাসিক পত্রিকার চিত্র অবলম্বন ক'রে আমি একখানি ছবি এ'কে দিয়েছিলুম ব'লে স্মরণ হচ্ছে।

নিজেকে উচিতমত তৈরি ক'রে তোলবার জন্যে তাঁর ছিল বিপুল আগ্রহ এবং প্রভূত প্রযত্ন। সে সময়ে বাংলা দেশে এমন কয়েকজন লেখক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতেন যাঁদের মতামতই কেবল একদেশদর্শী হ'ত না, যাদের অনুসন্ধিৎসাও ছিল না বিশেষ প্রবল। আমি ঐতিহাসিক নই, ইতিহাসের শিক্ষার্থী মাত্র—ইংরেজীতে যাকে বলে novice। কিন্তু আমিও এখনকার একাধিক নামজাদা লেখকের রচনার মধ্যে ঐতিহাসিক গলদ আবিষ্কার করতে পারি ভূরি পরিমাণেই।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় একজন ভালো ঐতিহাসিক, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁরও মধ্যে সব সময়ে সত্যকার ঐতিহাসিকের উপযোগী দৃষ্টিভঙ্গী ও অপক্ষপাতিত্ব দেখতে পাওয়া যায় না। সিরাজদ্দৌলার চরিত্রের কালো দিকটার উপরে চূণকাম করবার কোন চেষ্টাই করতে

তিনি বাকি রাখেননি। তারপর পল্লবিত ভাষা, অশোভন উচ্ছ্বাস এবং দুর্বল সমালোচনাশক্তি প্রভৃতির জন্যে অধিকাংশ বাঙালী লেখকই বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইতিহাস রচনা করতে পারেন নি। সম্ভবতঃ এই সব ত্রুটিবিচ্যুতি উপলব্ধি ক'রেই ব্রজেন্দ্রনাথ শিষ্যের মত এমন দুইজন কীর্তিমানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, বাঙালী ঐতিহাসিকদের মধ্যে যাঁরা শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে আছেন। তাঁরা হচ্ছেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার। বিশেষ ক'রে শেষোক্ত গুণীর দ্বারাই তিনি হয়েছেন অধিকতর প্রভাবান্বিত। স্যর যদুনাথের নির্দেশ তাঁর কাছে হয়েছে গুরু-বাক্যের সামিল। তিনি সাধন-পথে কোন কাজ আধাখেঁচড়া অবস্থায় রেখে দ্রুতবেগে এগিয়ে যেতে চাননি, তিনি অগ্রসর হয়েছেন দীর্ঘকাল ধ'রে ধীরে ধীরে. অটল ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে। হংস-শাবকরা জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সন্তরণে দক্ষ হয়, অনেক স্বভাবকবি নিরক্ষর হয়েও কবিতা রচনা করতে পারেন এবং গায়কও যে সা-রে-গা-মা ও রাগরাগিণী না চিনেও প্রথম শ্রেণীর ওস্তাদদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন স্বর্গীয় মৈজুদ্দীন খাঁ। কিন্তু কেউ ঐতিহাসিক হ'তে পারেন না সহসা বা দুই-চার-দিনের মধ্যে অবলীলাক্রমে। নাবালক অবস্থা থেকে সাবালক অবস্থায় যেতে দরকার হয় তাঁর দীর্ঘকাল এবং পোড়াতে হয় প্রচুর কাঠখড়।

লেখক হন দুই শ্রেণীর। যাঁদের দৃষ্টি এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে এবং যাঁদের দৃষ্টি বর্তমান থেকে পিছিয়ে যায় অতীতের দিকে। প্রথমোক্ত লেখকরা কল্পনা বা অনুমানের সাহায্যে ভবিষ্যৎকে দেখতে চান। শেষোক্ত শ্রেণীর লেখকরা কল্পনার কাছ থেকে কোন সাহায্যই লাভ করেন না, পৃথিবীতে এর আগে যে-সব ঘটনা সত্য সত্যই ঘটেছে ও ঘটনাস্থলে দেখা দিয়েছে যে সব পাত্র-পাত্রী, তাঁরা বলতে পারেন কেবল তাঁদেরই কথা এবং তাঁদেরই বলি আমরা ঐতিহাসিক।

কিন্তু যাঁরা পুরাবৃত্ত নিয়ে আলোচনা করেন, ব্রজেন্দ্রনাথ এখন আর নেই—তাঁদের দলে। সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে তাঁরও

ঝোঁক ছিল ঐ শ্রেণীর ইতিহাস রচনার দিকে, কিন্তু মোড় ঘুরে তিনি পদার্পণ করেছেন নূতন এক পথে, অনেকেই যা দেখেও দেখেননি বা দেখা দরকার মনে করেন নি। সুদূর অতীতের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে এখানে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ধুরন্ধরগণ। এবং মোগল যুগের উপরে সমুজ্জ্বল "সার্চ-লাইট" ফেলেছেন স্যর যদুনাথ সরকার প্রমুখ পণ্ডিতগণ।

কিন্তু হাতের কাছে থাকলেও যে-সময়ের অসংখ্য তথ্য ছিল আমাদের নাগালের বাইরে, সেই ঊনিশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক প্রভৃত মালমসলা সেকালের দুষ্প্রাপ্য সংবাদপত্রের 'ফাইল' থেকে উদ্ধার ক'রে ব্রজেন্দ্রনাথ কৃতজ্ঞ করেছেন বাঙালী জনসাধারণকে।

আন্দাজ চুয়াল্লিশ বৎসর আগে "সংবাদ-প্রভাকর" প্রভৃতি বাংলা দেশের পুরাতন সংবাদপত্রের 'ফাইল' দেখবার জন্য অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের কাছে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলুম। তিনি আমাকে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে নিয়ে গিয়ে একটি নির্জন ঘরে ব'সে পুরাতন পত্রিকাগুলি পাঠ করবার সুযোগ ক'রে দিয়েছিলেন। সেই সময়েই প্রথমে উপলব্ধি করতে পেরেছিলুম যে, আমাদের পুরাতন সংবাদপত্রগুলির 'ফাইল' ঘাঁটলে কত লুপ্ত রত্ন উদ্ধার করা যায়! তখন স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় একখানি সাহিত্য-সম্পর্কীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হ'ত, নাম তার "প্রবাহিনী"। "সংবাদ-প্রভাকরের 'ফাইল' অবলম্বন ক'রে সেই পত্রিকায় "ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্য-পাঠশালা" নামে একটি প্রবন্ধও লিখেছিলুম। তাইতে আমি দেখিয়েছিলুম, বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয়দের রচনা প্রকাশ ক'রে ঈশ্বর গুপ্ত কি ভাবে উপদেশ দিয়ে তাঁদের পথনির্দেশ করেছেন! পুরাতন সংবাদপত্রের 'ফাইল' থেকে আরো কিছু কিছু তথ্য আমি নিজের খাতায় টুকে রেখেছিলুম, কিন্তু সে সব নিয়ে পরে আর মাথা ঘামাই নি। সে ছিল আমার সাময়িক খেয়াল, দু' দিন পরেই ভুলে গিয়েছিলুম।

কিন্তু আগেই বলেছি, ব্রজেন্দ্রনাথ একজন অনুসন্ধিৎসু ও

অধ্যবসায়ী লেখক। খামখেয়ালের বশবর্তী হয়ে কোন কাজে হাত দেন না, নিষ্ঠাবান ব্রতচারীর মত গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত একান্ত ভাবে নিযুক্ত থেকে ব্রত উদ্‌যাপন না ক'রে তিনি ক্ষান্ত হন না। তাঁর ঐকান্তিকতাই জয়যুক্ত করেছে তাঁর প্রচেষ্টাকে।

কেবল "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" নয়, প্রাচীন সংবাদপত্রের 'ফাইলে'র সাহায্যে তিনি যে "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস" সঙ্কলন করেছেন, সেখানিও পরম উপাদেয় গ্রন্থ। প্রচুর বাগাড়ম্বর ক'রে যাঁরা এই শ্রেণীর মস্ত মস্ত গ্রন্থ রচনা করেন, সেগুলির তুলনায় এই একখানি পুস্তক ভারে না কাটলেও ধারে কাটবে নিশ্চিতরূপেই।

তারপর তাঁর "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা" হচ্ছে আর এক বিচিত্র ও অমূল্য নিধি। এদেশে পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের বা কবিদের জীবনী সংগ্রহের জন্যে সর্বপ্রথম উদ্যোক্তা হচ্ছেন কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত। তার পরে বারে বারে এই শ্রেণীর কাজে হাত দিয়েছেন আরো বহু ব্যক্তি: কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথের মত আর কেহই এমন নিখুঁতভাবে কর্তব্য পালন করতে পারেন নি। তাঁর চরিত-মাল্যে ইতিমধ্যেই শতাধিক পুষ্প গ্রথিত হয়ে গিয়েছে এবং এখনও চলছে তার গ্রন্থনকার্য। এও হবে ব্রজেন্দ্রনাথের আর এক অবিস্মরণীয় অবদান।

ব্রজেন্দ্রনাথকে ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দের রবীন্দ্র-স্মৃতি-পুরস্কার দান ক'রে কর্তৃপক্ষ যথার্থ গুণগ্রাহিতারই পরিচয় দিয়েছেন। আমার পুরস্কার দেবার সামর্থ্য নেই, পুরাতন বন্ধুকে উপহার দিতে পারি কেবল আন্তরিক অভিনন্দন।

সাতাশ

আমাদের দল

সে আজ তেতাল্লিশ বৎসর আগেকার কথা। আমাদের যে নিজস্ব দলটি সর্বপ্রথমে গ'ড়ে উঠেছিল শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শ্রীঅমল হোম, শ্রীচারুচন্দ্র রায় ও শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার প্রভৃতিকে নিয়ে, তাঁরা প্রত্যেকেই আজ সাহিত্য ও ললিত কলার বিভিন্ন বিভাগে খ্যাতিলাভ করেছেন—এমন ব্যাপার সচরাচর দেখা যায় না। এথেকেই প্রমাণিত হবে, আমাদের সেই বন্ধুসভার কোন সভ্যই কেবল সাময়িক খেয়ালে মেতে সাহিত্য ও শিল্পকে অবলম্বন করেননি, চিত্তের মধ্যে একান্ত নিষ্ঠা নিয়ে এবং সাহিত্য ও শিল্পের উচ্চাদর্শের দিকে অবিচলিত দৃষ্টি রেখেই তাঁরা অগ্রসর হ'তে চেয়েছিলেন সাধনামার্গে।

আমি যখন সাহিত্যক্ষেত্রে হাতমক্স করছি, স্বর্গীয় নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের সম্পাদনায় তখন "জাহ্নবী" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিছুকাল পরে কাগজখানি বন্ধ হয়ে যায়। তারপর স্বর্গীয় সুধাকৃষ্ণ বাগচী আবার নব পর্যায়ের "জাহ্নবী" প্রকাশ করতে থাকেন এবং তাঁর পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লেখনীচালনা করবার জন্যে আমাকে আহ্বান করেন। নামে সুধাকৃষ্ণই "জাহ্নবী"র সম্পাদক হ'লেন বটে, কিন্তু তাঁর মধ্যে ছিল না সম্পাদকের উপযোগী মনীষা। সেই সময়ে পত্রিকা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করলেন প্রভাত, অমল, সুধীর ও প্রেমাঙ্কুর প্রভৃতি। প্রত্যেকেই তরুণ, আমার চেয়ে বয়সে কিছু ছোট এবং প্রভাত, অমল ও সুধীর তখনও বিদ্যালয়ে ছাত্রজীবন যাপন করছেন। কিন্তু সেই বয়সেই তাঁরা প'ড়ে গিয়েছিলেন সাহিত্যের আবর্তে। বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার চেয়ে সাহিত্যজগতের লেখা এবং পড়ার দিকেই তাঁদের ঝোঁক ছিল বেশী।

"জাহ্নবী" ছোট কাগজ। এবং তার কার্যালয় ও আমাদের

বৈঠকও আয়তনে বড় ছিল না। কিন্তু সেখানে প্রত্যহ যে সব বিষয় নিয়ে (কখনো কখনো উত্তপ্ত) আলোচনা চলত, তার মধ্যে থাকত এদেশী এবং বিদেশী সাহিত্য ও শিল্পের তাবৎ বিভাগ।

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তখন রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকদের ভূরি ভূরি দানের অভাব ছিল না এবং রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের মধ্যে থেকেই নূতন যুগের তিনজন কবিও—যতীন্দ্রমোহন, সত্যেন্দ্রনাথ ও করুণানিধান—ধীরে ধীরে আরোহণ করছিলেন খ্যাতির সোপানে। কিন্তু নূতন যুগের মান রাখতে পারেন এমন একজন প্রতিভাবান কথাশিল্পীর অভাব অনুভব করতেন সকলেই। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস রচনার জন্যে অবসর পেতেন অল্প—যদিও অন্যান্য বিভাগের মত কথাসাহিত্য-ক্ষেত্রেও তিনিই ছিলেন বাংলাদেশের প্রধান শিল্পী এবং সে গৌরব থেকে আজও কেউ তাঁকে বিচ্যুত করতে পারেননি। লোকসাধারণের মানসক্ষুধা নিবৃত্তির পক্ষে তাঁর দান অমৃতায়মান হ'লেও চাহিদা হিসাবে অপ্রচুর ছিল। মন বলত—"আরো চাই, আরো।" কিন্তু কত দিক নিয়ে রবীন্দ্রনাথের হাত জোড়া, একান্তভাবে একদিক নিয়ে নিযুক্ত থাকবার সময় তাঁর কই?

ঠিক এই সময়েই "যমুনা" পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ্যভাবে দেখা দিলেন শরৎচন্দ্র। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হ'তে লাগল "রামের সুমতি", "চন্দ্রনাথ", "পথনির্দেশ" ও "বিন্দুর ছেলে" প্রভৃতি বড় গল্প ও উপন্যাস। তার কয়েক বৎসর আগে (১৩১৪ সালে) "ভারতী" পত্রিকায় "বড়দিদি" নামে শরৎচন্দ্রের একটি পুরাতন রচনা প্রকাশিত হয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁর অজ্ঞাতসারেই। সুতরাং অনায়াসেই বলা যেতে পারে যে, "ভারতী"র পৃষ্ঠায় শরৎচন্দ্র প্রথম আত্মপ্রকাশ করেননি।

এর অল্পদিন পরেই "যমুনা"র কর্ণধার স্বর্গীয় ফণীন্দ্রনাথ পাল পত্রিকা সম্পাদনায় সাহায্য করবার জন্যে আমাকে আমন্ত্রণ করলেন। আমিও গিয়ে হাজির হলুম "যমুনা"র বৈঠকে। তারপর আমাদের দলের বাকি কয়জনও আসন পাতলেন সেই আসরেই। তারপর ক্রমেই

আমাদের দল বৃহত্তর হয়ে উঠতে লাগল। কারণ "যমুনা"র মজলিসে ওঠা-বসা করতেন স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্গীয় রসময় লাহা, স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক। তারপর নৈবেদ্যের উপরে চূড়া সন্দেশের মত "যমুনা"র আসরে এসে আসীন হলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিছুকাল পরে আমাদের দল পুষ্ট হয়ে উঠল অধিকতর। দলের নূতন বৈঠক বসতে লাগল "ভারতী" কার্যালয়ে। আগেকার কেহই দলছাড়া তো হলেনই না, উপরন্তু প্রমথ চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্র-নারায়ণ বাগচী, সুকুমার রায়চৌধুরী, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী ও শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি স্বর্গীয় মনীষিগণও শোভাবর্ধন করতেন আমাদের দলের মধ্যে। আসতেন ভাষাতত্ত্ববিদ্ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব ও নজরুল ইসলাম। আসতেন চিত্রশিল্পী শ্রীঅসিতকুমার হালদার ও শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী এবং নাট্যাচার্য শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী এবং স্বর্গীয় নাট্যশিল্পী রাধিকানন্দ মুখো-পাধ্যায় ও নির্মলেন্দু লাহিড়ী। মোট কথা, তখন আমাদের দলের মত শক্তিশালী বৃহৎ ও বিখ্যাত দল বাংলা দেশের আর কোথাও ছিল না এবং তারপর আজ পর্যন্ত তেমন দল আর গঠিত হয়নি। চুম্বকের দিকে যেমন লৌহের আকর্ষণ অবশ্যম্ভাবী, আমাদের সেই দলের দিকে তেমনি আকৃষ্ট হ'ত সর্বশ্রেণীর সাহিত্যিক ও শিল্পীর দৃষ্টি। সেখানে আসন লাভ করবার জন্যে সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করতেন, কিন্তু সে সৌভাগ্য লাভের সুযোগ পেতেন না সকলেই।

যশস্বী সাহিত্যিক শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বয়সে যখন অতি তরুণ ছিলেন, তাঁর তখনকার মনের কথা তিনি এইভাবে ব্যক্ত করেছেন: "(ভারতীর) ইলেকট্রিক চায়ের কেটলীর চারিদিকে যে সাহিত্য-পরিবার গড়িয়া উঠে, বাংলা সাহিত্যের জীবনে তাহা একটি নূতন সাহিত্যিক অনুভূতি আনিয়া দিয়াছে। * * * আমি জানি একটি কিশোর মনে "ভারতী"র এই সঙ্ঘ কি সুন্দর পরিকল্পনার

খোরাক জোগাইত! প্রয়োজনবাদের সাগরের মধ্যে সেই সন্ধটুকু সুন্দরের মন্দির বলিয়া মনে হইত। একদল লোক—একই অনুভূতি তাহাদের, একই সাধনা তাহাদের, একই প্রতিবন্ধক তাহাদের, একই মৈত্রীর বন্ধনে বদ্ধ। বাংলার সাহিত্যজীবনে এই মৈত্রী-সাধনার যে কতখানি প্রয়োজন তাহা যাঁহারা বাংলা-সাহিত্যের ভিতরের সহিত সামান্য পরিচিত তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন।"

আমাদের দলের পরে সাহিত্যসমাজে উল্লেখযোগ্য আর একটি-মাত্র নূতন দল আত্মপ্রকাশ করেছে এবং তা হচ্ছে "কল্লোলে"র দল। আমাদের দলের তুলনায় তা অনেক ছোট হ'লেও উল্লেখযোগ্য, কারণ তার ভিতর থেকে দেখা দিয়েছেন কয়েকজন নূতন ও শক্তিশালী সাহিত্যিক। যে দল নূতন সাহিত্যিক গড়তে পারে না, তার সার্থকতা অল্প। আমাদের দল কোনদিনই গতানুগতিক ছিল না। ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে তা অভিনন্দন দিতে পারত। সেইজন্যেই আমাদের দলেরও কয়েকজন "কল্লোল" পত্রিকার লেখকশ্রেণীভুক্ত হ'তে ইতস্ততঃ করেননি। পরে যথাসময়ে "কল্লোলে"র দল নিয়েও আলোচনা করব।

কিন্তু আমাদের দল আর নেই। দলের অধিকাংশই আজ স্বর্গত। "যাঁদের দেখেছি" শীর্ষক প্রবন্ধমালায় তাঁদের অনেকেরই কথা নিয়ে আলোচনা করেছি। বাকি যাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে আজও বিদ্যমান আছেন তাঁরাও হয়েছেন জরাগ্রস্ত, যৌবনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা থেকে বঞ্চিত; দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত হয়ে জীবনযুদ্ধে নিযুক্ত থেকে কেউ আর কারুর খবর বড় রাখতে পারেন না, হয়তো সমুজ্জ্বল অতীতের স্বপ্ন দেখেই পরিতৃপ্ত হয়ে থাকেন। তাঁদেরও কয়েক-জনের কথা বর্তমান নিবন্ধমালায় আলোচিত হয়েছে। কিন্তু আরো কারুর কারুর কথা এখনো বলা হয়নি। সেই কথা ব'লে আমাদের দলের প্রসঙ্গ শেষ করব।

"জাহ্নবী" কার্যালয়ে আমাদের দল গ'ড়ে ওঠবার কয়েক বৎসর আগেই শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আমার বয়স তখন ষোলো-সতেরোর বেশী হবে না। প্রভাতের আরো কম। আমি তখন কোন কোন ছোট কাগজের লেখক এবং আমার রচিত

একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকাও যন্ত্রস্থ হয়েছে—নাম তার "আমাদের জাতীয় ভাব।" বঙ্গবিভাগের পরে সারা দেশে তখন সুরু হয়েছে প্রবল স্বদেশী আন্দোলন এবং তখনকার অধিকাংশ যুবকের মত আমিও সেই আন্দোলনে মেতে উঠেছি। তখন সরকারী বাগানগুলিতে বৃটিশ-সিংহকে বাক্যবন্দুকের বুলেটের দ্বারা ঘায়েল করবার জন্যে প্রতিদিন বৈকালেই অগণ্য সভার আয়োজন করা হ'ত এবং আর সকলকার মত আমিও ছিলুম সে সব সভার একজন নিয়মিত শ্রোতা।

বিডন বাগানে টহলরাম নামে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের নেতৃত্বে প্রত্যহই হ'ত সভার অধিবেশন। তিনি বাংলা জানতেন না, কিন্তু ইংরেজীতে "Curzon and Curzonians"-এর বিরুদ্ধে যে সব গরম গরম বচন ঝাড়তেন, জনসাধারণের পক্ষে সেগুলি হ'ত অত্যন্ত শ্রবণরোচক। টহলরামের পর সেখানে আরো কেউ কেউ বক্তৃতা দিতেন এবং তাঁদের মধ্যে প্রভাত ছিলেন অন্যতম। বয়সে তখন তাঁকে কিশোর বলাই চলত, কিন্তু সেই বয়সেই তাঁর মুখের উপরে বিরাজ করত দাড়িগোঁফের গভীর অরণ্য। এবং সেই বয়সেই তিনি জনসভায় অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন অকুতোভয়ে।

কেমন ক'রে আমরা দু'জনেই যে দু'জনের দিকে আকৃষ্ট হলুম তা আর স্মরণে আসে না। তবে এইটুকু আমার মনে আছে যে, আমার রচিত পুস্তিকাখানি তিনি সভার শ্রোতাদের মধ্যে হাতে হাতে বিক্রয় করবার ভার নিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হয়নি, কারণ টহলরাম হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে সমস্ত ভেস্তে দিলেন। কারুর কারুর মুখে শুনলুম, তিনি ছিলেন ইংরেজদের গুপ্তচর। সম্ভবতঃ মিথ্যা গুজব।

কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রভাতের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে। কখনো টহলরামের বাসায় তাঁদের কার্যালয়ে গিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে গল্প ক'রে আসতুম এবং কখনো তিনি এসে দেখা দিতেন আমার পাথুরেঘাটার বাড়ীতে।

তারপর "জাহ্নবী" কার্যালয়ে গিয়ে প্রভাতের আরো কোন কোন বিশেষত্বের সঙ্গে পরিচিত হলুম। অল্প বয়সেই তিনি সমসাময়িক পাশ্চাত্য সাহিত্যকে রাখতে পেরেছিলেন নিজের নখদর্পণে। তিনি

ছিলেন প্রায় সর্বদর্শী, প্রেমাঙ্কুর তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন "সবজান্তা লরেন্স।" কি সাহিত্য, কি ললিতকলা, কি রাজনীতি, কি ইতিহাস, কি নাট্যশিল্প, কি খেলাধুলো, প্রত্যেক বিভাগেই নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহের জন্যে তাঁর আগ্রহ ছিল উদগ্র। তর্ক এবং গলাবাজিতেও তিনি যে কি-রকম তুখড় ছিলেন, শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীর প্রসঙ্গে আগেই দিয়েছি তার অল্পবিস্তর নমুনা।

বাংলাদেশে যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে একজন অদ্বিতীয় লেখক আত্মপ্রকাশ করেছেন, "জাহ্নবী" কার্যালয়ে এসে এ-খবর সর্বপ্রথমে দেন প্রভাতচন্দ্রই। সে সময়ে এই সংবাদ দিকে দিকে প্রচার করবার জন্যে প্রভাতের যে বিপুল আগ্রহ লক্ষ্য করেছি তাও উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কাছে গিয়ে তিনি শরৎচন্দ্রের রচনা পাঠ ক'রে শুনিয়ে আসেন। বিস্মিত ও মুগ্ধ বিজয়চন্দ্র সেই অভাবিত আবিষ্কারের সংবাদ জানান কবিবর ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালকে এবং তিনিও শরৎচন্দ্রের অসাধারণ রচনা-চাতুর্যের পরিচয় পেয়ে তাঁর ভক্ত হয়ে পড়েন। প্রভাতচন্দ্র প্রভৃতির মৌখিক বিজ্ঞাপনের মহিমাতেই শরৎচন্দ্রের নাম প্রায় বিদ্যুৎ-গতিতেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু প্রভাতচন্দ্র চিরদিনই মুখফোড়। যত বড় লোকই হোন, কারুর যুক্তিহীন উক্তিই তিনি সহ্য করতে একান্ত নারাজ। আমি যখন মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত "মর্মবাণী" পত্রিকার সহকারী সম্পাদক, সেই সময়ে তাঁর কার্যালয়ে ব'সে শরৎচন্দ্র একদিন বললেন, "রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে-বাইরে" লিখেছেন। তোমরা দেখে নিও, আমি এবারে যে উপন্যাস লিখব, "ঘরে-বাইরে"র চেয়ে ওজনে তা একটুও কম হবে না।"

প্রভাতচন্দ্র অমনি তাঁর মুখের উপরে ব'লে বসলেন, "সবুজ পত্রে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস এখনো শেষ হয়নি, আর আপনার উপন্যাস এখনো লেখাই হয়নি। তবু এমন কথা আপনি কি ক'রে বলছেন!" শরৎচন্দ্র কোন যুৎসই জবাব দিতে পারলেন না এবং তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীও সফল হয়নি। তাঁর পরের উপন্যাসের নাম "গৃহদাহ"। তা "ঘরে-বাইরে"র সমকক্ষ হ'তেও পারেনি, বরং

তার মধ্যে আছে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা চিত্রিত একটি বিখ্যাত চরিত্রের স্পষ্ট অনুকরণ। শরৎচন্দ্র একখানি পত্রে নিজেই সেই অনুকরণকে চুরির নামান্তর ব'লে স্বীকার করেছেন!

আমি বরাবরই লক্ষ্য ক'রে এসেছি, উচ্চশ্রেণীর সাংবাদিক ও সম্পাদকের যে সব গুণ থাকা উচিত, প্রভাতচন্দ্রের মধ্যে ছিল তা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত তিনি নিজের উপযোগী ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ পাননি, নানা বৈঠকে লক্ষ্যহীনের মত বিবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা ও তর্কাতর্কি ক'রে এবং কাঁড়ি কাঁড়ি বই প'ড়ে জীবনের দীর্ঘকাল কাটিয়ে দিয়েছেন। তারপর পরিণত বয়সে "আনন্দবাজার পত্রিকা"র সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম হয়ে সাংবাদিকের কাজ সুরু করেন এবং তারপর দৈনিক "ভারতে"র সম্পাদকের পদে নির্বাচিত হন। তিনি বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গেই নিজের কর্তব্যপালন করেছিলেন। কিন্তু পরে "ভারত' নিষিদ্ধ পত্রিকায় পরিণত ও তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। বোধ করি পত্রিকা সম্পর্কীয় কোন কারণের জন্যেই কিছুকাল তাঁকে কারাবরণও করতে হয়।

রাজনীতি নিয়ে তিনি কিশোর বয়স থেকেই মাথা ঘামিয়ে এসেছেন এবং প্রাচীন বয়সে বিধান সভার সভ্যপদপ্রার্থী হয়ে নির্বাচন-দ্বন্দ্বেও যোগদান করেছেন।

আজও প্রভাতচন্দ্রের প্রকৃতি, কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গি একটুও পরিবর্তিত হয়নি। মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে যখন দেখা হয়, তাঁর দুর্দান্ত আকার, এলোমেলো পাকা চুল ও ঘন দাড়িগোঁফের মধ্যে ফিরিয়ে পাই সেই নবীন ও পুরাতন প্রভাতচন্দ্রকেই।

আমাদের দলের আরো কিছু

যে সময়ে আমাদের দল গঠিত হয়, তখন বাংলা ভাষা উচ্চশ্রেণীর অনুবাদ-সাহিত্যে বিশেষ পরিপুষ্ট ছিল না। "সাহিত্য" প্রভৃতি পত্রিকায় মাঝে মাঝে মোপাসাঁ প্রমুখ দুই-তিনজন গত যুগের লেখকের ছোটগল্প প্রকাশিত হ'ত। এবং তখনকার কয়েকজন বিখ্যাত বাঙালী লেখক (দীনেন্দ্রকুমার রায় ও হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি) নিম্নতর শ্রেণীর বিলাতী গল্পকে মৌলিক ব'লে চালিয়ে দিতে ইতস্ততঃ করতেন না।

অনুবাদ হচ্ছে সাহিত্যের একটি প্রধান বিভাগ। অনুবাদ-সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার খুলেই ইংরেজী ভাষার প্রয়োজনীয়তা আজ এতটা বেড়ে উঠেছে। একমাত্র তার মাধ্যমেই আমরা পরিচিত হ'তে পারি পৃথিবীর অধিকাংশ সাহিত্যের সঙ্গে। বিভিন্ন দেশীয় সাহিত্যের আদর্শ চোখের সামনে এনে রাখলে বাংলা সাহিত্যের আদর্শও যে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হবে, এ বিশ্বাস ছিল আমাদের বরাবরই।

কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রখ্যাত লেখকই অনুবাদ-সাহিত্যের প্রতি সদয় ছিলেন না। এমন কি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত লেখকও অনুবাদের সার্থকতা স্বীকার করতেন না। অনুবাদ করতে দেখলে আমাকে তিনি ভর্ৎসনা করতেন। বলতেন, "অনুবাদ করার মানেই হচ্ছে পণ্ডশ্রম করা।" অথচ মজা এই, সাহিত্য-জীবনের পূর্বার্ধে তিনি নিজেই দুইখানি বড় বড় ইংরেজী উপন্যাস বাংলাভাষায় তর্জমা করেছিলেন।

"জাহ্নবী"কে কেন্দ্র ক'রে আমাদের দল যখন গ'ড়ে ওঠে, তখন প্রথম থেকেই আমরা অনুবাদ-সাহিত্যের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দি। তখনকার য়ুরোপের নানা দেশের অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের

রচনার সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলুম। কিন্তু কেবল তাঁদের রচনা পাঠ ক'রেই আমরা তৃপ্তিলাভ করতে পারতুম না। ভালো জিনিস যেমন আর পাঁচজনকে খাইয়ে সুখ হয়, বাঙালী পড়ুয়াদের কাছে তেমনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের রস নিবেদন করবার জন্যে আমাদেরও আগ্রহ ছিল যথেষ্ট।

অনতিবিলম্বেই যাঁদের নিয়ে আমাদের দল বৃহত্তর হয়ে ওঠে, সেই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন ঐ একই মতাবলম্বী। সে যুগের পাশ্চাত্য সাহিত্যের বহু শ্রেষ্ঠ রত্ন তাঁরা উপহার দিয়েছেন বাঙালী পাঠকসমাজের কাছে। সত্যেন্দ্রনাথ যত কবিতার অনুবাদ করেছেন, এদেশের আর কোন কবি তা করেননি। কিন্তু কেবল পদ্য নয়, গদ্যানুবাদেও তাঁর দান আছে। মৌলিক রচনাতেও যে পূর্বোক্ত লেখকরা প্রচুর কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন, এ কথা সকলেই জানেন। কিন্তু তাঁদের কেহই অনুবাদকে পণ্ডশ্রম ব'লে মনে করতেন না। তাঁরা অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন নিজেদের নাম কেনবার জন্যে নয়, মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করবার জন্যেই। এ বিভাগে আমাদের দলের অবদান অতিশয় উল্লেখযোগ্য। তাঁরা যে পথে অগ্রণী হয়েছিলেন, আজ সেখানে দেখা দিয়েছেন বহু নবীন পথিক। আমাদের অনুবাদ-সাহিত্যের ভাণ্ডার তাই ক্রমেই অধিকতর পুষ্ট হয়ে উঠছে।

আগেই বলেছি শ্রীঅমলচন্দ্র হোম যখন আমাদের দলে যোগ দিয়েছিলেন, তখন তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্র। বয়সেও ছিলেন প্রায় কিশোর। কিন্তু সেই বয়সেই তাঁর অধীত বিদ্যার পরিধি ছিল বিস্ময়কর। দেশ-বিদেশের সাহিত্যের হাটে নিত্য ছিল তাঁর আনাগোনা। এবং আসরে আসীন হয়ে যখন তিনি সাহিত্য ও ললিতকলার বিবিধ বিভাগ নিয়ে নিজের মতামত জাহির করতেন, তখন পাওয়া যেত তাঁর প্রভূত মনীষার পরিচয়। বিদ্যালয়ে পড়তে পড়তে সাহিত্যের আবর্তে গিয়ে পড়লে গুরুজনদের দ্বিতীয় রিপু যে শান্ত থাকে না, নিজের জীবনেই তার প্রমাণ পেয়েছি। অমলচন্দ্রও যে গুরুজনদের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছেন, বন্ধুবান্ধবদের মুখেই

শুনেছি এ কথা। কিন্তু সাহিত্যের নেশা হচ্ছে আফিমের মৌতাতের মত; ধরলে আর ছাড়ান পাবার উপায় থাকে না। অমলচন্দ্রও সাহিত্য-চর্চা ও আমাদের দল ছাড়তে পারেননি। "জাহ্নবী"র আসর থেকে উঠে গিয়ে ব'সেছেন "ভারতী"র বৈঠকে। এবং চিরদিনই বন্ধুরূপে নির্বাচন করেছেন সাহিত্যিক ও শিল্পীদেরই। মাঝে মাঝে তাঁর বাড়ীতেও গিয়েছি এবং তখনও আমাদের আলাপ্য বিষয় হ'ত কেবল সাহিত্য ও শিল্পই।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিজেকে সাহিত্যিক নয়, সাংবাদিক ব'লেই মনে করতেন। "প্রবাসী"র জন্যে লিখতেন কেবল বিবিধ সংবাদ। কিন্তু সাহিত্য বিচারে যে তাঁর অসামান্য শক্তি ছিল, সম্পাদকরূপে সেটা তিনি বিশেষভাবেই প্রমাণিত ক'রে যেতে পেরেছেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রথম জীবনে গুটিকয় ছোট গল্প রচনা করেছিলেন, কিন্তু আজ আর বাজারে তার চাহিদা নেই। আর আছে তাঁর কিছু কিছু চুটকি সমালোচনা, তারও কোন স্থায়ী মূল্য নেই। অথচ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে তাঁর নাম। কিন্তু তিনি যে ছিলেন কত বড় রসবেত্তা, তাঁর "সাহিত্য" সম্পাদনার মধ্যেই আছে তার অতুলনীয় প্রমাণ। এক একজন লোক সাহিত্য সৃষ্টি না ক'রেও সাহিত্য-সমাজে মধ্যমণির মত বিরাজ করতে পারেন।

অমলচন্দ্রকে এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা চলে। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যবোদ্ধা, সাহিত্য ও চারুকলা নিয়ে মুখে মুখে অনর্গল আলাপ-আলোচনা করতে পারেন এবং রচনাশক্তিতেও তিনি বঞ্চিত নন। কিন্তু নিজের রচনা নিয়েই সময় কাটাবার দিকে তাঁর তেমন ঝোঁক নেই। "জাহ্নবী"র জন্যে তিনি কিছু কিছু লিখেছেন ব'লে মনে পড়ছে। কিন্তু লেখার চেয়ে ভালো ক'রে পত্রিকা পরিচালনার দিকেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশী। "জাহ্নবী"তে হাতমক্স ক'রে তারপর তিনি যখন "মিউনিসিপ্যাল গেজেটে"র সম্পাদকরূপে দেখা দেন, তখন তাঁর বিশেষ গুণপনা আকৃষ্ট করেছিল সকলের দৃষ্টি। একখানি সাধারণ পত্রিকাকে তিনি ক'রে তুলেছিলেন অনন্যসাধারণ। এবং সুযোগ পেলেই ওর ভিতর দিয়েই তিনি প্রকাশ করতেন সাহিত্য

ও শিল্প সম্বন্ধে নিজের রসগ্রাহিতাকে। "মিউনিসিপাল গেজেটে"র রবীন্দ্র-সংখ্যা সৌন্দর্যে ও ঐশ্বর্যে অবিস্মরণীয়। সেই সময়ে আরো অনেকগুলি পত্রিকার রবীন্দ্র-সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু মিউনিসিপাল গেজেটে"র সেই সংখ্যায় সুযোগ্য সম্পাদক সুদক্ষ হাতে যে সব বিচিত্র তথ্য পরিবেশনের ভার নিয়েছিলেন তা হয়েছিল সবচেয়ে উপভোগ্য। অমলচন্দ্র বালক বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথের দুর্লভ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন, কবি সম্পর্কীয় বহু তথ্যই তাঁর নখদর্পণে এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যেও আছে তাঁর পরিপূর্ণ অধিকার। কাজেই তাঁকে পরের মুখে ঝাল খেতে হয়নি। রবীন্দ্রনাথের উপরে তাঁর অচলা নিষ্ঠা এবং আমাদের দলের প্রত্যেকেই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পূজারী। রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সময়েও অমলচন্দ্রের সম্পাদনায় একখানি উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল।

অতি-আধুনিক সাহিত্য নিয়েও তিনি মতিষ্ক চালনা করেন এবং সে সম্বন্ধেও নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন একখানি পুস্তিকায়। সাহিত্য-সমাজে তা বিলক্ষণ আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

এখন তিনি সম্পাদকের গদী ছেড়ে অধিকার করেছেন সরকারী প্রচার-সচিবের আসন। তাঁর পক্ষে খুব গুরুতর ব্যাপার না হ'লেও এ-পদেরও গুরুত্ব বড় অল্প নয়।

কিশোর, তরুণ ও প্রাচীন অমলচন্দ্র জেগে আছেন আমার চোখের উপরে। তবে আগে তাঁর সঙ্গে যেমন ঘন-ঘন দেখা হ'ত, এখন আর তা হয় না বটে। কিন্তু কালে ভদ্রে দেখা হ'লেই বুঝতে পারি, অমলচন্দ্রের পরিবর্তন হয়নি। তাঁর একহারা দেহ আজ দোহারা (মাঝে তেহারাও হয়েছিল) হয়েছে বটে, কিন্তু আজও তাঁর স্বভাব হারিয়ে ফেলেনি তারুণ্যের প্রভাব। অমলচন্দ্র কোন দিন বোধ করি দেহে বুড়ো হ'লেও মনে বুড়ো হবেন না।

আর একজনের কথা ব'লে আমাদের দলের প্রসঙ্গ শেষ করব। তিনি হচ্ছেন শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার। তিনি হচ্ছেন একাধারে সাহিত্যিক, সম্পাদক ও পুস্তক-প্রকাশক। সুধীরের আগে বাংলা-দেশের আর কোন সাহিত্যিক বিখ্যাত প্রকাশকরূপে আত্মপ্রকাশ

করেছেন ব'লে মনে পড়ছে না, এখন এই পথে দেখি একাধিক ব্যক্তিকে। অনেকেরই মতে লেখকদের সঙ্গে প্রকাশকদের হচ্ছে খাদ্য ও খাদকের সম্পর্ক। সুধীরের বেলায় ও-কথা খাটে না।

"জাহ্নবী"র ছোট আসরেই সুধীরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়, বোধ করি তিনি তখন সবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। সেই পঠদ্দশাতেই সাহিত্যিক হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি করেছিলেন লেখনীধারণ। একাধিক পত্রিকায় প্রকাশিত হ'তে থাকে তাঁর রচনা।

তারপর "জাহ্নবী", "যমুনা", "সঙ্কল্প" ও "মর্মবাণী" পত্রিকা পরে পরে উঠে গেল। এ সব কাগজের সঙ্গেই সুধীরের ও আমার সম্পর্ক ছিল। একদিন আমরা দু'জনে সুকিয়া (এখন কৈলাস বসু) ষ্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি। এমন সময়ে কান্তিক প্রেস থেকে স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের আহ্বান করলেন।

মণিলাল বললেন, "স্বর্ণকুমারী দেবী আমার উপরে "ভারতী"র ভার অর্পণ করতে চান। আপনারা দু'জনে যদি আমাকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেন, তাহ'লে সে ভার আমি গ্রহণ করতে পারি।"

তাঁর প্রস্তাবে আমরা রাজি হলুম। তারপর নতুন ক'রে আবার "ভারতী" প্রকাশিত হ'তে লাগল এবং আমাদের দল রূপান্তরিত হ'ল "ভারতী"র দলে।

সুধীরের পিতৃদেব স্বর্গীয় এম সি সরকার রায় বাহাদুরের একখানি আইন সংক্রান্ত পুস্তকের দোকান ছিল। সুধীরও তখন বি-এ পাস ক'রে আইন পড়ছিলেন। তারপর হঠাৎ আইনের পড়া ছেড়ে দিয়ে বইয়ের দোকানে গিয়ে বসতে সুরু করলেন। তিনি হচ্ছেন সাহিত্যিক, শুকনো আইনের কেতাব নিয়ে নিযুক্ত থাকতে চাইলেন না। প্রকাশ করতে লাগলেন বাংলা কথাসাহিত্যের পুস্তক। এ বিভাগে তাঁদের দ্বারা প্রকাশিত প্রথম দু'খানি বই যথাক্রমে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমার দ্বারা রচিত। আজ তিনি ফলাও ক'রে ব্যবসা ফেঁদেছেন, "এম সি সরকার এণ্ড সন্স" হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান প্রকাশক। কিন্তু এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের মূলে আছে একমাত্র সুধীরেরই মনীষা, সততা ও অমায়িকতা। আজ পর্যন্ত

একাধিক ব্যক্তি তাঁকে ঠকিয়েছে, কিন্তু কোন লেখককেই তাঁর কাছে ঠকতে হয়নি।

সুধীরের প্রধান কীর্তি "মৌচাক"। ছত্রিশ বৎসর আগে "ভারতী"র আসরে কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের দ্বারা যখন "মৌচাকে"র নামকরণ হয়, তখন বাংলাদেশের খুব কম লেখকই শিশু-সাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইতেন। সুধীরের নির্বন্ধাতিশয়েই গত যুগের ও বর্তমান কালের অধিকাংশ প্রখ্যাত লেখক "মৌচাকে"র মাধ্যমে আমাদের শিশু-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছেন। "মৌচাকে"র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি স্বনামধন্য স্বর্গীয় লেখকরা। এবং "মৌচাক" আমন্ত্রণ না করলে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নরেন্দ্র দেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, শিবরাম চক্রবর্তী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল ও স্বর্গীয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধায় প্রভৃতি ছোটদের জন্যে কলমই ধরতেন কিনা সন্দেহ! আমাকেও বড়দের আসর থেকে টেনে এনে ছোটদের খেলাঘরে নামিয়েছে ঐ "মৌচাক"ই। তার আসরে এসে আসীন হয়েছেন আজ পর্যন্ত কত বিখ্যাত লেখক, ছোটদের আর কোন পত্রিকা তেমন গর্ব করতে পারবে না।

শরৎচন্দ্রের প্রথম পুস্তক "বড়দিদি" কোন পুস্তক-ব্যবসায়ী প্রকাশ করেননি, "যমুনা" সম্পাদক স্বর্গীয় ফণীন্দ্রনাথ পাল তা ছাপিয়েছিলেন সখ ক'রেই। প্রকাশকদের মধ্যে সর্বপ্রথমে সুধীরই বইয়ের বাজারে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে দেখা দেন। শরৎচন্দ্রের সর্বশেষ পুস্তক "ছেলেবেলার গল্প"ও তাঁরই দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। মৃত্যুশয্যায় শায়িত শরৎচন্দ্রের যখন অনটন হয়েছিল, সুধীরই তাঁকে অর্থ সাহায্য করতে অগ্রসর হয়েছিলেন।

আমাদের সব সাহিত্যবৈঠক আজ অতীত স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে। বিদ্যমান আছে কেবল এই "মৌচাকে"র বৈঠক। যদিও তার আগেকার ঔজ্জ্বল্য আর নেই, তবু এখনো যে সে শিবরাত্রির সলতের মত টিম টিম ক'রে জ্বলছে, এইটুকুই হচ্ছে আনন্দের কথা। কিন্তু

সেখানে বিদ্যমান আছেন আগেকার সুধীরচন্দ্রই। সেখানে গেলেই আবার মনের চোখে দেখতে পাই তাঁদের প্রিয় মুখগুলি, জীবনের যাত্রাপথে চলতে চলতে আজ যাঁরা হারিয়ে গিয়েছেন—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। মনের চোখে তাঁদের দেখি এবং মনে মনে তাঁদের সঙ্গসুখ উপভোগ করি।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে শিশু-সাহিত্য শাখার সভাপতি-রূপে সুধীরচন্দ্র যে চমৎকার অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন, তার মধ্যে আছে চিন্তাশীলতা ও বহু জ্ঞাতব্য তথ্য। সুধীরের মাথার কালো চুল একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর কলমে আজও ঘুণ ধরেনি।

আটাশ

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

একদিন "বসুমতী" কার্যালয়ে গিয়েছি। সম্পাদকের ঘরে প্রবেশ ক'রে দেখলুম টেবিলের ধারে তাঁর সামনে ব'সে আছেন জনৈক হৃষ্ট-পুষ্ট প্রাচীন ভদ্রলোক। মার্জিত চেহারা, মুখে-চোখে বিশিষ্টতার স্পষ্ট পরিচয়। চিনতে পারলুম না বটে, কিন্তু তাঁকে প্রফেসর ব'লেই মনে হ'ল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখেছি, প্রফেসরদের চিনিয়ে দেয় কেবল তাঁদের মুখ। বহু কবি ও লেখক বর্ণচোরা চেহারা অধিকারী। দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রভৃতিকে কেউ চেহারা দেখে কবি ব'লে ধরতে পারত না। জীবিত কবিদের মধ্যেও এমন লোকের অভাব নেই। যেমন করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার ও শ্রীকালিদাস রায় প্রভৃতি।

সম্পাদক সুধালেন, "হেমেনদা, এ'কে চেনেন?"

আমি মাথা নেড়ে জানালুম, না।

—"ইনি হচ্ছেন ডক্টর সুশীলকুমার দে।"

সুশীলকুমার! সানন্দে ঝুঁকে প'ড়ে তাঁর বাহুমূল ধ'রে বললুম, "ইনি যে আমার প্রথম যৌবনের বন্ধু!"

চোখের সুমুখ থেকে স'রে গেল কিছু কম চার যুগের পুরাতন পর্দা। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন সবে আত্মপ্রকাশ ক'রেছেন, সেই সময়ে "যমুনা" পত্রিকার বৈঠকে সুশীলকুমারের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়। তখনও তিনি কৃতবিদ্য হ'লেও প্রখ্যাত ছিলেন না। তাঁর নাম বিদ্বজ্জনসমাজে সুপরিচিত।

সুশীলকুমার সহাস্যে বললেন, "আমাকে চিনতে তো পারেননি?"

বললুম, "আমরা ছিলুম যুবক, আজ হয়েছি বৃদ্ধ। এত কালের অদর্শনের পর আর কি মানুষ চেনা যায়?"

সুশীলকুমার "ভারতী"র বৈঠকের কথা তুলে বললেন, "অমন চমৎকার বৈঠক আর হবে না।"

সত্য কথা। আর হবে না। আজকের তরুণ সাহিত্যিকরা উচিত-মত একজোট হবার অভ্যাস ক্রমেই বেশী ক'রে হারিয়ে ফেলছেন। "যমুনা", "মর্মবাণী" ও বিশেষ ক'রে "ভারতী" পত্রিকার সাহিত্য-বৈঠকেই আমি আধুনিক কালের অধিকাংশ সাহিত্যিক ও শিল্পীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করবার সুযোগ পেয়েছিলুম। এবং সেইজন্যেই আমার এই আলোচনায় বার বার ঐ সব বৈঠকের প্রসঙ্গ এসে পড়ে।

"ভারতী" কার্যালয়ের ঐ বৈঠকেই স্বর্গীয় সুলেখক সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি তরুণ যুবক মাঝে মাঝে আসতে লাগলেন। নাম তাঁর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। শুনলুম, তিনি তাজহাটের রাজার ভাগিনেয়। চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। অবনীন্দ্র-নাথের ছাত্র। তাঁর চেহারা, ভাবভঙ্গি ও কথাবার্তা সপ্রতিভ।

দেবীপ্রসাদের দেহ দেখেই বুঝতে বিলম্ব হ'ল না যে, তিনি নিয়মিতভাবে ব্যায়াম অভ্যাস করেন। বাংলাদেশের অধিকাংশ কলম-বিলাসী কবি ও শিল্পীদের ঠুনকো দেহ দেখলেই সন্দেহ হয়, যেন তাঁরা তথাকথিত চকোরের মত কেবল জ্যোৎস্না পান ক'রেই বেঁচে থাকতে চান। কারুর কারুর দেহ আবার দস্তুরমত মেয়েলী। তাঁরা কথা কন ন্যাকী সুরে, হাসেন মুচকি হাসি, চলেন কোমর দুলিয়ে। কিন্তু দেবীপ্রসাদের মত বলিষ্ঠ, পেশীবন্ধ ও পুরুষোচিত চেহারা বাঙালী কবি ও শিল্পীদের মধ্যে আমি আর দ্বিতীয় দেখিনি। রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটতেন, অপরিচিত লোকেরা নিশ্চয়ই তাঁকে পলোয়ান ছাড়া আর কিছু ব'লে মনে করতে পারত না।

এক একদিন আমাদের অনুরোধে তিনি গায়ের জামা খুলে ফেলে যখন মাংসপেশীর খেলা দেখাতেন, আমরা চমৎকৃত হয়ে তাকিয়ে থাকতুম তাঁর পরিপুষ্ট দেহের দিকে। কণ্ঠের, বক্ষের, উদরের ও বাহুর সমস্ত মাংসপেশীই ছিল তাঁর আজ্ঞাধীন।

যে হাতে গদাই মানায় বেশী, সেই হাতই সুপটু ছিল সূক্ষ্ম তুলিকা-চালনায়, আবার সেই হাতেই একদিন সবিস্ময়ে দেখলুম

ছোট্ট একটি বাঁশের বাঁশী!

বললুম. "আরে দেবী, তুমি আবার বাঁশী বাজাতেও পারো নাকি?"

দেবীপ্রসাদ হেসে বললেন, "পারি।"

—"বাজাও তো, শুনি।"

বিনাবাক্যব্যয়ে মাথাটি কাত ক'রে তিনি দিলেন বাঁশীতে ফুঁ। মুরলীগুঞ্জনে খেলা সুরু হ'ল সপ্ত-গ্রামের। সেই বিচিত্র ধ্বনি-তরঙ্গের মধ্যেও আবিষ্কার করলুম একজন অসামান্য শিল্পীকে। তারপর একাধিক গানবাজনার আসরে শুনেছি দেবীপ্রসাদের বাঁশের বাঁশী। সৌখিন হ'লেও তিনি নিপুণ বংশীবাদক ব'লে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

পুরুষোচিত দেহের মধ্যে থাকা উচিত পুরুষোচিত মন। তাই পরে তিনি বন্দুক ধারণ করেছেন শুনে বিস্মিত হইনি। শিকারীর বেশে বনে বনে ঘুরে বেড়ান। হাতী-গণ্ডার হয়তো হাতের কাছে পাননি, তবে একাধিক ব্যাঘ্রপুঙ্গব পঞ্চত্বলাভ করেছে তাঁর হাতে। এবং নিজেই তিনি দিয়েছেন এ সন্দেশ। মুখে নয়, বন্দুক-চালনার পর লেখনীচালনা ক'রে। তাঁর লেখা শিকারকাহিনী আমার ভালো লাগে। পরিণত বয়সে লেখক-রূপেও আত্মপ্রকাশ ক'রে তিনি রচনাকার্যে নিযুক্ত হয়েছেন। কেবল শিকারকাহিনী নয়, গল্প ও উপন্যাসও। তাঁর ভাষা জোরালো।

প্রথমে সকলে তাঁকে গ্রহণ করেছিল উদীয়মান চিত্রকর ব'লে। তারপর সকলে জেনেছে তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর ভাস্কর। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে মানুষটি বহুরূপী। চিত্রকরের তুলি, ভাস্করের বাটালি, লেখকের কলম, সঙ্গীতবিদের বাঁশী, ব্যায়ামবীরের মুগুর ও শিকারীর বন্দুক. এ-সবেরই সদ্ব্যবহার করতে পারেন দেবীপ্রসাদ। একাধারে তাঁর মনের উপরে কাজ করেছে ক্ষত্রধর্মের সঙ্গে চিত্র, ভাস্কর্য, সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রভৃতি চারুকলা। ঠিক এই শ্রেণীর শাক্ত ও সব্যসাচী শিল্পী বাংলাদেশে তো দেখাই দেননি, ভারতের অন্য কোন প্রদেশেও আছেন ব'লে মনে হয় না।

চিত্রকলায় কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর বাঙালী শিল্পীর নাম করা

যায়। কিন্তু ভাস্কর্যকলা নিয়ে অবাহতভাবে সাধনায় নিযুক্ত হয়ে আছেন, এমন কোন উচ্চশ্রেণীর বাঙালী শিল্পীর নাম সেদিন পর্যন্ত আমরা জানতুম না, যদিও সখের খাতিরে এ বিভাগে মাঝে মাঝে হস্তক্ষেপ করেছেন, কোন কোন চিত্রশিল্পী। যেমন শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ। কিন্তু সে হচ্ছে খেলাচ্ছলে কোন-কিছু গ'ড়ে তোলা এবং তাও টুকিটাকি ভাস্কর্যের কাজ।

অনেক কাল আগে তাই প্রথম যেদিন শুনলুম, দেবীপ্রসাদ ভাস্কর্যকলাকেও বিশেষভাবে অবলম্বন করেছেন, তখন মনে জেগেছিল আনন্দের সাড়া। দেবীপ্রসাদের আমন্ত্রণে একদিন সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলুম। তাঁর হাতের কি কি কাজ দেখেছিলুম তা আর মনে নেই, তবে প্রমাণ নরদেহের চেয়ে ঢের বেশী উঁচু একটি মূর্তির কথা স্মরণ হচ্ছে। সেটি তাজহাটের রাজার—অর্থাৎ দেবীপ্রসাদের মাতুলের প্রতিমূর্তি।

তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গড়েছেন মূর্তির পর মূর্তি। একটু আগেই তাঁকে বলেছি সব্যসাচী। সত্যই তাই। তিনি সব্যসাচীর মতই দুই দক্ষ হাতে কাজ করতে পারেন। ডান হাতে ধরেন তুলি এবং বাম হাতে ধরেন বাটালি। আজ তাঁর ভারত-জোড়া নাম। তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী ভাস্কর। তাঁর কৃতিত্বের জন্যে আমরা অনায়াসেই গর্ব অনুভব করতে পারি।

কলকাতায় বার্ষিক শিল্পপ্রদর্শনী হয়। সেখানে গেলে বোঝা যায়, ভাস্কর্যকলার দিকে আজকাল তরুণ বাঙালী শিল্পীদের দৃষ্টি হয়েছে অধিকতর আকৃষ্ট। ভাস্করদের সংখ্যা অবশ্য বেশী নয়, দুই-চারিজনের দুই চারিটি হাতের কাজের নমুনা থাকে মাত্র। তবু এটা আশাপ্রদ লক্ষণ ব'লে ধ'রে নিতে পারি।

কিন্তু মনে হয়. আমাদের তরুণ ভাস্কররা গোড়াতেই গলদ ক'রে বসতে চান। কারণ অন্তর্মুখী নয় তাঁদের দৃষ্টি, তা হচ্ছে বহির্মুখী। পরিকল্পনার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেন না তাঁরা আপন আপন মনের ভিতর থেকে স্বাধীনভাবে। তাঁরা করতে চান অনুকরণ। তাঁদের চোখের সামনে সর্বদাই বিরাজ করে এপ্স্টিন,

জ্যাড্‌কাইন, বার্বারা হেপ্‌ওয়ার্থ, মুর, লিয়ন আণ্ডারউড, জন স্কিপিং ও রিচার্ড বেডফোর্ড প্রমুখ অতি-আধুনিক ভাস্করদের কাজ। তাঁদের চোখ দিয়ে তাঁরা গোড়া থেকেই দেখতে সুরু করেছেন মানুষ ও পৃথিবীকে। অথচ ভিতরের কথা কিছু বুঝেছেন ব'লে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বাংলার আধুনিক ভাস্কর্যকলা নবজাত শিশু, এখনো সে ভালো ক'রে চলতে শেখেনি কিংবা কোনরকম ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পারেনি। কিন্তু এর মধ্যেই সে যদি নিজের মায়ের কথা ভুলে বিদেশিনী বিমাতার স্তন্যপান করতে উদ্যত হয়, তাহ'লে নিশ্চয়ই তার কপালে নেই কল্যাণময়ী কলাকমলার আশীর্বাদ লাভ। আর্ট হচ্ছে সার্বজাতিক—এই একেলে ভুয়ো ফতোয়ার কোন মূল্য নেই। নিজের জাতীয়তা ভুললে কোন দেশের কোন আর্টই আপন পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সর্বজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না। আফ্রিকার বেনিন অঞ্চলের নিগ্রো ভাস্কর্যের কথা অর্ধশতাব্দী আগেও অবিদিত ছিল। সেখানকার অসভ্য শিল্পীরা গ্রীক বা মধ্য বা আধুনিক যুগের কোন ভাস্কর্যেরই নমুনা দেখেনি। তাদের প্রত্যেকেই পরিস্ফুট করতে চেয়েছে বিশেষ এক আদর্শে স্বকীয় পরিকল্পনাকেই। এই যে বিশেষ আদর্শ, এটা আসেনি তাদের দেশের বাহির থেকে এবং এইজন্যেই এর মধ্যেই আছে তাদের আর্টের জাতীয়তা। আজ তাই বেনিন ভাস্কর্য করতে পেরেছে পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ। উপরন্তু তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন আধুনিক পাশ্চাত্য ভাস্কররাও। ঠিক অনুরূপ কারণেই প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যও প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে পাশ্চাত্য শিল্পীদের মনের উপরে। তাকে অল্প-বিস্তর অবলম্বন ক'রে একাধিক বৈদেশিক শিল্পী আধুনিক যুগের উপযোগী মূর্তিগঠনও করেছেন। দুঃখের বিষয়, আমাদের আধুনিক শিল্পীদের দৃষ্টি এই সত্যটা দেখেও দেখতে পায় না।

বলেছি দেবীপ্রসাদের পুরুষোচিত দেহ ও পুরুষোচিত মন। তাঁর চিত্র ও ভাস্কর্যের মধ্যেও প্রকাশ পায় এই পৌরুষের ভাব। আর্টের ভিতর দিয়েও তিনি করতে চান শক্তিসাধনা। তাঁর আঁকা ছবিগুলির রেখার টানে ও বর্ণবিন্যাসে থাকে যে বলিষ্ঠতা, যে কোন

সাধারণ দর্শকও তার দ্বারা অভিভূত না হয়ে পারবে না। এইখানেই তাঁর প্রধান বিশিষ্টতা, যা অন্য কোন ভারতীয় শিল্পীর কাজে আবিষ্কার করা সহজ নয়।

দেবীপ্রসাদ মাদ্রাজের সরকারি চিত্রবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। তাঁর কথা সর্বদা মনে পড়লেও তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হবার সুযোগ আর ঘ'টে ওঠে না। তাই তিনি কলকাতায় এসেছেন শুনে কিছুকাল আগে এক সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম দু'জনে একান্তে ব'সে অতীত স্মৃতির রোমন্থনে খানিকটা সময় কাটিয়ে দেব। কিন্তু তা আর হ'ল না, কারণ গিয়ে দেখলুম, তাঁর ঘরে বসে গেছে একটি সাহিত্য-সভা। উপস্থিত আছেন শ্রীবলাই-চাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর (ইনিও কবি ও চিত্রশিল্পী), শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরো কেউ কেউ। অতীতের কথা আর উঠল না, বর্তমানকে নিয়েই আলাপ-আলোচনা ও হাস্য-পরিহাস চলতে লাগল—সঙ্গে সঙ্গে পানভোজন। খাবারের পর খাবার আসে—রীতিমত দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্। মুখ বন্ধ ক'রে ও ডান-হাতের-ব্যাপার সেরে যখন বাড়ীর দিকে ফিরলুম তখন নিশুতি রাত। নির্জন, নিস্তব্ধ, নিদ্রামগ্ন শহর। দেবীপ্রসাদ অতিথি সৎকার করতেও জানেন।

উনত্রিশ

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

"ভারতী"র আসরে তখনো নেবেনি সন্ধ্যাদীপ। বৈকাল থেকে নিত্য বসে আমাদের বৈঠক। আমাদের দেহ বাস করত ধাটির পৃথিবীতে, কিন্তু আমাদের মন বিচরণ করত চারুকলার রম্য ভুবনে।

কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের একটি মনিহারীর দোকানে দাঁড়িয়ে এটা-ওটা-সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, এমন সময়ে পাশে এসে দাঁড়ালেন একটি যুবক। রংটি কালো হ'লেও মুখশ্রী চিত্তাকর্ষক। আমার দিকে অল্পক্ষণ তাকিয়ে থেকে তিনি শুধোলেন, "আপনিই তো হেমেন্দ্রবাবু?"

আমি বললুম, "হ্যাঁ"।

যুবক বললেন, "আমার নাম শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।"

অচেনা নাম নয়। মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচিত কয়লা-কুঠী সংক্রান্ত গল্পগুলি তখন প্রশস্তি লাভ করেছে পাঠকসমাজে। কয়লার খনি এবং সেখানকার হাজার হাজার কুলিকে আমরাও অনেকেই দেখেছি। কিন্তু সে দেখা চোখের দেখা, মনের দেখা নয়। কুলির কাজ করে যে সব নর-নারী, তাদের দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট সুখদুঃখ আশা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আমরা কেহই পরিচিত হ'তে পারিনি—পরিচিত হবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশও করিনি। প্রবীণ লেখকরা উচ্চতর শ্রেণীর নরনারীদের নিয়ে রোমান্স রচনায় নিযুক্ত হয়ে থেকেছেন এবং নবীন লেখকরা মানুষের প্রথম রিপুটির উপরে বিসদৃশ ও অশোভন ঝোঁক দিয়ে পাঠক আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দরদী প্রাণ ও শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে শৈলজানন্দ প্রবেশ করেছেন কয়লাকুঠীতে ও কুলিদের পল্লীতে। ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন সেখানকার জীবনযাত্রা, সেখানকার মেঘ ও রৌদ্র, অশ্রু ও হাসির ছন্দ। এমন কি কয়লাকুঠীর চলতি ভাষা পর্যন্ত

কণ্ঠস্থ ক'রে ফেলতে ত্রুটি করেননি। হাতের ক্যামেরায় তুলে নেওয়া যায় কুলিদের জনবহুল বস্তীর হুবহু ফোটো। কিন্তু সেই সঙ্গে কুলিদের চিত্তবৃত্তি দেখাতে পারে কেবল মনের ক্যামেরাই। শৈলজানন্দও ব্যবহার করেছেন শেষোক্ত ক্যামেরা। তাঁর সুনির্বাচিত শব্দচিত্রে কুলিজীবনের যে সব বিচিত্র ও অপূর্ব দৃশ্য আমরা দেখেছি, আজ পর্যন্ত তা দেখাতে পারেননি আর কোন বাঙালী লেখক। বাইরের ফোটো, ভিতরের ফোটো। বাস্তবতার মধ্যে রোমান্স। কালো কয়লার গুঁড়োর ভিতরে আলো-করা হীরার টুকরো। শৈলজানন্দ কুলিবস্তির নিরতিশয় দারিদ্র্যের মধ্যেও আবিষ্কার করেছেন অভাবিত সাহিত্যসম্পদ।

শৈলজানন্দ নিজেই তাঁর আত্মপরিচয়। তখন আমি বললুম, "আপনার গল্প আমি পড়েছি। আমার খুব ভালো লাগে।"

শৈলজানন্দের সঙ্গে সেই হ'ল আমার প্রথম পরিচয়।

কয়লাখনির কুলিজীবন নিয়ে তিনি "মাসিক বসুমতী"তে প্রথম যে গল্প লিখেছিলেন, তখন তাঁর বয়স হবে কত? বাইশ কি তেইশের বেশী নয়। কিন্তু সেই বয়সেই লেখনীধারণ ক'রে তিনি দেখাতে পারতেন যথেষ্ট মুনশীয়ানা। অচিন্ত্য, প্রেমেন ও বুদ্ধদেব প্রভৃতির নাম তখনও অপরিচিত। শৈলজানন্দ তাঁদের চেয়ে বয়সেও বড় এবং নামও কিনেছেন তাঁদের আগে।

"কল্লোল" পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ ক'রে তিনি খ্যাতি লাভ করেননি বটে, কিন্তু কিছুকালের জন্যে তিনিও "কল্লোলে"র দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ছিল অতিশয় অর্থের অপ্রতুলতা এবং সে অনটন মেটাবার সাধ্য ছিল না "কল্লোলে"র। কাজেই অবশেষে দলছাড়া হয়ে তিনি "কালিকলমের" সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন এবং ঠিক ঐ কারণেই তাঁর পদানুসরণ করেন প্রেমেন্দ্রও।

তাঁর কয়লাকুঠীর গল্পগুলি পাঠ ক'রে আমরা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করতুম, এই একজন শক্তিশালী নূতন লেখক দেখা দিয়েছেন, যাঁর মধ্যে আছে প্রভূত সম্ভাবনার ইঙ্গিত। বাস্তবিক পাশ্চাত্য দেশের বহু লেখকই অনুরূপ শক্তিপ্রকাশ ক'রে একসঙ্গে পেয়েছেন লক্ষ্মী ও সরস্বতীর আশীর্বাদ। ডবলিউ ডবলিউ জেকব কেবল

সমুদ্রের নাবিকদের গল্প লিখেই রোজগার করেছেন কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। তিনি পরলোকে যান ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে উনআশী বৎসর বয়সে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত জীবনযাপন ক'রে গিয়েছেন একমাত্র সাহিত্যের দৌলতেই। ওখানে আরো কেউ কেউ খ্যাতিমান ও ধনবান হয়েছেন ইহুদীদের কিংবা নিগ্রোদের জীবনীচিত্র দেখিয়ে।

শৈলজানন্দও বাংলা কথাসাহিত্যে খুলেছিলেন একটি সম্পূর্ণ নূতন বিভাগ। তাঁর কয়লাকুঠীর গল্পগুলি প'ড়ে লোকে তাঁকে বাহবা দিয়েছিল খুব, কিন্তু টাকা দেয়নি বেশী। প্রথম বয়স থেকেই অর্থকৃচ্ছ্রতায় তিনি দারুণ কষ্টভোগ করেছেন। ব্রাহ্মণের ঘরের শিক্ষিত যুবক, বাস করতে হয়েছে বস্তিতে। ভাত-কাপড়ের জন্যে খুলতে হয়েছে পানের দোকান। লেখনীধারণ ক'রে নাম কিনলেন, অবস্থারও উন্নতি হ'ল অল্পবিস্তর, কিন্তু সে উন্নতিও উল্লেখযোগ্য নয়। যৎকিঞ্চিৎ ঘরে এলেও ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না।

এই তো আমাদের সাহিত্যিকদের অবস্থা। এইজন্যেই বাংলার কবিকে আক্ষেপ ক'রে বলতে হয়েছেঃ

"হায় মা ভারতি, চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে?
যে জন সেবিবে ও পদযুগল,
সেই সে দরিদ্র হবে।"

য়ুরোপের কবির মুখে এমন আক্ষেপ মানায় না। সেখানে সাহিত্য-সাধনার সঙ্গে নিশ্চিত দারিদ্র্যের সম্পর্ক নেই।

"কল্লোল" বন্ধ হ'ল, সম্পাদক দীনেশরঞ্জন ছুটলেন সিনেমা জগতে অর্থের সন্ধানে। তাঁর আগেই স্বর্গত "কল্লোলে"র অন্যতম সম্পাদক গোকুল নাগ এদিকে পথপ্রদর্শন করেছিলেন। তিনি আরো কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে Photoplay Syndicate of India নামে একটি চিত্র-সম্প্রদায় গঠন ক'রে Soul of a Slave নামে একখানি চমৎকার ছবি তুলেছিলেন এবং সেই ছবিতেই পর্দার গায়ে প্রথম দেখা দেন শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী। গোকুলবাবু (তিনি ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগের ভ্রাতা) অকালেই পরলোকগমন করেন, তাই চিত্রজগতে আর কোন উল্লেখযোগ্য দান রেখে যেতে পারেননি। কিন্তু বাংলাদেশের

সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথমে যোগ দেন চলচ্চিত্রশালায়। তারপর একে একে অনেক লেখকই ঐদিকে ছুটেছেন মধুলুব্ধ মধুকরের মত। শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী, দীনেশরঞ্জন দাস, "প্রবাসী" ও "মডার্ন রিভিউ"য়ের বর্তমান সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, "নাচঘরে"র সহকারী সম্পাদক শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য ও শ্রীপ্রণব রায় প্রভৃতি। শ্রীদেবকী বসুও প্রথম জীবনে ছিলেন মফস্বলের এক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। আমিও একসময়ে আকৃষ্ট হয়েছিলুম সিনেমার দিকে। বৎসর দুই হাতেনাতে কাজও করেছি নানা বিভাগে। পরিচালকরূপে পত্রিকায় একবার আমার নামও বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। কিন্তু সিনেমা আমাকে পুরোপুরি আবিষ্ট করতে পারেনি কোনদিনই। যথাসময়েই বুঝে নিয়েছিলুম একসঙ্গে সিনেমা ও সাহিত্যের জোড়া ঘোড়া চালাবার সাধ্য আমার হবে না। তাই পালিয়ে এসেছি আবার সাহিত্যজগতে। প্রেমাঙ্কুর, শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র প্রভৃতি তা পারেননি, তাই সাহিত্যসভা থেকে তাঁদের বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছে। অবশ্য প্রেমাঙ্কুর আবার নতুন ক'রে কলম ধরেছেন বটে। কিন্তু সিনেমার সঙ্গে এখন আর তাঁর কোন সম্পর্কও নেই।

কেবল সাহিত্যিক নন, অভিনেতা ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর অধিকাংশ শিল্পীও সিনেমা নিয়ে মাতলে নিজের ধর্মরক্ষা করতে পারে না। চিত্রশিল্পিরূপে শ্রীচারুচন্দ্র রায়ের তারকা হচ্ছিল ক্রমেই ঊর্ধ্বগামী। সিনেমা জগতে গিয়েও তিনি শিল্পকর্ম ছাড়েননি বটে, কিন্তু একক শিল্পিরূপে তিনি করতেন যে সব রূপসৃষ্টি, প্রকাশ করতেন নিজের যে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, রূপরসিকদের কি তা থেকে বঞ্চিত হ'তে হয়নি? সিনেমায় এখন তিনি কি করছেন না-করছেন বাইরে তার খবর আসে না। এবং তাঁর নিজের হাতে আঁকা কোন ছবিও আর কারুর চোখে পড়ে না। লোকে তাঁকে এর মধ্যেই ভুলে যেতে বসেছে। আর তাঁর চেয়ে বয়োকনিষ্ঠ শিল্পী দেবীপ্রসাদ নিজের সাধনায় অবহিত থেকে তাঁকে ছাড়িয়ে কত দূরে এগিয়ে যেতে পেরেছেন?

অনন্যসাধারণ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র এবং তাঁর এককালীন শিষ্য শ্রীশচীন্দ্র দেববর্মণকে দেখুন। বৈঠকী গানের আসরে কৃষ্ণচন্দ্রের

ব্যক্তিত্বের উচ্চতা বেড়ে উঠেছিল ক্রমশই। কিন্তু তাঁর সে উচ্চগতি আজ হয়েছে রুদ্ধ, কারণ তিনি এখন সিনেমার প্রেমে মশগুল। তবু তো তিনি বেশ কিছু কাল ধ'রে দরাজ হাতে দান ক'রে গিয়েছেন নব নব আনন্দ। কিন্তু শচীন্দ্রদেব উদীয়মান অবস্থাতেই প্রধান ক'রে তোলেন টাকার ধান্ধা। তারপর থেকে তিনি একান্তভাবেই চিত্রজগৎবিহারী হয়ে স্বদেশী গানের আসর ছেড়ে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছেন বোম্বাই সহরের এ স্টুডিও থেকে ও স্টুডিওয়। ব্যাঙ্কের খাতায় অঙ্ক বাড়ছে নিশ্চয়ই, কিন্তু বোবা হয়ে গেছে তাঁর ব্যক্তিগত মুখর আর্ট!

চলচ্চিত্র যে শিল্পীদের ব্যক্তিগত শক্তির পরিপন্থী, রবীন্দ্রনাথেরও ছিল এই ধারণা। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ হচ্ছেন রবীন্দ্রসংগীতে বিশেষজ্ঞ এবং আজন্ম শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্র। সিনেমাওয়ালারা তাঁকেও দলে টানবার জন্যে চেষ্টা করেছিল। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পত্র লিখে রবীন্দ্রনাথের মতামত জানতে চান। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে যে উষ্ণ উত্তর দেন, তা পাঠ ক'রে শান্তিদেব সিনেমাওয়ালাদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান ক'রে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখেন।

জীবিকা নির্বাহের জন্যে অর্থের প্রয়োজনীয়তা কে অস্বীকার করে? কিন্তু অর্থাগম হ'লেই শিল্পসৃষ্টির কথা ভুললে শিল্পীর জন্যে দুঃখ হয়। বিগত যুগের অধিকাংশ বাঙালী সাহিত্যিকই লেখবার সময়ে টাকার কথা মনেও আনতেন না এবং ভারতবর্ষে বাংলা সাহিত্যের অতুলনীয় সমৃদ্ধির জন্যে পনেরো আনা গৌরব তাঁদেরই প্রাপ্য। এখনকার শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে দেখুন। যখন তাঁর জেব ছিল রিক্ত, তখনও তাঁর কলমের বিরাম ছিল না। এখন পদস্থ সরকারি চাকুরে হয়ে অর্থের জন্যে নেই তাঁর কোনই দুর্ভাবনা, কিন্তু আজও তাঁর লেখনী অত্যন্ত অশ্রান্ত। এইখানেই পাওয়া যায় সাহিত্যিক মনোবৃত্তির পরিচয়। সুবর্ণপিঞ্জরে বন্দী করলেও বনের পাখীকে ভুলানো যায় না অরণ্যের সংগীত। আসুক সুখ, আসুক দুঃখ, সত্যিকার শিল্পীকে করতে হবেই শিল্পসৃষ্টি। প্রেমেন্দ্র ও শৈলজানন্দকে আমি সত্যিকার সাহিত্যিক ব'লেই শ্রদ্ধা করি। তাই তাঁদেরও মধ্যে দেখতে চাই সাহিত্যিক মনোবৃত্তি।

আমি তখন কালী ফিল্মের একখানি গীতিনাট্য-চিত্রের (বিদ্যাসুন্দর) জন্যে গান রচনার এবং নৃত্য পরিকল্পনা ও পরিচালনার ভার পেয়েছি। স্টুডিওতে যেতে হয় প্রত্যহ। সেই সময়ে একদিন কালী ফিল্মের মালিক বন্ধুবর শ্রীপ্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় আমার হাতে একখানা কেতাব দিয়ে বললেন, "হেমেনদা, বইখানা প'ড়ে দেখবেন তো, ছবিতে জমবে কি না?"

বইখানির নাম "পাতালপুরী"। লেখক শৈলজানন্দ। এও কয়লাকুঠীর কাহিনী। এ শ্রেণীর লেখায় শৈলজানন্দের জোড়া নেই। সুতরাং গল্পটি যে ভালো লাগল সে কথা বলা বাহুল্য। কেবল সাধারণ গল্প হিসাবে নয়, চিত্রকাহিনী হিসাবেও তার উপযোগিতা ছিল যথেষ্ট। প্রিয়বাবুকে সেই কথাই বললুম।

প্রিয়বাবু যথেষ্ট শ্রম, যত্ন ও আয়োজন ক'রে ছবিখানি তুলেছিলেন। কয়লাখনির ভিতরকার দৃশ্য যথাযথভাবে দেখাবার জন্যে তাঁর অর্থব্যয়ও বড় কম হয়নি। নজরুল ইসলাম নিয়েছিলেন গান রচনার ও সুর সংযোজনার ভার। শৈলজানন্দ নিজেও দেখা দিয়েছিলেন একটি ছোট ভূমিকায়।

ছবিখানি ভালো হ'লেও আশানুরূপ অর্থকর হয়নি। কিন্তু শৈলজানন্দ সেই যে চিত্রজগতের অন্দরমহলে ঢুকে পড়লেন, আজ পর্যন্ত আর বেরিয়ে আসেন নি। সে বোধ হয় আঠারো-উনিশ বৎসর আগেকার কথা।

আগে তিনি মাঝে মাঝে আমার বাড়ীতে এসে দেখা দিতেন। আমি বরাবরই শিল্পীদের সাহচর্য ভালোবাসি। তাঁকে পেলে খুশী হতুম।

একদিন দেখিয়েছিলুম তাঁকে নৈশজীবন। কলকাতায় নয়, চন্দননগরে। সেখানে গঙ্গার ধারে ছিল স্যাভয় হোটেল। সেখানে বাঙালীরা বড় একটা উঁকিঝুঁকি মারত না বা মারতে সাহস করত না। সেখানে হেসে-গেয়ে-নেচে আসর রাখত সাহেবমেমরাই। হোটেলের স্বত্বাধিকারিণী রুসীয় মহিলা ম্যাডাম লোলা ছিলেন আমার বন্ধু। তাঁর আমন্ত্রণে আমার সাহিত্যিক ও শিল্পী সুহৃদদের নিয়ে প্রায়ই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতুম। একদিন সন্ধ্যার পর সেখানে নিয়ে গেলুম শৈলজানন্দকেও এবং ফিরে এলুম পরদিন [illegible] পর।

ত্রিশ

সজনীকান্ত দাস

লিখতে লিখতে একটা কথা মনে হ'চ্ছে, তাও এখানে লিখে রাখিনা কেন?

অর্দ্ধশতাব্দী আগে যখন আমার সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত হয়, সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের পরলোকগমনের পর তখনও এক যুগ অতীত হয়নি। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব উত্তরোত্তর বেড়ে উঠছিল বটে, কিন্তু তখনও এখানে সাহিত্যাচার্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যশিল্পী রূপে অভিনন্দিত হতেন বঙ্কিমচন্দ্রই। তাঁর সহকর্মী বা সমসাময়িকদের অধিকাংশই তখনও সশরীরে বর্তমান। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত সাহিত্যে ও শিল্পে স্বনামধন্য অধিকাংশ ব্যক্তির সঙ্গেই সংযোগস্থাপনের দুর্লভ সুযোগ আমি লাভ করেছি এবং এই সৌভাগ্যের জন্যে আত্মপ্রসাদও অনুভব করি মনে মনে। গত অর্ধশতাব্দী ধ'রে অতীতের ও বর্তমানের নানাশ্রেণীর ধুরন্ধরদের আমি নিজে যেমন ভাবে দেখেছি, ঠিক সেই ভাবে দেখাবার জন্যেই গ্রন্থে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলি লিখিত হয়েছে। "যাঁদের দেখেছি" এবং "এখন যাঁদের দেখছি" এই দুইখানি পুস্তকের মধ্যে আমি সাজিয়ে রাখলুম অর্ধশতাব্দীর সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ছবির মালা। জীবনের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি, পাছে আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এই সব ব্যক্তিগত ছবি লুপ্ত হয়ে যায়, তাই সময় থাকতে থাকতেই কাগজ-কলম দিয়ে এগুলিকে এঁকে রাখবার চেষ্টা করছি।

সাহিত্যক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিগত কার্যক্ষেত্রকে অনেকে পৃথক ক'রে দেখতে অভ্যস্ত নন। তাই সময়ে সময়ে জীবনের শান্তিভঙ্গ হয়। একাধিক পত্রিকায় সমালোচকের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে হারিয়েছি আমি একাধিক বন্ধুকে। আমি তাঁদের এখনো বন্ধু ব'লেই মনে

করি, কিন্তু আমার সমালোচনা তাঁদের মনের মত হয়নি ব'লে তাঁরা আমাকে শত্রু ব'লেই ধ'রে নিয়েছেন।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে আর একটা কথাও ব'লে নি। "বোবার শত্রু নেই'—এ উক্তি মিথ্যা। আমার এক বিখ্যাত ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমার সঙ্গে পত্রালাপ ও বাক্যালাপ দুইই বন্ধ ক'রে দিয়েছেন, কারণ তাঁর রচনা সম্বন্ধে আমি ভালোমন্দ কিছুই বলিনি।

অতঃপর যা বলছিলুম। আমার তো মনে হয়, ব্যক্তিগত আমি এবং সাহিত্যগত আমি—এই দুই আমিকে এক ব'লে স্বীকার না করলে যথেষ্ট ঝঞ্ঝাট ও হৃদয়দাহ থেকে অব্যাহতি লাভ করা যায়। সাহিত্য-ক্ষেত্রে ঐকমত্য নেই ব'লে বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর মনের অনৈক্য হবে কেন? আমি বেশ ভালো ক'রেই জানি, আমার কোন কোন বন্ধু লেখক হিসাবে আমাকে পছন্দ করেন না। কিন্তু সেজন্যে আমার মনে কোন গ্লানিই পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠেনি, অম্লানবদনে তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করি, তাঁরা যে আমার লেখা ভালো বলেন না, এটা আমি জানি ব'লেও তাঁদের জানতে দিইনি। তাঁরা যে বন্ধুরূপে আমাকে পছন্দ করেন, আমার পক্ষে সেইটুকুই পরম লাভ। সকলের লেখা সকলের ভালো লাগে না। এ সত্য মেনে না নিলে পৃথিবীতে জীবনযাত্রা হয় অসহনীয়।

আগে ছিলেন বন্ধু, পরে প্রতিকূল সমালোচনায় হয়ে দাঁড়ালেন শত্রুর মত,—এও যেমন দেখেছি, তেমনি এও দেখেছি যে, আগে বিরুদ্ধ সমালোচনায় আহত হয়ে পরে বন্ধুরূপে কাছে এসে কেউ কেউ আমার সঙ্গে করেছেন সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপন। এও লক্ষ্য করেছি যে, শেষোক্ত শ্রেণীর বন্ধুদের সঙ্গে পরে মতের অমিল হ'লেও আর মনের অমিল হয় না। আমার এই রকম এক বন্ধু হচ্ছেন শ্রীসজনীকান্ত দাস।

সেটা হচ্ছে ১৩৩৪ সাল। তখনও সজনীকান্তের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি, তবে এর-ওর মুখে শুনতুম, তিনি "প্রবাসী" পত্রিকার কার্য্যালয়ের কর্মচারী। তিনি এবং উক্ত পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায় "শনিবারের চিঠি" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং মোহিতলাল

মজুমদার ও শ্রীনীরদ চৌধুরী প্রভৃতি তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। আমি তখন "নাচঘর" পত্রিকার সম্পাদক।

"ভারতী" সবে উঠে গিয়েছে। স্বর্গীয় বন্ধুবর দীনেশরঞ্জন দাশ সম্পাদকের আসনে আসীন হয়ে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীবুদ্ধদেব বসু ও শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ তরুণ লেখকদের নিয়ে খুব ঘটা ক'রে চালাচ্ছেন "কল্লোল" পত্রিকা। আমিও ছিলুম "কল্লোলের" লেখক।

"শনিবারের চিঠি"তে কিছু কিছু সুলিখিত ও সুচিন্তিত সন্দর্ভ প্রকাশিত হ'ত, কিন্তু সে বেশী ঝোঁক দিয়েছিল রঙ্গব্যঙ্গ ও সমসাময়িক পত্রিকার দোষকথনের দিকে। কোথায় কে কামজ রচনার বেসাতি করছে, "চিঠি" হ'ত তারই সন্দেশবহ। কেবল সে খবরদার হয়ে হরেক রকম টীকাটিপ্পনী কেটে কটূক্তি করত না, ঐ সঙ্গে করত সেই সব ধিক্কৃত রচনা থেকে নমুনার পর নমুনা উদ্ধার। সেই সব উদ্ধৃতির মধ্যে থাকত যে অশ্লীলতা, তা উপভোগ করবার জন্যে পাঠকেরও অভাব হ'ত না। এই ভাবে "শনিবারের চিঠি" আসর সরগরম ক'রে দস্তুরমত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

"শনিবারের চিঠি"র বাক্যবাণের প্রধান চাঁদমারি হয়ে ওঠে "কল্লোল" পত্রিকা। প্রথমে আমি রেহাই পেয়েছিলুম। কিন্তু তারপর আমার উপরেও আক্রমণ সুরু হ'ল। গদ্যে ও পদ্যে—অত্যন্ত ঝাঁঝালো ভাষায়। আদিরস পরিবেশনের জন্যে আমি আক্রান্ত হইনি। তাই মনে হয় আমার একমাত্র অপরাধ ছিল আমি "কল্লোলের" লেখক। সঙ্গদোষে আমিও হয়েছিলুম "নষ্ট"।

অবশেষে আমিও মৌনব্রত ভঙ্গ করতে বাধ্য হলুম এবং অন্য-পক্ষও একই খেলা খেলতে পারে দেখাবার জন্যে "নাচঘরে" খুললুম "রংমহলের পঞ্চরং" নামে একটি নূতন বিভাগ। গদ্যে ও পদ্যে দিতে লাগলুম পাল্টা জবাব। অচিন্ত্যকুমার প্রমুখ কয়েকজন কবি ও লেখক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে অল্পবিস্তর সাহায্য করেছিলেন বটে, কিন্তু "নাচঘরে"র অধিকাংশ রচনা ছিল আমারই লেখনীপ্রসূত। 'চিঠি'র ব্যঙ্গকবিতাগুলির রচয়িতা ছিলেন সজনীকান্ত। সেই লেখনীযুদ্ধ জনসাধারণের চিত্তরোচক হয়েছিল।

কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নয়, ব্যাপারটা সুরু হয়েছিল কৌতুকচ্ছলেই—যদিও কৌতুকটা গড়িয়েছিল যেন কিছু বেশীদূর পর্যন্ত। এবং আমার পক্ষেই সুবিধা ছিল অধিক। "শনিবারের চিঠি" মাসিক, "নাচঘর" সাপ্তাহিক। "চিঠি" মাসে একবার বচনবাণ ছাড়লে, আমি বাক্যবুলেট ছোঁড়বার সুযোগ পাই মাসে চারবার। এইভাবে চলল কিছুকাল।

প্রথমে আক্রমণ আরম্ভ ক'রে শেষটা "শনিবারের চিঠি'ই প্রথমে দিলে রণে ক্ষান্ত। তুষ্ণীভাব অবলম্বন করল আমারও লেখনী।

খেলাচ্ছলেই আমরা দাঁড়িয়েছিলুম পরস্পরের বিরুদ্ধে, আমাদের মধ্যে ছিল না কিছুমাত্র রেষারেষির ভাব। তাই কিছুদিন পরে যখন পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হলুম, বেশ সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে দুজনেই গ্রহণ করলুম দুজনকে। আমাদের বিরোধটা ছিল অভিনয় মাত্র।

আসল কথা বলতে কি, ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে সজনীকান্ত "কল্লোলের" দলকেও আক্রমণ করেছিলেন ব'লে মনে হয় না। সেও ছিল ভান। "শনিবারের চিঠি"র চাহিদা বাড়াবার জন্যেই তিনি তুলেছিলেন অশ্লীলতার অজুহাত। ব্যবসাদারি চাল ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ যে শ্রেণীর রচনার জন্যে তিনি "কল্লোল"কে আক্রমণ করতেন, ঠিক সেই শ্রেণীর গল্পই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর "শনিবারের চিঠি"তে।

"কল্লোল যুগ" গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন : "পুরীতে বেড়াতে গিয়েছি বুদ্ধদেব আর আমি। আর অজিত। একদিন দেখি সমুদ্র থেকে কে উঠে আসছে। পুরাণে-মহাভারতে দেখেছি কেউ কেউ অমনি উদ্ভূত হয়েছে সমুদ্র থেকে। তাদের কারুর হাতে বিষভাণ্ডও হয়তো ছিল। কিন্তু এমনটি কাউকে দেখব তা কল্পনাও করতে পারি নি। স্বর্গ-নৃত্য সভার কেউ নয়, স্বয়ং সজনীকান্ত।

একই হোটেলে আছি। প্রায় একই ভোজনভ্রমণের গণ্ডীর মধ্যে। একই হাস্য পরিহাসের পরিমণ্ডলে।

সজনীকান্ত বললে, কেবল বিষভাণ্ড নয়, সুধাপাত্রও আছে। অর্থাৎ বন্ধু হবারও গুণ আছে আমার মধ্যে।"

সজনীকান্ত অত্যুক্তি করেননি। তাঁর মধ্যে বন্ধু হবার গুণ আছে এবং অপরকেও তিনি খুব সহেজই বন্ধুরূপে আকৃষ্ট করতে পারেন। এই গুণের জন্যেই তিনি কয়েকজন প্রখ্যাত রচনাকুশল সাহিত্যিককে নিয়ে একটি শক্তিশালী নিজস্ব গোষ্ঠী গঠন ক'রে "শনিবারের চিঠি"র মত নতুন ধরণের পত্রিকাকে সার্থক, লোকপ্রিয় ও দীর্ঘজীবী ক'রে তুলতে পেরেছেন। "প্রবাসী", "ভারতবর্ষ" ও "বসুমতী"র মত সুবৃহৎ সুচিত্রিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকার কথা ছেড়ে দি, "চিঠি" যে সময়ে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, তখনকার আর কোন মাসিক পত্রিকা আজ পর্যন্ত এমনভাবে সজীব হয়ে বাজার দখল ক'রে রাখতে পারেনি। বরাবর দেখে আসছি, এদেশের ছোট ছোট ও মাঝারি মাসিক কাগজগুলি ভেকচ্ছত্রের মত দলে দলে জন্ম-গ্রহণ করে, যেন অনতিবিলম্বে মৃত্যুমুখে পড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়েই। অকালমৃত্যুই যেখানে প্রায়নিশ্চিত, ক্ষুদ্র "শনিবারের চিঠি" সেখানে অভাবিত রূপে কেবল সুদীর্ঘ পরমায়ুরই অধিকারী হয়নি, উপরন্তু ক্রমে ক্রমে অধিকতর পরিপুষ্টি লাভ ক'রে রীতিমত গরিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তার সমসাময়িক ও প্রধান প্রতিযোগী "কল্লোল' আসর জমাবার জন্যে রীতিমত হুল্লোড় তুলেছিল এবং সেও লাভ করেছিল এক বিশেষ শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠীর কাছ থেকে অকৃপণ রচনা-দাক্ষিণ্য। কিন্তু জীবনযুদ্ধে হার মেনে তাকেও বরণ করতে হয়েছে অকালমৃত্যু।

চাহিদা বাড়াবার জন্যে "শনিবারের চিঠি"কে যে প্রথম প্রথম কিছু কিছু উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়েছিল, এ সত্য স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। কিন্তু স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হবার শক্তি অর্জন করবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সে সংস্কৃত ও যথার্থরূপে গুণসুন্দর ক'রে তুলতে পেরেছে। "শনিবারের চিঠি" হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলা ভাষার একখানি শ্রেষ্ঠ পত্রিকা। সমাজপতির "সাহিত্য", দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর "নব্যভারত" এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের "প্রবাসী"র মত "শনিবারের চিঠি"ও সজনীকান্তের নিজস্ব অবদানরূপে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কিন্তু "চিঠি", তাঁর একমাত্র কীর্তি নয়। তিনি হচ্ছেন কবি।

ভালো কবি। কবিতা লেখেন মিল দিয়ে এবং মিল না দিয়েও। তাঁর অমিতাক্ষরে একটা বিশিষ্টতা আছে। অন্য অনেকের মত যথেচ্ছাচার করবার জন্যে তিনি বেমিল কবিতা লিখতে ব'সে ছন্দবন্ধনকে ছিঁড়ে ফেলে উচ্ছৃংখল হয়ে উঠতে চান না, তিনি জানেন, ছন্দ হারালে কবিতা হারিয়ে ফেলে তার আত্মার অনেকখানি। আমার দ্বারা সম্পাদিত "ছন্দা" পত্রিকায় সজনীকান্তের কাব্যগ্রন্থ "রাজহংসে"র সমালোচনা-কালে এ সম্বন্ধে আমি অধিকতর বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি, এখানে আর নতুন ক'রে কিছু বলবার নেই।

সজনীকান্ত হাত দিয়েছেন আরো নানা বিভাগে। উপন্যাস লিখেছেন। সাহিত্য-প্রবন্ধ লিখেছেন। সমালোচনা লিখেছেন—এমন কি চিত্রনাট্যও বাদ দেননি। তিনি একজন চৌকস লেখক।

পুরাতন সাহিত্যের দিকেও দৃষ্টি তাঁর জাগ্রত। এ বিভাগেও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকর্মী হয়ে তিনি নানাভাবে বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেও তাঁর অবদান আছে। এখন তাঁর কাব্যকলাচর্চায় কিঞ্চিৎ ঢিলা পড়েছে, পরিষদের নানা কার্যে নিজেকে তিনি নিযুক্ত ক'রে রেখেছেন।

একালে দুর্লভ হয়ে উঠেছে সাহিত্য-বৈঠক। কিন্তু সজনীকান্ত যে যুগে সাহিত্যিকরূপে মানুষ হয়ে উঠেছিলেন, তখন বিভিন্ন সাহিত্য-বৈঠকেই ছিল শিল্পীদের মনের মত হাঁপ ছাড়বার জায়গা। "শনিবারের চিঠি"র কার্যালয়েও মাঝে মাঝে পদার্পণ ক'রে দেখেছি, এখনো সেখানে আগেকার মত বৈঠকী রীতি বজায় রাখা হয়েছে। আসেন-যান সাহিত্যিকগণ, হাতে সিগারেট ও সামনে চায়ের পেয়ালা নিয়ে আলাপ-আলোচনায় করেন চিত্ত-বিনোদন। নিজের বাড়ীতে এবং অন্যান্য আসরেও সজনীকান্তের সান্নিধ্য লাভ ক'রে উপলব্ধি করতে পেরেছি, তাঁর সঙ্গ হচ্ছে অতিশয় উপভোগ্য।

একত্রিশ

কল্লোলের দল

"কল্লোল যুগ" নামে একখানি বই বেরিয়েছে, লেখক হচ্ছেন শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। বইখানি ভালো লাগল। পূর্বস্মৃতির কাহিনী ভালো ক'রে গুছিয়ে বলতে পারলে বরাবরই উপভোগ্য হয়ে ওঠে। মানুষ যৌবনের সীমানা পেরিয়ে যতই প্রাচীনতার দিকে অগ্রসর হয়, ততই তার মন ফিরে ফিরে আসে অতীতের দিকে। কারণ অতীতে থাকে সুখের শৈশব, উৎসবমুখর যৌবন। এমন কি অতীতের অশ্রুও হয় না তেমন বেদনাদায়ক।

প্রাচীনদের ভবিষ্যতে থাকে মৃত্যুর দুঃস্বপ্ন। বর্তমানকে নিয়েও হয় না তারা পরিতুষ্ট। তাই সর্বদেশের সর্বকালের বৃদ্ধেরাই চিরদিনই অতীতের দিকে ফিরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব'লে ওঠে—"হায়রে সোনার সেকাল!" সকলেই এ বিলাপ আগেও শুনেছে, আজও শুনছে এবং ভবিষ্যতেও শুনবে। এই অতীতপ্রীতির ফলেই হয় স্মৃতিকথার জন্ম।

কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে, আমাদের দেশে "কল্লোল যুগ" ব'লে কোন যুগের অস্তিত্ব ছিল কি? ক্ষুদ্র পত্রিকা "কল্লোলে"র পরমায়ু দীর্ঘকালস্থায়ী হয়নি এবং তাকে যুগস্রষ্টা ব'লেও গ্রহণ করা চলে না। "কল্লোলে"র সময়েই তার সমধর্মী আর একখানি পত্রিকা ছিল—"কালি-কলম"। "ভারতী" বেঁচে থাকতে থাকতেই "কল্লোলে"র জন্ম এবং "ভারতী"র আসরে আর একদল শক্তিশালী আধুনিক সাহিত্যিক সাহিত্যসাধনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের সামনেও ছিল বিশেষ এক আদর্শ। উপরন্তু "শনিবারের চিঠি"তেও আর এক শ্রেণীর সুলেখক নিয়মিতভাবে লেখনীচালনা করতেন (এই সঙ্গে "প্রবাসী", "মানসী ও মর্মবাণী" "মাসিক বসুমতী" ও 'ভারতবর্ষে"র নাম না করলেও চলে, কারণ ওগুলি ছিল সব দলের পত্রিকা)।

মোট কথা হচ্ছে এই, পূর্বকথিত কোন পত্রিকাকেই নবযুগের প্রবর্তক ব'লে গণ্য করা যায় না। তাদের কারুর আদর্শ ও রচনা ভঙ্গিই আজ পর্যন্ত সার্বজনীন হ'তে পারে নি। রবীন্দ্রনাথের জীবনকালের মধ্যে জন্মগ্রহণ ক'রে তারা প্রত্যেকেই লালিত হয়েছে রবীন্দ্রপ্রভাবের মধ্যেই। সুতরাং আসলে সেটা ছিল রবীন্দ্রযুগ। ছিল বলি কেন, এখনো আমরা রবীন্দ্রযুগের প্রভাবের দ্বারাই আচ্ছন্ন হয়ে আছি। রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করা তো দূরের কথা, অদ্যাবধি আর কেউ তাঁর কাছাকাছি গিয়েও হাজির হ'তে পারেন নি। অতি-আধুনিক লেখক যাযাবর রচিত "দৃষ্টিপাত" অতিশয় লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং "দৃষ্টিপাত" যে সার্থক-রচনা, সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ নেই। কিন্তু তার মধ্যেও সর্বত্র পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের প্রভূত প্রভাব। রবীন্দ্রসাহিত্য হচ্ছে মহানদের মত। "ভারতী", "কল্লোল", "কালি-কলম" ও "শনিবারের চিঠি" প্রভৃতি হচ্ছে সেই মহানদ থেকে নির্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখার মত, কিছু দূর অগ্রসর হয়েই যারা হারিয়ে যায়, শুকিয়ে যায় বালুকাবিতানের ভিতরে। "কল্লোল যুগ" হচ্ছে অশ্রুতপূর্ব কথা। তবে হ্যাঁ, "কল্লোলে"র একটি নিজস্ব দল ছিল বটে এবং সে দল গঠিত হয়েছিল কয়েকজন রচনাকুশল তরুণ সাহিত্যিকের দ্বারা। আজ তাঁরা চল্লিশের কোঠা পেরিয়ে পঞ্চাশের কোঠায় চলা-ফেরা করছেন এবং সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে কিনেছেন যথেষ্ট সুনাম।

সেই দলের নেতা ছিলেন স্বর্গীয় দীনেশরঞ্জন দাস। দীনেশ আমার বাল্যবন্ধু ও সমবয়সী। আমি যখন এগারো-বারো বছর বয়সের বালক, তখন আমার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ীতে মাঝে মাঝে তাঁর দেখা পেতুম। তারপর সুদীর্ঘকাল আর দীনেশের দেখা পাইনি, তাঁর কথা আমি প্রায় ভুলে গিয়েছিলুম বললেও অত্যুক্তি হবে না।

দুই যুগেরও বেশী কাল কেটে গেল। হঠাৎ খবর পেলুম দীনেশ একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। আমাদের "ভারতী" কার্যালয়ের অনতিদূরে অবস্থিত কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের ছোট্ট একটি কার্যালয় থেকে ছোট্ট কাগজ "কল্লোল" প্রকাশিত হ'ত। দীনেশের

সঙ্গে দেখাও হ'ল এবং দুইজনেই আবার ধরলুম পুরাতন বন্ধুত্বের খেই। দুই-একদিন "কল্লোল" কার্যালয়েও হাজিরা দিলুম, কিন্তু সেখানকার আসর তখনও ভালো ক'রে জমে ওঠেনি। এ হচ্ছে ১৯২৪ কি ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের কথা।

সেই সময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পরলোকগমন করেন। দীনেশের অনুরোধে দেশবন্ধুর তিরোধান উপলক্ষ্যে একটি কবিতা রচনা ক'রে "কল্লোল" কার্যালয়ে দিয়ে এলুম। "কল্লোলে"র জন্যে সেই আমার প্রথম রচনা। তার কিছুকাল পরে "কল্লোলে"র কার্যালয় উঠে যায় পটুয়াটোলায় এবং পত্রিকার আকারও কিছু বাড়ে। তার পৃষ্ঠায় ছাপা হয় আমার কয়েকটি কবিতা এবং দুই-একটি ছোট গল্প। "কল্লোল" কার্যালয়েও গিয়ে মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছি। সে ঘর-খানিও ছোট এবং সেখানকার বৈঠকও ছিল না আমাদের "ভারতী"র মত বড়। কিন্তু সেই অপ্রশস্ত ঘরে প্রশস্ত চিত্ত নিয়ে যে কয়েকটি তরুণ হামেসাই ওঠা-বসা করতেন, তাঁদের চক্ষে ছিল মনীষার দীপ্তি, তাঁদের মুখে ছিল সাহিত্যের বাণী এবং তাঁদের মনেও ছিল বোধ করি নিজেদের ভবিষ্য সম্ভাবনা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। অপরিসর জায়গার মধ্যে কোনক্রমে নিজেদের কুলিয়ে নিয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে কিম্বা সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তাঁরা করতেন কলালাপ, করতেন গল্পগুজব, করতেন হাস্য-পরিহাস। জীবনের বন্ধুর যাত্রাপথে অনেক দূর এগিয়ে এসেও আজও তাঁরা নিশ্চয় ভুলতে পারেন নি পিছনে-প'ড়ে-থাকা আশায়-আনন্দে রঙিন সেই সুমধুর দিনগুলিকে। অন্ততঃ অচিন্ত্যকুমার যে ভুলতে পারেন নি তার নজীর হচ্ছে তাঁর "কল্লোল যুগ"।

"কল্লোল" পয়সা খরচ ক'রে বিজ্ঞাপন দিত না বটে, কিন্তু তার নাম [illegible]ভাবে বিজ্ঞাপিত করবার জন্যে প্রদীপ্ত উৎসাহে নিযুক্ত হয়েছিলেন "শনিবারের চিঠি"র দল। তার ফলে লাভবান হয়েছিল উভয় পক্ষই। বেড়ে উঠেছিল দুই পত্রিকারই গ্রাহক-সংখ্যা। নানা রচনায় স্থলবিশেষ উদ্ধার ক'রে "শনিবারের চিঠি" প্রমাণিত করতে চাইলে, "কল্লোল" হচ্ছে একখানা অপাঠ্য, অতি অশ্লীল পত্রিকা। বঙ্কিমচন্দ্র কোথায় যেন এই মর্মে বলেছিলেন যে, কোন কোন দুরন্ত

ছেলে ভূতের ভয় দেখালে ভয় পায় না, উল্টে ভূতকে দেখবার জন্যেই আগ্রহ প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় অনেকটা সেই রকমই। "কল্লোলে" অশ্লীল গল্প বেরোয় শুনে অনেকেই তা পাঠ করবার জন্যে ট্যাঁকের কড়ি ফেলতে লাগল। সুতরাং "শনিবারের চিঠি"র গালাগালি "কল্লোলে"র পক্ষে হয়ে দাঁড়াল শাপে বরের মতই।

শনিবারের চিঠির অভিযোগ নিয়ে আমি এখানে মাথা ঘামাতে চাই না। অশ্লীলতার জন্যে "কল্লোল"কে আক্রমণ হয়তো অন্য কোন উদ্দেশ্যসাধনের একটা উপলক্ষ্য মাত্র। কারণ তথাকথিত অশ্লীলতার আশ্রয় না নিলেও আক্রান্ত হতেন "কল্লোলে"র লেখকরা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিজের কথাই বলতে পারি। "কল্লোলে" প্রকাশিত আমার কোন কোন কবিতাও ধিক্কৃত হয়েছে "শনিবারের চিঠি"তে। কিন্তু অশ্লীলতার জন্যে এ পরিবাদ নয়, আমি আক্রান্ত হয়েছি কেবল "কল্লোলে"র লেখক ব'লেই।

কি যে শ্লীল আর কি যে অশ্লীল, তার মানদণ্ড নির্ধারণ করা সহজ নয়। সমস্তই নির্ভর করে এক এক শ্রেণীর পাঠকের মানসিক প্রতিক্রিয়ার উপরে। "ম্যাডাম বোভারি" রচনা করে অশ্লীলতার জন্যে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হয়েছিলেন ফরাসী সাহিত্যাচার্য ফ্লবেয়ার। কিন্তু সেই "ম্যাডাম বোভারি"ই আজ স্থান পেয়েছে বিশ্বসাহিত্যে। এমন আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

কিন্তু একটা সত্য অস্বীকার করতে পারি না। "কল্লোল" সম্পাদকের মনের গড়ন ছিল একটু অদ্ভুত। গল্প হচ্ছে গল্পই। আর্ট হিসাবে যদি তা নির্দোষ হয়, তাকে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে আপত্তি থাকতে পারে না, থাকা উচিত নয়। দীনেশ কিন্তু একথা মানতেন না। তাঁর ফরমাশে একবার একটি ছোট গল্প রচনা করলুম। তারপর গল্পটি তাঁকে শুনিয়ে এলুম "কল্লোল" কার্যালয়ে গিয়ে। সেখানে আর একজন সাহিত্যিকও (মনে হচ্ছে, শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়) উপস্থিত ছিলেন।

প্রায় দুই যুগ আগেকার ঘটনা। গল্পটির হুবহু আখ্যানবস্তু স্মরণে আসছে না। তবে মোটামুটি তা বোধ হচ্ছে এই রকম : অতি সাধারণ পরিবারের একটি পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিতা রূপসী তরুণী।

স্বামী তার নিঃস্ব ও রোগশয্যায় শায়িত। সমাজের উচ্চতর স্তরে সুনীতি ও দুর্নীতির যে বাঁধা-ধরা মাপকাঠি আছে তরুণী তার খবর রাখে না বটে, কিন্তু স্বামীকে সে ভালোবাসে। তাদেরই এক প্রতিবেশী—ধনিক ও রূপরসিক—তাদের বাড়ীতে সে আনাগোনা করে। তরুণীকে টাকার লোভ দেখায়, অর্থসাহায্য করতে রাজি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে করে কুপ্রস্তাবও। অর্থাভাবে স্বামীর চিকিৎসা হচ্ছে না ব'লে তরুণী ধনী প্রতিবেশীর প্রেম-নিবেদন সহ্য করে এবং লীলাময়ীর মত তার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতেও ছাড়ে না। তারপর প্রেমাকাঙ্ক্ষী প্রতিবেশীর টাকায় সুচিকিৎসার পর স্বামীর আরোগ্য লাভ। প্রতিবেশী তখন তরুণীর দেহলাভ করতে চাইলে। তরুণী গ্রাম্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে তাকে বিতাড়িত করলে।

গল্পটি শুনে দীনেশ বললেন, "গল্পটি বেশ ভালোই হয়েছে। কিন্তু এ গল্প তো আমার কাগজে চলবে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন?"

দীনেশ সাফ জবাব দিলেন, "তুমি নারীর সতীত্ব দেখাবার চেষ্টা করেছ।"

দীনেশের এমনি সব বেয়াড়া "ফ্যাড" বা খেয়াল ছিল। হয়তো এইদিকে লক্ষ্য রেখেই "কল্লোলে"র তরুণ লেখকগণকে গল্প রচনা করতে হ'ত। কিন্তু আমার আদর্শ অন্যরকম। তাই পরে অনুরুদ্ধ হয়েও আমি দীনেশের জন্যে আর কোন নতুন গল্পে হাত দিই নি। এই রকম সব খেয়ালের ভিতরে নেই চিন্তাশীলতা, আছে দুর্বলতা। এই দুর্বলতারই সুযোগ গ্রহণ করত "শনিবারের চিঠি"।

কিন্তু তখনকার "কল্লোলে"র সেই নবীন লেখকরা আজ হয়েছেন প্রবীণ। হয়তো আগে তাঁদের কারুর কারুর রচনার ভিতরে অন্বেষণ ক'রে পাওয়া যেত অল্পবিস্তর ময়লামাটি। কিন্তু তাঁদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ময়লামাটি ক্রমে ক্রমে থিতিয়ে পড়েছে নীচের দিকে এবং তাঁদের রচনাও ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠেছে স্বচ্ছ ও নির্মল।

"কল্লোলে"র লেখকদের মধ্যে ছিলেন শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবুদ্ধদেব বসু, শ্রীঅজিত দত্ত, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীমণীশ ঘটক (যুবনাশ্ব) ও শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী এবং

আরো কেউ কেউ। ওঁদের মধ্যে প্রথমে চারিজনের সাহিত্যসাধনা আজও আছে অব্যাহত। কিন্তু বাংলা দেশের দুর্গত সিনেমার নেশায় মেতে প্রেমেন্দ্র এখন সাহিত্য-জগতে মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মারেন মাত্র। মণীশের মধ্যে ছিল প্রভূত সম্ভাবনা, কিন্তু তিনি এখন লেখনী ত্যাগ ক'রে ব'সে আছেন। হেমচন্দ্র বাগচী বেশ কবিতা লিখতেন, কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তির বিধানে তিনি হন উন্মাদগ্রস্ত।

এই প্রসঙ্গে আর এক ভাগ্যবান কবির কথা মনে হচ্ছে। নজরুল ইসলাম। আমার মত তিনিও ঠিক "কল্লোল" গোষ্ঠীভুক্ত সাহিত্যিক ছিলেন না, তবে তার সম্পর্কে এসেছেন বটে। দেশবন্ধুর তিরোধান উপলক্ষ্যে আমার সঙ্গে তাঁরও কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল "কল্লোলে"র পৃষ্ঠায়। তার কিছুকাল পরে স্বর্গীয় কবিবর যতীন্দ্রমোহন বাগচীর আরপুলি লেনের ভবনে এক সন্ধ্যায় আহূত হয়ে গিয়ে দেখি, সেখানে উপস্থিত আছেন নজরুল ইসলাম ও "কল্লোলে"র কোন কোন সাহিত্যিক। নজরুল হার্মোনিয়ম নিয়ে গান গাইতে সুরু করলেন।

তার আগেই আমাদের নিজস্ব আসরে নজরুলের কণ্ঠে শুনেছি অসংখ্য গান। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল না বটে শিক্ষিত ওস্তাদের মত, কিন্তু তাঁর আন্তরিকতার গুণে প্রত্যেক শ্রোতাই হতেন বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট। আগে তিনি গাইতেন রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদ সেন প্রভৃতির গান কিন্তু সেদিনকার আসরে গীতিকার ও সুরকার রূপে নজরুলের পরিচয় পেলুম সর্বপ্রথমে। তাঁর মুখে শুনলুম গজল গানের পর গজল গান। বাংলা দেশে গজল গান আগেও ছিল। আমাদের ছেলে-বেলায় লোকের মুখে মুখে এই গজলটি শুনতুম—"কুঞ্জবনে যমুনারি তীরে, রাধা রাধা বলে কে বাঁশী বাজায়।" কিন্তু সেদিন নজরুলের রচিত যে গজলগুলি শুনলুম, তাদের গড়নও সম্পূর্ণ নতুন এবং কবিত্বেও তারা সর্বপ্রকারে সমৃদ্ধ।

তারপর "কল্লোলে" আত্মপ্রকাশ করল নজরুলের সেই প্রখ্যাত গজলটি—"বসিয়া বিজনে কেন একা মনে, পানিয়া ভরণে চললো গোরী!" তাঁর আরো কয়েকটি গজল "কল্লোলে" প্রকাশিত হয়েছিল এবং অনতিবিলম্বেই সেগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ছাড়িয়ে পড়ল

ঘরে-বাইরে যেখানে-সেখানে। বাংলা দেশে কিছুকাল ধ'রে চলল গজল গানের রেওয়াজ।

নজরুলের কথা অন্যত্র বিস্তৃতভাবেই বলেছি, সুতরাং আর তা নতুন ক'রে বলবার দরকার নেই। এর পর আমি "কল্লোলে"র অন্যান্য কয়েকজনের কথা নিয়ে আলোচনা করব।

কল্লোল-গোষ্ঠীর দুইজন

এখনকার অধিকাংশ মাসিক পত্রিকার কার্যালয়ে গেলে শোনা যায় খালি কাজের কথা। সাহিত্যিকরা সেখানে আসেন, বসেন, দুটো-চারটে কথা বলেন,—কিন্তু সবই প্রয়োজনের তাগিদে। ভালো ক'রে আসর জমিয়ে নিয়মিত ভাবে বৈঠকী আলোচনা সেখানে আর হয় না।

আগেকার মাসিক পত্রিকার কার্যালয়েও যে কাজের ভিড় থাকত না, এমন কথা বলি না। কিন্তু কাজ-কর্ম চুকে যাবার পর প্রতিদিনই বৈকালের দিকে সেখানে বসত বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত লেখকদের বৈঠক। হ'ত সাহিত্য ও ললিতকলা নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান। হ'ত গল্পগুজব, হাসিমস্করা এবং কোথাও কোথাও শোনা যেত সঙ্গীতের কলরবও। এরই মধ্য দিয়ে নিবিড় হয়ে উঠত পরস্পরের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক। "জাহ্নবী", "অর্চনা", "মানসী", "যমুনা", "সঙ্কল্প", "মর্মবাণী", "ভারতী", "কল্লোল" ও "শনিবারের চিঠি" প্রভৃতি পত্রিকা ছিল এমনি সব আলাপ-আলোচনার কেন্দ্র।

কিন্তু কেবল পত্রিকার কার্যালয়ে নয়, তখন কোন কোন সাহিত্য-রসিক গৃহস্থের বাড়ীতেও নানা শ্রেণীর গুণীদের জন্যে বিছানো হ'ত রীতিমত ঢালা আসর। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে অক্সফোর্ড মিসনের পার্শ্ববর্তী বাড়ীর কর্তা ছিলেন স্বর্গীয় গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। দুই যুগ আগেও তাঁর বৈঠকখানায় প্রত্যহ গদীয়ান হয়ে বিরাজ করতেন উচ্চ-শ্রেণীর বহু সাহিত্যিক ও শিল্পী। কারুর হাতে সিগারেট, কারুর হাতে চুরোট ও কারুর হাতে গড়গড়ার নল এবং ঘন ঘন আসছে আর যাচ্ছে চায়ের পেয়ালা ও তাম্বুলের থালা। জুতো-শেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত কোন কথাই সেখানে অনালোচনীয় ছিল না। তর্ক-বিতর্ক হ'তে হ'তে মাঝে মাঝে উঠত চায়ের পেয়ালায় তুমুল তরঙ্গ।

সেই আসরেই স্বর্গীয় কৌতুকাভিনেতা চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, নাট্যাচার্য শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী, স্বর্গীয় ওস্তাদ করমতুল্লা খাঁ, রাজনৈতিক শ্রীনির্মলচন্দ্র, অভিনেতা শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র, কবি নজরুল

ইসলাম, সুলেখক শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও হাস্যরসিক দাদাঠাকুর শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত প্রভৃতির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়।

নজরুল হৈ হৈ ক'রে এসেই বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করতেন টেবিল-হার্মোনিয়ামটাকে এবং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের যানবাহন ও মুক্ত-জনতার বিষম গোলমাল গ্রাহ্যের মধ্যেও না এনে গেয়ে যেতেন গানের পর গান এবং গাইতে গাইতে থালা থেকে তুলে নিতেন পানের পর পান। ।কেবল কাঁড়ি কাঁড়ি পান নয়, আঠারো-বিশ পেয়ালা চা না পেলেও সিক্ত হ'ত না তাঁর কণ্ঠদেশ।

নজরুলের সঙ্গে প্রায়ই আসতেন একটি স্বল্পবাক তরুণ। তাঁর মাথায় লম্বা চুল, দেহ একহারা, বর্ণ শ্যাম, সাজগোজ সাদাসিধা, মুখে শালীন ভাব। নাম শুনলুম শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে আমরা নজরুলের বন্ধু ব'লেই গ্রহণ করলুম। তাঁর অন্য কোন পরিচয় জানতুম না এবং আসরের বিখ্যাত সব গুণী জ্ঞানীর মাঝখানে তাঁর দিকে ভালো ক'রে মনোযোগ দিতেও পারি নি।

নৃপেন্দ্র ছিলেন বর্ণচোরা আমের মত। নানা আসরে এমন অনেক লোককে দেখেছি, যাঁরা উল্লেখযোগ্য গুণের অধিকারী না হয়েও বিখ্যাত ব্যক্তিদের মাঝখানে ব'সে সবজান্তার মতন এমন অনর্গল কথার খই ফোটাতে পারেন যে, সহজেই তাঁদের দিকে আকৃষ্ট হয় আর সকলের দৃষ্টি। এই মুখর মানুষগুলি যে সুচতুর, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। নিজেদের ঢনঢনে মস্তিষ্ক সম্বন্ধে জ্ঞান তাঁদের অত্যন্ত টনটনে। তাই বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে ওঠা-বসা ক'রে তাঁদের খ্যাতির খানিকটা তাঁরা প্রতিফলিত করতে চান নিজেদের মধ্যে। বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখেছি এমনি সব হসন্ত-মার্কা জীবকে।

নৃপেন্দ্র অন্য ধরণের মানুষ। মুখের কথায় বা হাত-ভাব-ব্যবহারে কোনদিনই নিজেকে তিনি বিজ্ঞাপিত করতে কিম্বা স্বয়ং প্রধান হয়ে উঠতে চান নি। তাই কিছুদিনের আলাপের পরেও আমি পাইনি তাঁর প্রকৃত পরিচয়।

তারপর "কল্লোল" পত্রিকা প্রকাশিত হ'ল এবং "কল্লোলে"র পৃষ্ঠার মধ্যেই আবিষ্কার করলুম যথার্থ নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে। তাঁর চেষ্টাবর্জিত,

প্রসাদগুণবিশিষ্ট ও তৃপ্তিদায়ক মিষ্ট ভাষা এবং প্রবন্ধরচনায় সুদক্ষ হাত দেখে সত্য সত্যই আমি বিস্মিত না হয়ে পারি নি। এমন একজন শিল্পী আমাদের সঙ্গে এসে মেলামেশা করেছেন, অথচ আমরা তাঁকে কেবল নজরুলের পার্শ্বচর এক সাধারণ ভক্ত ছাড়া আর কিছু ব'লেই ভাবতে পারি নি!

তারপর নৃপেন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গে সুদৃঢ় বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। বহু সাহিত্য-বৈঠকে, "নাট্যমন্দির" ও "নাট্য-নিকেতনে"র অন্দরের আসরে এবং আমার নিজের বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় কাটিয়ে দিয়েছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কোন অসতর্ক মুহূর্তেও তাঁর মুখে শুনিনি কোন অশোভন উক্তি এবং আত্মগৌরব কথনেও কখনো দেখিনি তাঁর এতটুকু আগ্রহ। বরং বারংবার এই কথাই আমার মনে হয়েছে যে, সর্বদাই তিনি যেন আপনাকে সরিয়ে রাখতে চান সকলের পিছনে এবং তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী, নৃপেন্দ্রচন্দ্র নিজেই যেন সে সম্বন্ধে সচেতন নন! তাঁর আর একটি মস্ত গুণ, কখনো তিনি অন্য সাহিত্যিকের বিরুদ্ধে গ্লানি প্রচার করেন না। ব্যক্তিগত হিংসা-দ্বেষ তাঁর মনে ঠাঁই পায় না।

কিন্তু তিনি হচ্ছেন বাংলাদেশের সাহিত্যিক। এখানে সাহিত্যের সঙ্গে সৌভাগ্যের সম্পর্ক যদি কিছু থাকে, তবে তা এত দূরসম্পর্ক যে, কদাচ হ'তে পারে তারা পরস্পরের নিকটস্থ। ঠিক সেইজন্যে কি না জানি না, অধিকাংশ সময়েই নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের মুখের উপরে দেখেছি উদাস-উদাস ভাব। গল্পগুজব ও হাস্যকৌতুকের মাঝখানেও কেমন যেন অনাসক্ত হয়ে থাকেন। কি যেন খুঁজছেন, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছেন না।

মাঝে মাঝে হয়ত অর্থাভাবেই তিনি স্বক্ষেত্র ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চান। উপন্যাস রচনা করেন, কিন্তু সফল হন না। চলচ্চিত্রে নায়কের ভূমিকায় দেখা দেন, কিন্তু বিফল হন। উপন্যাসে ও প্রবন্ধ রচনায় মধ্যে পার্থক্য আছে যথেষ্ট। মেকলে ও কার্লাইলের রীতি এক রকম, স্কট ও ডিকেন্সের রীতি আর এক রকম। এটুকু ভুললে শক্তিশালী লেখকরাও নিজেদের সুনাম রক্ষা করতে পারবেন না। আবার লেখক ও অভিনেতা দুজনেই শিল্পী বটে, কিন্তু তাঁরা বিচরণ করেন সম্পূর্ণ

ভিন্ন মার্গে। অভিনয়ে অনেকের অশিক্ষিতপটুত্ব থাকতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত গুরুর অধীনে দীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষাগ্রহণ না করলে কেহই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হয় না। তেমনি যারা অভিনয়ে অভ্যস্ত, সাহিত্য-সাধনা না ক'রে হঠাৎ কলম ধ'রে সেও রাতারাতি লেখক হয়ে উঠতে পারে না। এইজন্যেই প্রবাদে বলে—'যার কাজ তারে সাজে, অন্যের পিঠে লাঠি বাজে।' কুস্তির মহামল্লও যুযুৎসুর মল্লের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজি হয় না—অথচ দুজনেরই কর্তব্য হচ্ছে মল্লযুদ্ধ করা। আমি স্বচক্ষে একজন ক্ষুদ্রাকায় জাপানী যুযুৎসু-বিশেষজ্ঞকে বিশ্ব-বিজয়ী বিপুলবপু গামাকে সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান করতে দেখেছি, কিন্তু গামা বুদ্ধিমানের মত তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কারণ যুযুৎসুর আর কুস্তির পদ্ধতি এক নয়।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের অতুলনীয় গুণপণা দেখা যায় সন্দর্ভ রচনায় এবং জীবনচিত্রাঙ্কনে। শেষোক্ত বিভাগে তিনি কলমের রেখায় যে সব জীবনচিত্র এঁকেছেন, সেগুলি হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য ও অভিনব ঐশ্বর্য। এ শ্রেণীর আরও অনেক ছবি বাংলা দেশেই পাওয়া যাবে, কিন্তু আর কোন ছবিকারই নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের নিকটস্থ হ'তে পারবেন না। সেগুলি কেবল সুলেখকের রচনা নয়, সেগুলি হচ্ছে উচ্চশ্রেণীর শিল্পীর রচনা। যাঁদের ভিতর ও বাহির ফুটোতে চান, সম্যকরূপে ও জীবন্ত ভাবে তিনি তা ফুটিয়ে তুলেছেন, অথচ যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন রেখে নিজের আর্টকে এবং বিশেষজ্ঞমাত্রই জানেন, যে আর্ট নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারে, তাইই হচ্ছে বড় আর্ট। যাঁদের কলমের ছবি তিনি এঁকেছেন, আবার তাঁদেরই দেখাবার চেষ্টা করেছেন এমন আরও লেখকের অভাব নেই। কিন্তু চার পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনার পর তাঁরা যতটুকু দেখিয়েছেন, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ মাত্র চারটি লাইনে তার চেয়ে ঢের বেশী দেখাতে পেরেছেন। তাঁর এই নিরতিশয় ভাবগর্ভ লিপিকুশলতা বোঝাতে কি শব্দালঙ্কার ব্যবহার করব? বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর উপামাটা বড়ই পুরাতন হয়ে গিয়েছে। তিনি হচ্ছেন একজন অনন্যসাধারণ রেখাচিত্রকার।

প্রায় সেই সময়েই আর একজন উদীয়মান লেখকের সঙ্গে পরিচয় হয়. এখন তিনি সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি হচ্ছেন

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী। যদিও তিনি সাহিত্যসাধনা সুরু করেছিলেন স্বতন্ত্র ভাবেই, তবু তাঁকে "কল্লোল" গোষ্ঠীভুক্ত সাহিত্যিকদেরই মধ্যে গণ্য করতে পারি। সেই সঙ্গে এটাও মনে হয়, তিনি তাঁদের সঙ্গে উঠতেন, বসতেন. আলাপ ও বিচরণ করতেন বটে, তবে অদ্যাবধি নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন—অর্থাৎ সব দলের সঙ্গেই মেলামেশা করেন, কিন্তু কোন বিশেষ দলের খাতায় নিজের নাম লিখতে রাজি হন না।

তখন আমাদের "ভারতী" উঠে গিয়েছে, কিন্তু "ভারতী" কার্যালয়ের বাড়ী থেকেই মুদ্রিত হয় "নাচঘর", যার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলুম আমি ও নলিনীমোহন রায়চৌধুরী। আমরা ত্রিতলে বসে কাজ করতুম, একতলায় ছিল স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের "কান্তিক প্রেস"। সেই ছাপাখানায় মুদ্রিত হ'ত শিবরামের স্বারা সম্পাদিত একখানি সাময়িক পত্রিকা, তার নাম আমার সঠিক স্মরণ হচ্ছে না—হয়তো "যুগান্তর"। শিবরামের তখন প্রথম যৌবন। কিন্তু সেই বয়সেই তিনি কেবল সম্পাদক নন, গ্রন্থকার রূপেও আত্মপ্রকাশ ক'রেছেন। তবে সেদিনকার লেখক শিবরাম এবং এখনকার হাসির গল্প-লিখিয়ে ও শব্দশ্লেষের রাজা শিবরামের মধ্যে পার্থক্য আছে অনেকখানি। আগেকার শিবরাম ঘুরে বেড়াতেন সাহিত্য-জগতের নানা পথে কখনো সাংবাদিক, কখনো ঔপন্যাসিক, কখনো নাট্যকার, কখনো প্রবন্ধকার এবং কখনো বা কবি রূপ ধারণ ক'রে। কিন্তু এখনকার মানুষ শিবরাম আজও দুপুর রোদে গোটা কলকাতার পথে-বিপথে, অপথে-কুপথে হাঘরের মত, চর্কীর মত টো টো ক'রে ঘুরে বেড়ান বটে, তবে লেখক শিবরাম আশ্রয় নিয়েছেন সাহিত্য-জগতের বিশেষ এক প্রান্তে। বড়দের জন্যে মাঝে মাঝে এখনো দুই-একটা লেখায় হাত দেন, কিন্তু ছোটদের জন্যেই তাঁর বেশী মাথাব্যাথা।

শিবরাম কবি। দিব্য কবিতা লিখতেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতেও ছিল প্রভূত নূতনত্ব। তাঁর কবিতার কেতাবও বাজারে বেরিয়েছে. কিন্তু আজ তা ক্রেতাদের পুস্তকাগারে সুরক্ষিত আছে, কিম্বা তথা-কথিত "শ্বেত পিপীলিকা"দের কবলগত হয়েছে সে খবর দিতে পারব না। যে কারণেই হোক, কাব্যলক্ষ্মীর সঙ্গে এখন তাঁর আর বড়-একটা

বনিবনাও নেই, অথচ তাঁর কবিত্বের ক্ষেত্তে যে অজন্মার যুগ আসে নি, সে প্রমাণও পাই মাঝে মাঝে।

শিবরাম নাট্যকার এবং কাঁচা বয়স থেকেই পাকা নাট্যবোদ্ধা। যখন তিনি উদীয়মান, সেই সময়েই শরৎচন্দ্রের "দেনা-পাওনা"কে নাট্যকারে পরিবর্তিত ক'রে তার নাম রাখেন "যোড়শী"। যদিও তা "ভারতী"তে প্রকাশিত এবং রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছিল শরৎচন্দ্রেরই নামে, কিন্তু নাট্যরূপের সফলতার জন্যে অনেকখানি প্রশংসার উপরে দাবি করতে পারেন শিবরামই। তারপরেও তিনি "নাট্যনিকেতনে"র কর্তৃপক্ষের অনুরোধে নিরুপমা দেবীর "দিদি" উপন্যাসকেও নাট্যাকারে পরিবর্তিত করেছিলেন বটে, কিন্তু শিশিরকুমারের প্রতিভা ও শরৎচন্দ্রের নামের মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়ে "দিদি" লোকপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি।

মৌলিক নাটক রচনাতেও তিনি হচ্ছেন রীতিমত করিতকর্মা। বহুকাল আগে রচনা করেছিলেন "চাকার নিচে" নামে এক নাটক এবং আমার "নাচঘরে" তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করবার সময়ে গৌর-চন্দ্রিকায় আমি লিখেছিলুমঃ "শিবরামবাবু এই নাটকখানি রচনা করেছেন অতি-আধুনিক প্রথায়। এবং একটিমাত্র অঙ্কে, একটিমাত্র ঘরের ভিতরে মোট তিন-চার ঘণ্টা সময়ের মধ্যে তিনি আধুনিক জীবনের যে বিচিত্ররসবহুল, অপূর্ব ও জীবন্ত চিত্র অঙ্কন করেছেন, আমরা আগে থাকতে তার আভাস দিয়ে রসভঙ্গ করব না। পাঠকরা ধীরে ধীরে তার পরিচয় পাবেন এবং পরিণামে যে মুগ্ধ ও তৃপ্ত হবেন, সে বিষয়েও কিছুমাত্র সন্দেহ নেই" প্রভৃতি।

কিন্তু তিনি নাট্যকার হয়েও হলেন না—"ছেড়ে দিলেন পথটা, বদলে গেল মতটা।" বিপুল উৎসাহে ঢুকে পড়লেন ছোটদের খেলাঘরে, তাঁর অশ্রান্ত লেখনী হুড় হুড় ক'রে রচনা করতে লাগল রাশি রাশি হাসির গল্প, ভূরি পরিমাণে শব্দশ্লেষ (pun) ও অনুপ্রাস ছড়াতে ছড়াতে পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে। আজকের বাংলা সাহিত্যে তাঁর মতন এত বেশী হাসির গল্প রচনা করেন নি আর কোন লেখকই।

"পান্"এর দিকে ঝোঁক তাঁর অতিমাত্রায়। তার লোভে তিনি গল্পের বাঁধুনিও শ্লথ ক'রে ফেলবার জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত। প্রাণপণে

"পান"-এর পরে "পান্" চালিয়ে তিনি পান আনন্দ এবং এদিকে তাঁর বিস্ময়কর কৃতিত্ব জাহির হ'লেও গল্পের আর্ট ও ক্ষুণ্ন হয় অল্পাবিস্তর। কেবল লেখবার সময় নয়, বন্ধুসভায় আসীন হয়ে গল্প করবার সময়েও তাঁর সংলাপ হয়ে ওঠে শব্দশ্লেষের জন্যে কৌতুককর।

বেশ আলাভোলা, মিষ্ট মানুষ এই শিবরাম। গতি তাঁর সর্বত্রই, কিন্তু কোথাও বেশীক্ষণ থাকবার পাত্র নন, এক আড্ডা ছেড়ে ছোটেন আর এক আড্ডার দিকে, তারপর আর এক আড্ডায়। চিরকুমার, নেই কোন সংসারজ্বালা এবং সেই কারণেই হয়তো যখন-তখন নির্মল কলহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারেন। বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু তরল-মতি বালকের মত হাবভাব। বুড়োর চেয়ে আকৃষ্ট হন বালকদের দিকেই। যখন কারুর বিরুদ্ধে কোন মজার গল্প বলেন, তখনও তাঁর ভিতরে থাকে না তিলমাত্র রাগের ভাব। তাঁর সঙ্গসুখ উপভোগ করবার জন্যে কখনো কখনো তাঁকে জোর ক'রে ধ'রে এনেছি। এবং অনুভব করেছি খানিকটা মুক্ত বাতাসের মিষ্ট স্পর্শ।

কল্লোল-গোষ্ঠীর ত্রয়ী

কল্লোল-গোষ্ঠীর ত্রয়ী বলতে বোঝায় এই তিনজনের নাম—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীবুদ্ধদেব বসু ও শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। এঁরা তিনজনেই কবি, ঔপন্যাসিক ও গল্প-লেখক। তিনজনেই কিছু কিছু অন্যান্য শ্রেণীর রচনাতেও হাত দিয়েছেন।

এঁরা তিনজন এবং কল্লোল-গোষ্ঠীভুক্ত আরো কয়েকজন শক্তিশালী লেখক আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তথাকথিত অশ্লীলতার অপরাধে নিষ্ঠুরভাবে আক্রান্ত ও ধিক্কৃত হন। সেই সময়ে—অর্থাৎ প্রায় দুই যুগ আগে—আমি এঁদের পক্ষসমর্থন ক'রে লিখেছিলুম: "তবে কি এই অশ্লীলতাই স্বাভাবিক? আমাদের তো বিশ্বাস তাই। এ বিশ্বাস ভুল হ'তেও পারে। এবং অশ্লীলতার যে একটা সীমারেখা আছে, তাও আমরা না মেনে পারব না। কিন্তু একেবারে একেলে সাহিত্য সেই সীমারেখাকে অতিক্রম করেছে কি না, এখন সেইটেই হচ্ছে বিবেচ্য। * * * "What is Art" লেখবার পরেও টলস্টয়ের মতন লোক যে-দুর্বলতা পরিহার করতে পারেন নি, তার কবল থেকে আত্মরক্ষা করা যে সহজ নয়, সে কথা বলা বাহুল্য। এ দুর্বলতা আছে এবং থাকবেও। স্বাভাবিকতার উচ্ছেদ অসম্ভব। কেবল এই চেষ্টাই করা ভালো, যেন সে কুৎসিত না হয়, যেন সে শিষ্টতার সীমানা না ছাড়ায়, যেন সে রূপের সেবা না ভুলে যায়। রূপকে আমরা ব্যাপক অর্থে ধরছি। * * * আমরা অস্কার ওয়াইল্ডের এই বিখ্যাত উক্তি উড়িয়ে দিতে পারি না—লেখার দোষে শ্লীলও অশ্লীল হয়ে দাঁড়ায় এবং লেখার গুণে তার উল্টোটাকেই প্রকাশ করে। যে কোন কুৎসিত বিষয় সুন্দর ও রুচিকর ক'রে দেখানো যেতে পারে" প্রভৃতি।

একটা বড় মজার ব্যাপার এই যে, যুগে যুগে অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ লেখকেরই বিরুদ্ধে আনা হয়েছে অশ্লীলতার অপরাধ। অনেক সময়ে আবার দেখা গিয়েছে, অভিযোক্তাকেই হ'তে হয়েছে একই

অপরাধে অভিযুক্ত। রবীন্দ্রনাথের রচনাকে অশ্লীল ব'লে প্রতিপন্ন করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। তারপর রবীন্দ্র-ভক্তরা দেখিয়ে দিলেন অশ্লীলতায় তিনিও বড় কম যান না। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর অনেক পরে শিশিরকুমার যখন তাঁর "পাষাণী" নাটক মঞ্চস্থ করেন, তখন রুচিবাগীশরা এত জোরে চ্যাঁচাতে সুরু ক'রে দেন যে, রীতিমত সুঅভিনীত হয়েও পালাটি ভালো ক'রে জমতে পারে নি।

স্বর্গীয় ঔপন্যাসিক যতীন্দ্রমোহন সিংহ অশ্লীলতার উপরে হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন। অশ্লীল লেখা দেখলেই কলম উঁচিয়ে তেড়ে আসতেন। অবশেষে বুড়ো বয়সে নিজেই ফেঁদে বসলেন এমন এক অশ্লীল গল্প যে, চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল ধিক্কারধ্বনিতে।

কল্লোল-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোক্তা ছিলেন "শনিবারের চিঠি"র দল। অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব ও জীবনানন্দ দাশ প্রভৃতির অশ্লীলতার প্রমাণ "শনিবারের চিঠি"তে বিতরিত হ'ত ভূরি পরিমাণে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও অতিশয় স্পষ্টভাবেই দেখা যেতে লাগল, "শনিবারের চিঠি"তে প্রকাশিত গল্পে ও কবিতাতেও অশ্লীলতার কিছুমাত্র অপ্রতুলতা নেই। সুতরাং সবাই যখন ভূত, মিছামিছি রামনাম নিয়ে টানাটানি কেন?

কি শ্লীল, কি অশ্লীল, কে বলতে পারে? এর আগে আমার একটি গল্পের দুর্দশার কথা বলেছি। "কল্লোল" সম্পাদক সেটিকে শ্লীল ব'লে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর গল্পটিকে চালান করা হয় "ভারতবর্ষ" কার্যালয়ে। সেখান থেকে সেটি ফেরত আসে অশ্লীলতার অভিযোগ বহন ক'রে। ধাঁধায় পড়লুম, নিজেই বুঝতে পারলুম না আমি কি শ্লীল কি অশ্লীল? কাশীধাম থেকে এল "উত্তরা"র জন্যে লেখার তাগিদ। গল্পটিকে প্রেরণ করলুম সেই-খানেই। সে শ্লীল কি অশ্লীল তা নিয়ে "উত্তরা" মাথা ঘামালে না, তাকে ছাপিয়ে দিলে বিনাবাক্যব্যয়ে। "উত্তরা"য় প্রকাশিত আমার একটি কবিতার দুটি লাইনের জন্যে গালিগালাজে বাজার সরগরম হয়ে উঠেছিল—ঐ অশ্লীলতার অপরাধেই। কিন্তু আমার সেই

একাধারে শ্লীল ও অশ্লীল (!) গল্পের জন্যে কোন চায়ের পেয়ালাতেই ওঠেনি উত্তাল তরঙ্গ।

একই গল্প যখন হ'তে পারে কারুর মতে শ্লীল এবং কারুর মতে অশ্লীল, তখন বিচারের মানদণ্ড কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে, এ ক্ষেত্রে বাচনিক বিচারে সুরাহা হওয়া অসম্ভব। যে রচনা সুরচিত এবং যা মনকে নোংরা করে না, নিন্দা ক'রেও তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। মুক্ত চক্ষু ধুলোর মধ্যে কুড়িয়ে পায় রোদের সোনা। অন্ধ ধুলো হাতড়ালে ছুঁয়ে ফেলে সারমেয়-বিষ্ঠা। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অশ্লীল মনই আবিষ্কার করে অশ্লীলতাকে। পরমহংসদেবের একটি বাণীর মর্মার্থ হচ্ছে শকুনি পক্ষবিস্তার ক'রে উড়ে বেড়ায় নির্মলনীল আকাশে, কিন্তু তার নজর প'ড়ে থাকে নীচে ভাগাড়ের দিকেই।

রসিক হন মরালের মত। জলভাগ ত্যাগ করতে পারেন অনায়াসেই।

অশ্লীলতাকে অন্বেষণ করবার জন্যে কোনদিনই আমি অচিন্ত্য-কুমার, প্রেমেন্দ্র ও বুদ্ধদেবের রচনাবলী নিয়ে নাড়াচাড়া করি নি, বঞ্চিত হই নি তাই উপভোগের আনন্দ থেকে। তাঁদের উপন্যাস পড়েছি, ছোটগল্প পড়েছি, কবিতা পড়েছি। মুগ্ধ করেছে আমাকে অনেক রচনাই। আবার কোন কোন রচনার বিষয়বস্তু হয়তো আমার মনের মত হয় নি। কিন্তু এই ভালো লাগা আর না লাগার মধ্যে একটা যে সত্য সর্বদাই উপরে ছাপিয়ে উঠেছে তা হচ্ছে এইঃ তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে উচ্চশ্রেণীর লিপি-কুশলতা। তাঁদের ভাষা ও শব্দবিন্যাস হচ্ছে বিষয়বস্তু-নিরপেক্ষ। তাঁদের কোন গল্পের আখ্যানবস্তু বা কোন কবিতা ভালো না লাগলেও তাঁদের ভাষা ও রচনাভঙ্গির দিকে পাঠকরা বিশেষভাবে আকৃষ্ট না হয়ে পারবেন না।

"ভারতী", "কল্লোল" ও "শনিবারের চিঠি" প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এক এক দল শক্তিধর সাহিত্যিক পরিপুষ্ট হয়ে উঠে-ছিলেন। "ভারতী" গোষ্ঠীর ভিতর থেকে আমরা পেয়েছি সত্যেন্দ্র-নাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্র-

নারায়ণ বাগচী; মোহিতলাল মজুমদার ও হেমেন্দ্রলাল রায়—যাঁরা আজ স্বর্গে। এবং সেই সঙ্গে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি জীবিত লেখকদের। শরৎচন্দ্রেরও প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল "ভারতী"তেই। তারপরে "ভারতী"তে তাঁর একাধিক রচনা প্রকাশিত হ'লেও তিনি নিয়মিত লেখক-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না বটে, কিন্তু ঐখানেই ছিল তাঁর নিজস্ব আসর। হামেসাই উঠতেন বসতেন, আলাপ-আলোচনা করতেন আমাদের সঙ্গে। তিনি ছিলেন একান্তভাবেই আমাদের ঘরের লোক।

"কল্লোল" গোষ্ঠীর ভিতর থেকে দেখা দিয়েছেন দীনেশরঞ্জন দাশ, গোকুলচন্দ্র নাগ,—এ'রা এখন স্বর্গীয়। তারপর আছেন হেমচন্দ্র বাগচী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, মণীশ ঘটক (যুবনাশ্ব), অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, অজিতকুমার দত্ত, ভূপতি চৌধুরী ও জসীমউদ্দীন প্রভৃতি।

একটি বিশেষ আদর্শ সামনে রেখে, একই ভাবের অনুপ্রেরণায় এমনি দলবদ্ধ হয়ে সাহিত্য-সাধনার মধ্যে কেবল যে একটা সমষ্টিগত শক্তির উপলব্ধি থাকে তা নয়; উপরন্তু সেই সঙ্গে পাওয়া যায় পরম আনন্দ ও বিপুল উৎসাহ। ভিন্ন ভিন্ন পথ, লক্ষ্য কিন্তু এক।

কিন্তু আজকের দিনের তরুণ লেখকরা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে সাহিত্য-সাধনা করতে চান না বা করতে পারেন না। "কল্লোল" লুপ্ত হবার পর কয়েকজন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ করেছেন, কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে দেখি ভ্রাতৃভাবের পরিবর্তে ছাড়া ছাড়া ভাব। বোঝা যায় না তাঁদের লক্ষ্য ও আদর্শ। সাহিত্যক্ষেত্রে গোষ্ঠীই সৃষ্টি করতে পারে নব নব পদ্ধতি বা "স্কুল"। ফরাসী সাহিত্যে এটা বার বার দেখা গিয়েছে, এবং বাংলা দেশেও "বঙ্গদর্শন", "সবুজপত্র", "ভারতী" ও "কল্লোল" প্রভৃতি পত্রিকা বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীবদ্ধ সাহিত্যিকদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল ব'লেই যুগে যুগে বাংলা সাহিত্যে এসেছে নূতন নূতন ধারা ও ভঙ্গি।

অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল ঠিক কোন্‌খানে, আমার মনে পড়ছে না। তবে হয় "কল্লোল", নয় "মৌচাক"

কার্যালয়ে। স্মরণ হচ্ছে, "কল্লোল" প্রকাশিত হবার আগেই "ভারতী"র পৃষ্ঠায় যেন তাঁর একটি রচনা পাঠ করেছি।

তারপর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে নানা জায়গায়। এবং আমি তাঁকে অন্যতম অন্তরঙ্গ ব'লেই গ্রহণ করেছি। একহারা দেহ, রংটি কালো হ'লেও মুখে-চোখে আছে বুদ্ধির প্রাখর্য। শান্ত স্বভাব, সংলাপ শিষ্ট ও মিষ্ট। কথার ঝড় বহিয়ে দেন না, বাক্যব্যয় করেন বেশ সংযত ভাবেই।

"কল্লোল যুগ" পাঠ করলে বোঝা যায়, "শনিবারের চিঠি"র ধারাবাহিক আক্রমণ তাঁর মনকে তিক্ত ক'রে তুলেছিল। সেই সময়ে "কল্লোল"এর দলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছি ব'লেই হোক বা অন্য যে কোন কারণে আমিও "শনিবারের চিঠি"র দ্বারা বার বার আক্রান্ত হ'তে লাগলুম। কিন্তু আমি মার খেয়ে মার স'য়ে থাকবার মানুষ নই। একই খেলা দুই পক্ষই খেলতে পারে, এটা দেখিয়ে দেবার জন্যে "নাচঘরে" খুললুম একটি বিশেষ বিভাগ। তারপর কিছুকাল ধ'রে চলতে লাগল দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল বাক্যযুদ্ধ—গদ্যে এবং পদ্যে। আমার লেখা কোন কোন ব্যঙ্গ-কবিতা নজরুল ইসলাম এবং আরো কেউ কেউ মুখস্থ ক'রে ফেলেছিলেন। অচিন্ত্যকুমারও উৎসাহিত হয়ে একদিন "নাচঘর" কার্যালয়ে এসে ছদ্মনামে লেখা একটি ব্যঙ্গ-কবিতা দিয়ে গেলেন আমার হাতে। এই বিভাগে তিনি এবং অন্য কোন কোন লেখক করেছিলেন আরো কিছু কিছু সাহায্য। ফাঁপরে পড়তে হ'ল "শনিবারের চিঠি"কে। সে হচ্ছে মাসিক, আর "নাচঘর" ছিল সাপ্তাহিক, কাজেই মাসে একবার আক্রান্ত হ'লে প্রতি-আক্রমণ করবার সুযোগ পায় মাসে চারবার। "শনিবারের চিঠি" মুখবন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই "নাচঘরে"র এই বিশেষ বিভাগটি তুলে দেওয়া হয়। তারপর "শনিবারের চিঠি"র সম্পাদকের সঙ্গে স্থাপিত হয়েছে আমার বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্ক। আমি তাঁর "দাদা"।

অচিন্ত্যকুমার কেবল প্রভূত শব্দসম্পদের অধিকারী নন, শব্দ প্রয়োগও করেন নিপুণ শিল্পীর মত। "কল্লোলে"র দলের মধ্যে ভাষা নিয়ে তিনিই বোধ করি সবচেয়ে মাথা ঘামান বা খাটান। একেবারে চাঁচাছোলা, ওজন করা, তীক্ষ্ণধার ভাষা, যেখানে যা মানায়

খ্‌ুজে পাওয়া যায় তাকেই। অতি-মার্জনায় ও শব্দালঙ্কারের এই প্রাধান্য হয়তো সহজ সরলতার অনুকূল নয়, কিন্তু পাঠকদের চিত্তকে সম্মুগ্ধ ক'রে তোলে রীতিমত।

তারপর তিনি হলেন সরকারী চাকরে। সচল পদে অধিষ্ঠিত হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আর আমি প'ড়ে রইলুম কলকাতার একটেরে, গঙ্গার ধারে। দু'জনের মুখ-দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে তিনি যে আধ্যাত্মিকতার দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন, সে খবর পাইনি। আচম্বিতে তাঁর অতি-আধুনিক রচনা "পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" পাঠ করে সবিস্ময়ে উপলব্ধি করতে পারলুম সেই সত্য। শিল্পীর তুলি দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি পরমহংসদেবের অনুপম জীবনচিত্র।

স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ("শ্রীম") ছিলেন পরমহংসদেবের শিষ্য এবং সমসাময়িক। ঠাকুরকে তিনি যেমনটি দেখেছিলেন ঠিক সেই ভাবেই দেখিয়েছেন তাঁর অতুলনীয় গ্রন্থ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে"। সে হচ্ছে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা। সাদাসিধে, নিরলঙ্কার, চলতি ভাষার ভিতর দিয়ে জলজিয়ন্ত ভাবে দেখা যায় একটি বালকের মত সহজ সরল, ভাবে ভোলা, কিন্তু দিব্যজ্ঞানী ও অনন্যসাধারণ মহামানবকে। কিন্তু তিনি যে নিজে একজন উঁচুদরের সাহিত্য-শিল্পী, অচিন্ত্যকুমার একথা ভুলতে পারেন নি। ঠাকুরকে তিনি সাজাতে চেয়েছেন সমুজ্জল ভাষার ঐশ্বর্য দিয়ে। দুইখানি জীবন-চিত্রের মধ্যে এই হচ্ছে পার্থক্য।

এইবারেই দু-একটি ব্যক্তিগত কথা বলি। অচিন্ত্যকুমারের সখ্য আমার কাছে সত্য সত্যই প্রীতিপ্রদ। মানুষটিকে ভালো লাগে। একদিন দুপুরে সহধর্মিণী ও দুই কন্যাকে নিয়ে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ দেখতে পেলুম গুরুদাস লাইব্রেরীর ভিতরে ব'সে আছেন অচিন্ত্যকুমার। তৎক্ষণাৎ গাড়ী থেকে নেমে প'ড়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করলুম। এবং তাঁর কোন আপত্তি আমলে না এনে সোজা গিয়ে উঠলুম চৌরঙ্গীর চাঙ্গুয়া রেস্তোরাঁয়। তারপর সপরিবারে ও বন্ধু সমভিব্যাহারে বহুক্ষণ ধ'রে চলল গল্পগুজব এবং পানাহার।

আর একদিনের কথা। আমার বাড়ীর ত্রিতলের অলিন্দই হচ্ছে

আমার লেখবার, পড়বার, বসবার ও গল্প করবার জায়গা। হাতে যখন কাজ থাকে না, প্রবহমানা গঙ্গার দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকি। স্রোতস্বিনীর চলোর্মিমালার সঙ্গে সাঁতার কাটতে কাটতে অনেক দূরে চ'লে যায় নয়ন এবং মন।

এক বৈকালে সহধর্মিণী ও পুত্রকন্যাদের সঙ্গে সেইখানে ব'সে আছি, হঠাৎ গঙ্গাতীরে দেখতে পেলুম দুটি তরুণীকে। একটি মেয়ের ক্রীড়াচঞ্চল সপ্রতিভ ভাবভঙ্গি আমাকে করলে আকৃষ্ট। সাধারণতঃ বাঙালীর মেয়েরা নিজেদের নারীত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হয়ে কতকটা আড়ষ্টভাবেই পথের উপরে দেখা দেন। এ মেয়েটি সে রকম নন, জীবনের আনন্দে যেন উচ্ছ্বসিত।

ভালো লাগল। ছোট ছেলেকে বললুম, "মেয়েটিকে বাড়ীতে ডেকে আনো তো!"

স্ত্রী বললেন, "অচেনা বাড়ীতে ও'রা আসবেন কেন?"

আমি বললুম, "গৃহিণী, ও'রা হচ্ছেন নতুন বাংলার মেয়ে। রজ্জু দেখে ও'রা সাপ ব'লে ভয় পান না। সাপ দেখলেও আত্মরক্ষা করবার শক্তি আছে ও'দের।"

সত্য হ'ল আমার অনুমান। আমার বাড়ীতে তাঁরা অসঙ্কোচে চ'লে এলেন। সদর দরজার কাছে এসে একজন বললেন, "শুনেছি এইখানে কোথায় হেমেন রায়ের বাড়ী আছে।"

ছেলে বললে, "আপনারা তো সেই বাড়ীতেই এসেছেন।"

তারপর মেয়েটির পরিচয় পেলুম। একজন হচ্ছেন অচিন্ত্য-কুমারের পত্নী। আর একজন তাঁর শ্যালিকা, অবিবাহিতা ও কলেজের ছাত্রী।

তারপর অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে দেখা হ'তে বললুম, "অচিন্ত্য, সেদিন তোমার স্ত্রী হরণ করেছিলুম!"

খুব খানিকটা হেসে নিয়ে অচিন্ত্যকুমার বললেন, "শুনেছি হেমেনদা।"

* * * *

প্রেমেন্দ্রের ভাষা আমাকে বরাবরই আকর্ষণ করে। তা প্রসাদগুণে

মনোরম। তা শব্দগত নয়, ভাবগত। তার মধ্যে শব্দ-সম্পদের গন্ধ নেই, চেষ্টার লক্ষণ নেই, কিন্তু স্বয়মাগত শব্দ ব্যবহার ক'রে যথাযথ ভাব ফুটিয়ে তোলা হয়। লেখকের মনের কথা স্বাভাবিক ভাবেই পরিণত হয় পাঠকের মনের কথায়। নিজস্ব স্টাইল দেখাবার অছিলায় জোরে জোরে শব্দ-ঝুমঝুমি বাজিয়ে ও বহুতর মুদ্রাদোষের সাহায্য নিয়ে অনেকেই দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চান, কিন্তু প্রেমেন্দ্রের স্টাইল হচ্ছে স্বভাবসঙ্গত ও অকৃত্রিম। তাকে চালাতে হয় না, সে আপনি চলে। তাঁর ভাষা দেখলে বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ মনে পড়ে—সরলতাই ভাষার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।

ফরাসী সাহিত্যাচার্য ফ্লবেয়ার বলেছিলেন ঃ "সাদা কথায় সাদাকে ফোটানোই হচ্ছে উচ্চতর শক্তির কাজ।" সমালোচকরা ইংরেজী বাইবেলের ভাষার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু তা কত সহজ, কত সরল! আধুনিক যুগের আর এক ফরাসী সাহিত্যাচার্য আনাতোল ফ্রাঁশও ছিলেন একান্তভাবেই জটিলতার বিরোধী। কোনদিন তিনি কুয়াসার ধার দিয়েও যাননি, সাদা কথায় গেয়ে গিয়েছেন আলোকের গান। আবার তাঁরই পাশে দাঁড়িয়ে ফরাসী কবি স্টিফেন ম্যালার্মিকে বলতে শুনি, "এ কবিতাটিকে আবার নতুন ক'রে লিখতে হবে। সবাই কবিতাটিকে পাঠ ক'রে সহজেই বুঝতে পারছে।" ম্যালার্মির পরে এলেন পল ভ্যালারি, লোকে তাঁকে বলে, "নীরবতার বাণী" এবং তিনি বলেন—আমার নীরবতা সম্পূর্ণ নির্বাক হ'লেই আমি হতুম মহত্তর। তিনি অভিযোগ করলেন—আনাতোল ফ্রাঁশের রচনা বড় সরল! বঙ্কিমচন্দ্র ও ফ্রাঁশের সেকেলে মত একালে বোধ করি চলবে না। আধুনিকরা হয়তো বলবেন—ভাষার শ্রেষ্ঠ ত্রুটি হচ্ছে, সরলতা। সে যাইই হোক, প্রেমেন্দ্র একেলে লেখক হয়েও যে বঙ্গদেশীয় ম্যালার্মি ও ভ্যালারিদের দলভুক্ত হননি, এইটেই হচ্ছে আনন্দের কথা। বুঝতে পারব না ব'লে লেখা পড়ব? এ মত যুক্তিহীন। এবং এই আজব মতের দোহাই দিলে সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত যাঁরা অতুলনীয় ব'লে স্বীকৃত হয়েছেন, আসর ছেড়ে স'রে পড়তে হবে তাঁদের প্রত্যেককেই। আপন আপন আত্মীয়সভার কবি হচ্ছেন ম্যালার্মি ও ভ্যালারি।

সেক্সপিয়রের নিজের আত্মীয়দের কেউ চেনে না, কিন্তু সমগ্র বিশ্বের বাসিন্দারা হচ্ছে তাঁর আত্মীয়। বার্ণার্ড শ'য়ের জীবনব্যাপী প্রোপাগাণ্ডার পরেও বিশ্বের বাসিন্দারা সেক্সপীয়রকে বয়কট করেনি। জানি ওয়াকারের ভাষায়ঃ Born 1564, still going strong!"

রচনার ঐ প্রসাদগুণের জন্যেই প্রেমেন্দ্র অতি অনায়াসে বড়দের আড্ডা ছেড়ে ছোটদের আসরে এসে নিজের জন্যে জায়গা ক'রে নিতে পারেন। বাজারে গুজব শুনি, ছোটদের জন্যে লেখা কেতাবের চাহিদা নাকি যথেষ্ট। তাই হয়তো কৌতূহলী হয়ে অনেকেই ছোটদের খেলাঘরে এসে মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মারেন। কিন্তু ফল হয় না সন্তোষজনক। শরৎচন্দ্রের একখানি এই শ্রেণীর বই আছে—আমি তার নামকরণ করেছিলুম, "ছেলেবেলার গল্প"। শরৎচন্দ্রের অন্যান্য রচনার তুলনায় এ বইখানির কাটতি আশাপ্রদ নয়। যে গল্পের রচনারীতি সাবালকদের উপযোগী, তা পরিবর্তিত না করলে নাবালকদের মনে সাড়া দেয় না। আবার এক একজন এমন লেখক আছেন, যাঁরা সাবালকদের নিয়ে কারবার করবার সময়েও স্বতঃস্ফূর্ত, সহজ ও স্বাভাবিক সরলতাটুকু ঢেকে রাখবার চেষ্টা করেন না। তাই তাঁদের সে লেখা নাবালকরাও উপভোগ করতে পারে। প্রেমেন্দ্র হচ্ছেন এই শ্রেণীর লেখক। ছোটদের জন্যে লেখবার সময়ে তিনি নিজের রচনারীতি বিশেষ পরিবর্তিত না ক'রেই দৃষ্টি রাখেন কেবল তাদের উপযোগী বিষয়বস্তুর দিকে। তাঁর ঝরঝরে প্রাঞ্জল ভাষা ছোট-বড় উভয়েরই পক্ষে উপভোগ্য।

পটুয়াটোলা লেনে "কল্লোল" কার্যালয়ে প্রেমেন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়। ছোটখাটো শ্যামবর্ণ মানুষটি, সাজগোজের ভড়ং নেই, প্রফুল্ল মুখ। তারপর এখানে-ওখানে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হ'তে লাগল; পরিচয়ও ক্রমেই নিবিড় হ'য়ে উঠতে লাগল। আমি তাঁকে হয়তো তেমন আকৃষ্ট করতে পারিনি, কিন্তু তিনি আকৃষ্ট করেছিলেন আমাকে। "কল্লোলে"র মাধ্যমে যে কয়েক-জন সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলুম, তাঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্রের সঙ্গেই বেশীবার সংযোগ স্থাপনের সুযোগ পেয়েছি।

একদিন তিনি আমার বাড়ীতে পাঠগৃহের ভিতরে এসে বসলেন। সে ঘরের তিনদিকে ছিল কেতাবের আলমারি। প্রেমেন্দ্র চুপ ক'রে তাকিয়ে তাকিয়ে বইগুলো দেখতে লাগলেন। তারপর হাসি-মুখে বললেন, "হেমেনদা, আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে গেল।"

আমি বললুম, "বদলে গেল? কেন?"

কেতাবের আলমারির দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ ক'রে তিনি বললেন, "এই সব দেখে।"

আগে আমার সম্বন্ধে তাঁর কি ধারণা ছিল, সে কথা আমি আর জিজ্ঞাসা করলুম না, তিনিও খুলে কিছু বললেন না।

তাঁকে ভালোবেসেছিলুম সত্য সত্যই। রাজপথে, প্রকাশকের পুস্তকালয়ে, ফুটবল খেলার মাঠে, যেখানেই তাঁকে দেখেছি, আমার বাড়ীতে ধ'রে এনেছি। একবার কয়েক দিন তাঁর দেখা নেই, অথচ তাঁকে কাছে পাবার জন্যে মন ব্যস্ত হ'য়ে উঠল। কোথায় বাগবাজারের গঙ্গার ধার, আর কোথায় কালীঘাটের আদিগঙ্গার ধার। ট্যাক্সি ডেকে সেই দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে একেবারে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলুম। তিনি বেরিয়ে আসতেই তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে টেনে আনলুম নিজের বাড়ীতে। তখন তিনি নিজেও প্রায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করতেন। একদিন এলেন যুগলে—অর্থাৎ নব-বিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে। নিজেও যেমন ছোট্ট মানুষ, সহধর্মিণীরূপেও বেছে নিয়েছেন তেমনি একটি ছোট্ট তরুণীকে। বলা যায় মানিকজোড়।

ভেবেছিলুম প্রেমেন্দ্রকে পেলুম স্থায়ী বন্ধুরূপে, কিন্তু হঠাৎ সিনেমা এসে বাদ সাধলে। আজ কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি অদৃশ্য হয়ে আছেন। সিনেমার যে প্রতিবেশ আমার কাছে অসহনীয়, তার মধ্যেই দিব্য বাহাল তবিয়তে তিনি করছেন জীবনযাপন। তিনি কেবল আমাকেই ভোলেননি, প্রায় ভুলে গিয়েছেন সাহিত্যকেও। আগে তাঁর লেখনী প্রসব করত রচনার পর রচনা। এখন ন-মাসে ছ-মাসে তাঁর কলম থেকে ঝ'রে পড়ে দু-এক ফোঁটা কালি—তাও রীতিমত জোর তাগিদের পর। শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়েরও ঐ দশা।

ওঁদের সাহিত্যজীবনের প্রথম দিকটা অর্থাভাবে প্রীতিকর হয়নি। শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেনঃ "সর্বক্ষণ যদি দারিদ্র্যের সঙ্গেই যুঝতে হয়, তবে সর্বানন্দ সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাবনা কোথায়? কোথায় বা সংগঠনের সাফল্য? শৈলজা খোলার বস্তিতে থেকেছে, পানের দোকান দিয়েছিল ভবানীপুরে। প্রেমেন্দ্র ঔষধের বিজ্ঞাপন লিখেছে, খবরের কাগজের অফিসে প্রুফ দেখেছে।"

কিন্তু তবু তখন তাঁরা সাহিত্যধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি। অমর ফরাসী লেখক গতিয়েরকেও জীবিকানির্বাহের জন্যে অমনি সব উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করতে হ'ত, কিন্তু তিনি সাহিত্যকে ত্যাগ করতে পারেননি। ইংলন্ডের কবি ও শিল্পী বেক সারাজীবন কাটিয়ে দিয়েছেন নিরতিশয় দারিদ্র্যজ্বালা ভোগ্ন করতে করতে, কিন্তু তবু কি তিনি নিজের আর্টকে ভুলে থাকতে পেরেছেন? চিত্রকর রেমব্রান্ড যখন সর্বহারা বাজারে যখন তাঁর চাহিদা নেই এবং দেশের লোক যখন তাঁকে ভুলে গিয়েছে, তখনও তিনি এঁকে গিয়েছেন ছবির পর ছবি। আমাদের দেশের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস এক হাতে করতেন দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ, আর এক হাতে করতেন কবিতা আর কবিতা রচনা।

সাহিত্যের জন্যে অর্থ আসতে পারে—কারুর কারুর যে আসছে, স্বচক্ষেই তো সেটা দেখছি। কিন্তু অর্থের জন্যে সাহিত্য নয়, সাহিত্য নয় অর্থের জন্যে। বরং অর্থ ক্ষুণ্ণ করে আর্ট ও সাহিত্যকে। প্রমাণ প্রেমেন্দ্র ও শৈলজানন্দ। অর্থের জন্যে তাঁরা হয়েছেন সিনেমাওয়ালা। আশা করি, সুগম হয়েছে তাঁদের অর্থাগমের পথ। আশা করি, ওদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন এখন তাঁরা। তবু সিনেমার কাজের ফাঁকে তাঁরা যে সাহিত্যসেবার জন্যে খানিকটা সময় ব্যয় করতে পারেন না, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। মনে হচ্ছে প্রেমেন্দ্রই কোথায় যেন এই মর্মে বলেছিলেন—আর্টের জন্যে আমি প্রিয়াকে ছাড়তে পারি, কিন্তু প্রিয়ার জন্যে ছাড়তে পারি না আমার আর্টকে। স্বধর্ম ত্যাগ না করলে এতদিনে তাঁর সাহিত্য-সাধনার একটা মহান পরিণতি দেখবার প্রভূত সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাথেকে আমরা বঞ্চিত। প্রেমেনের জন্যে আমি দুঃখিত।

"শনিবারের চিঠি"র সম্পাদক "কল্লোল" গোষ্ঠীভুক্ত লেখকদের পক্ষে পরমবন্ধুর কাজ করেছেন। "কল্লোলে"র মত ছোট ছোট আরো অনেক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করেছে বাংলা দেশে। তবে জনসাধারণের দৃষ্টি তাদের দিকে ভালো ক'রে আকৃষ্ট হবার আগেই ফুরিয়ে গিয়েছে তাদের পরমায়ু। কিন্তু "শনিবারের চিঠি" হয়েছিল "কল্লোলের" লোভনীয় বিজ্ঞাপনের মত। "চিঠি"র সম্পাদকই হয়েছিলেন "কল্লোলের" প্রচারকর্তা। তার অশ্লীলতার অভিযোগ শুনে অনেকেই কৌতূহলী হয়ে "কল্লোলে"র সঙ্গে পরিচিত হন। তারপর তথাকথিত অশ্লীলতার জন্যে কারুর মন অশুচি হয়েছিল কি না সে কথা আমি বলতে পারব না, তবে এটুকু অনায়াসেই অনুমান করা যায় যে, একদল অজানিত ও শক্তিধর লেখকের অভাবিত আবির্ভাব দেখে সকলেই বিস্মিত না হয়ে পারেননি। কারুর কারুর কাছে তাঁদের রচনার স্থলবিশেষ হয়তো স্বাস্থ্যকর ব'লে মনে হয়নি, কিন্তু সমগ্রভাবে তাঁদের রচনা যে বলিষ্ঠ, গরিষ্ঠ ও বিশিষ্ট, এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ ছিল না নিশ্চয়ই; তাঁরা কাঁচা হাতে বেলেখেলা খেললে অশ্লীলতার খোরাক জুগিয়েও কিছুতেই টেকসই হ'তে পারতেন না। কিন্তু তাঁরা কচি হাতেও খেলতে পেরেছিলেন পাকা খেলা। লোকে তাই তাঁদের ভুললে না, চিনে রাখলে।

এই দলেরই অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র হচ্ছেন বুদ্ধদেব। কাঁচা বয়সে হয়তো তিনি বয়সোচিত দুর্বলতা প্রকাশ করেছিলেন অল্প-বিস্তর। কারণ "কল্লোলে" প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্প "রজনী হ'ল উতলা" (নামটি খাসা) সম্বন্ধে নিজেই তিনি মত প্রকাশ করেছেন—গল্পটি কিন্তু স্বাস্থ্যকর নয়। ঐটিই তাঁর রচিত প্রথম গল্প কি না, সে খবর আমি রাখি না। তবে প্রথম গল্প না হ'লেও ওটি তাঁর প্রথম বয়সেরই রচনা। সে হিসাবে গল্পটির রচনানৈপুণ্য বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

বুদ্ধদেবের নিজের মুখ থেকেই জানতে পারি, এগারো বৎসর বয়সেই তিনি তিনচারখানা খাতা কবিতায় কবিতায় ভরিয়ে ফেলেছেন এবং তখন তাঁকে আকৃষ্ট করত আমারই কোন কোন কবিতা। সে আজ

প্রায় তিন যুগ আগেকার কথা। তিনি বলেনঃ "যখন যে লেখা ভালো লাগতো, তক্ষুণি তার অনুকরণে কিছু লিখে ফেলতে না পারলে আমি টিকতেই পারতুম না। মৌচাকের দ্বিতীয় সংখ্যায় গ্রীষ্ম-বিষয়ক একটি কবিতা বেরুলো—খুব সম্ভব হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা, আমি চটপট তার একটি নকল খাড়া ক'রে মৌচাকে পাঠিয়ে দিলুম এবং চটপট সেটি ফেরৎ এলো।"

কিন্তু আজ তাঁর নকল ক'রে লেখবার এবং লেখা ফেরৎ আসবার দিন আর নেই। পত্রিকা সম্পাদকদের কাছে তাঁর রচনা এখন মহার্ঘ্য। কেবল বাংলাতে নয়, ইংরেজীতেও তাঁর লেখার হাত রীতিমত পরিপক্ক। তিনি কেবল গল্প-উপন্যাস-কবিতা লেখেন না, বেশ লেখেন প্রবন্ধও। একসময়ে নাটক রচনাতেও হাত দিয়েছিলেন, তারপর ও-বিভাগ থেকে হাত গুটিয়ে ব'সে আছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নূতন এবং আধুনিক যুগের উপযোগী। গত যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি তেমন শ্রদ্ধাবান নন। কিন্তু গত যুগের কোন কোন সাহিত্যিকের মতন এমন মস্ত মস্ত গ্রন্থ রচনা করতে পারেন যে দেখলে চক্ষু বিস্ফারিত হয়—তাদের মধ্যে 'কোয়ালিটি' ও 'কোয়াণ্টিটি' দুইই পাওয়া যায়, সাধারণতঃ যা দুর্লভ।

"কল্লোল" কার্যালয়ে প্রেমেনের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের সময়ে প্রথম দেখি বুদ্ধদেবকে। তাঁর লেখা পড়লে মনে জাগে, একটি একরোখা মানুষের মূর্তি, মুখে যাঁর 'কুছ পরোয়া নেহি' গোছের অদম্য ভাব। কিন্তু চেহারাটি শান্তশিষ্ট নিরীহ ধরণের, দশজনের ভিতর থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। তাঁর লেখায় যে ব্যক্তিত্ব পাই, তাঁর চেহারায় তা নেই। হাসতে হাসতে এবং কথা কইতে কইতে সিগারেটের পর সিগারেট পুড়িয়ে ছাই করেন।

ভারি সিগারেটের ভক্ত। অস্কার ওয়াইল্ডের মত তাঁর কাছেও সিগারেট বোধ করি "নিখুঁত আনন্দ"। ঐখানে তাঁর সঙ্গে আমার মিল আছে। সিগারেটের অভাব হ'লে চোখে আমি অন্ধকার দেখি। অচিন্ত্যের সঙ্গে বুদ্ধদেব একদিন আমার বাড়ীতে পদার্পণ করেছিলেন।

অচিন্ত্য বললেন, "হেমেনদার বাড়ীতে যেখানেই বসি, সেইখানেই

দেখি খালি ছাইদান আর ছাইদান।”

বুদ্ধদেব গম্ভীরভাবে বললেন, “প্রত্যেক ভদ্রলোকের বাড়ীতেই তা থাকা উচিত।”

জাত-সাহিত্যিক এই বুদ্ধদেব। সাহিত্যের প্রতি তাঁর অটল নিষ্ঠা। এসেছে সৌভাগ্য, এসেছে দুর্ভাগ্য, কিন্তু টাকার প্রভাবে বা অভাবে কোন দিনই বিসর্জন দেননি সাহিত্যধর্ম। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি।

বত্রিশ

ইনি, উনি, তিনি

আমার যখন বাল্যকাল, তখন স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয় ছিল বর্তমান বাড়ী ছাড়িয়ে একটু উত্তর দিকে। তখনও সাহিত্যিক হইনি, কিন্তু মনের মধ্যে সাহিত্যমদিরা পানের ইচ্ছা ছিল যথেষ্ট প্রবল। কেতাব কেনবার জন্যে প্রায়ই যেতুম ওখানে। তার নাম ছিল তখন বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী। এটি অপনাম। নাটক, নভেল ও কবিতা প্রভৃতি যেখানে প্রধান বিক্রেয়, সেখানে "মেডিক্যাল" শব্দটির আবির্ভাব কেন, এমন প্রশ্ন জাগতে পারে অনেকেরই মনে। শুনেছি, গুরুদাসবাবু বইয়ের ব্যবসা সুরু করেন প্রথমে ডাক্তারী কেতাব নিয়েই। তারপর ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সাহিত্য সম্পর্কীয় গ্রন্থমালাই প্রাধান্য লাভ করে এবং পুস্তকালয়ের নামও পরিবর্তিত হয়। কিন্তু লোকে সংক্ষেপে তার নাম রেখেছিল "গুরুদাস লাইব্রেরী"।

ওখানকার বর্তমান অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে সর্বদাই দেখতুম ছেলেবেলায় বই কিনতে গিয়ে। কাঁচা বয়সেই বইয়ের ব্যবসায়ে তিনি পিতাকে সাহায্য করতেন। পরে যে আমি হব গ্রন্থকার এবং তিনি হবেন আমার অন্যতম প্রকাশক, তখন এটা ছিল আমার স্বপ্নের অগোচর। তাঁর আগেকার চেহারা আমার বেশ মনে পড়ে। আজ তিনি প্রাচীন, কিন্তু এখনো তাঁর মধ্যে সেই নবীন বয়সের আদল খুঁজে পাওয়া যায়, সাধারণতঃ যা দেখা যায় না।

অর্ধ শতাব্দী আগে কলকাতার বড় বড় রাজপথে—এমন কি অলিগলিতেও আজকের মত বইয়ের দোকানের ছড়াছড়ি ছিল না। সাহিত্য সম্পর্কীয় কেতাবের দরকার হ'লে সবাই আগে যেত গুরুদাস লাইব্রেরীতে এবং আগেকার প্রত্যেক প্রখ্যাত লেখকেরই পুস্তক প্রকাশিত বা বিক্রীত হ'ত ঐখান থেকেই। সেই সূত্রে ওখানে আনা-

গোনা করতেন সেকালকার নাম-করা বড় বড় সাহিত্যিকরা। রোদ প'ড়ে এলে গুরুদাসবাবু পুস্তকালয়ের বাইরে আসতেন। ফুটপাথের উপরে পাতা থাকত একখানি বেঞ্চি। তারই উপরে আসীন হয়ে তিনি আলাপ করতেন সমাগত সাহিত্যিকদের সঙ্গে। গুরুদাসবাবু যখন বৃদ্ধ ও দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তখনও তিনি ছাড়তে পারেননি এই পূর্ব-অভ্যাসটি। বড় বড় সাহিত্যিকদের সঙ্গে চোখের দেখা হবে, এই লোভে বালক ও কিশোর বয়সে প্রায়ই আমি গুরুদাস লাইব্রেরীর সামনে দিয়ে আনাগোনা করতুম। তখন সাহিত্যিকদের ভাবতুম, ভিন্ন জগতের বিস্ময়কর মানুষ। এখন মনের মধ্যে এমন মহাপুরুষার্চনের ভাব জাগ্রত হয় কদাচ। এখন জেনেছি, অধিকাংশ তথাকথিত সাহিত্যিকই হচ্ছেন রাম-শ্যামের মতই সাধারণ মানুষ। উপরন্তু কোন কোন নামজাদা সাহিত্যিকের চেয়ে অনামা রাম-শ্যামের সঙ্গ অধিকতর প্রীতিপ্রদ ও নিরাপদ।

পরে গুরুদাস লাইব্রেরীর মত এম. সি. সরকারের পুস্তকালয়ও পরিণত হয়েছিল সাহিত্যিকদের মিলন-ক্ষেত্রে। কেবল "ভারতী"র দলের নয়, "কল্লোলে"র দলের সাহিত্যিকরাও সেখানে এসে আসর জমিয়ে তুলতেন। নজরুল, অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব ও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ প্রভৃতির সঙ্গে তো আগেই পরিচিত হয়েছিলুম, ওঁদের অন্যান্য সহযাত্রীর মধ্যে জসীমউদ্দীন, হুমায়ুন কবীর, অজিত দত্ত, ভূপতি চৌধুরী ও হেমচন্দ্র বাগচীর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় এম. সি. সরকারের পুস্তকালয়েই। কেবল "ভারতী"র ও "কল্লোলে"র দলের নয়, অন্যান্য বহু বিখ্যাত ব্যক্তিও ওখানে আনাগোনা করতেন বা এখনো করেন—যেমন স্বর্গীয় ডক্টর সতীশচন্দ্র বাগচী, স্যর যদুনাথ সরকার, শ্রীরাজশেখর বসু ও শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রভৃতি। এ জায়গাটি ছিল প্রবীণ ও নবীনদের কলাকেলির আসর।

"কল্লোলে"র আর একজন নিয়মিত লেখক হচ্ছেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মাতুল এবং সাহিত্যশিষ্য। শরৎচন্দ্রের লেখা গল্প "মন্দির" প্রকাশিত হয় ১৩০৯ সালের "কুন্তলীন পুরস্কার" নামক বার্ষিক গ্রন্থে। কিন্তু গল্পটি তিনি চালিয়ে দিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথেরই নামে। তিনি কলকাতার লোক

নন, তবে এখানে এলেই আমরা তাঁর দেখা পেতুম। "ভারতী"র বৈঠকে এসে আলাপ-আলোচনা করতেন। মিতভাষী, কিন্তু গম্ভীর ছোটখাটো সৌম্যদর্শন মানুষটি। তাঁকে আমরা নিজেদের গোষ্ঠীর ভিতরেই টেনে নিয়েছিলুম। আমরা বারোজন মিলে রচনা করেছিলুম "বারোয়ারি উপন্যাস"—তার লেখকদের নাম হচ্ছে প্রমথ চৌধুরী (বীরবল), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও হেমেন্দ্রকুমার রায়। "ভারতী"তেই এই শ্রেণীর আয়োজন করেন প্রথমে সরলা দেবী, তারপর মণিলাল। "বারোয়ারি উপন্যাসে"র শেষাংশের ভার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ "মধুরেণ সমাপয়েৎ" করবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যখন তাঁর পালা এল তখন তিনি য়ুরোপে। কাজেই শেষরক্ষা করবার ভার নেন প্রমথ চৌধুরী।

বয়সে নবীন "কল্লোলে"র লেখকদের দলে ভিড়ে বয়সে প্রবীণ সুরেন্দ্রনাথ কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ করেন নি, এটা তাঁর মানসিক তারুণ্যেরই পরিচয় দেয়। "কল্লোলে" তিনি ধারাবাহিকভাবে শরৎচন্দ্রের জীবনকথা লিখেছিলেন, মাসিকপত্রে শরৎচন্দ্রের জীবন নিয়ে আলোচনা সেই বোধ করি প্রথম। তারপর "ভারতবর্ষে"ও শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গ নিয়ে লেখনী চালনা করেন। তিনি একজন শক্তিশালী লেখক। উপন্যাসে ও ছোটগল্পে রীতিমত দক্ষতা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু একনাগাড়ে সাহিত্যশ্রম বোধ হয় তাঁর কাছে রুচিকর নয়। মাঝে মাঝে বেশ কিছুকাল ধ'রে কলম ছেড়ে তিনি সকলের চোখের আড়ালে ব'সে থাকতে ভালোবাসেন। ফলে গভীর রেখাপাত হয় না জনসাধারণের চলচিত্তে।

এম. সি. সরকারের পুস্তকালয়ে আরো দুজন আধুনিক সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, যাঁরা রচনায় বিশেষ গুণপণা দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত ভেস্তে গিয়েছেন। এঁদের একজন হচ্ছেন সদালাপী প্রসন্নমুখ শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু। "প্রবাসী"তে প্রকাশিত তাঁর "রমলা" উপন্যাস সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁর

অন্যান্য রচনাও আছে। আর একজন হচ্ছেন শ্রীভূপতি চৌধুরী। "কল্লোল" দলভুক্ত গল্পলেখক। লেখক হিসাবে এ'রা দুইজনেই সাহিত্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যেতে পারতেন। কিন্তু মণীন্দ্রলাল ব্যারিষ্টার এবং ভূপতি বাস্তুকার হয়ে এখন লক্ষ্মীর ঝাঁপি থেকে অল্পবিস্তর হস্তগত করবার জন্যে এতই ব্যস্ত হয়ে আছেন যে, সরস্বতীর মুখ দেখবার ফুরসত পান না। এবং এই দলের লোক ব'লেই গণ্য করতে পারি হুমায়ুন কবীর ও শ্রীমণীশ ঘটককেও। তাঁদেরও বোধ হয় আর বাংলা সাহিত্যের স্বপ্ন দেখবার অবসর নেই।

সব বীজে চারা জন্মায় না। কিন্তু চারা দেখা দিয়ে বড় হয়ে দু-একবার রঙিন ফুল ফুটিয়ে যদি ফুল ফুটানোর পালা অসময়েই সাঙ্গ ক'রে দেয়, তাহলে মনে থাকে না আক্ষেপের অবধি। পুষ্পিত হ'তে পারি, কিন্তু পুষ্পিত হব না। শক্তি আছে, কিন্তু শক্তিকে রাখব শ্রমবিমুখ ক'রে। এই রীতি অনুসারে চললে শিল্পী কেবল নিজের উপরে নয়, অবিচার করেন শিল্পের উপরেও।

বাংলা সাহিত্যে এই শ্রেণীর দুর্ঘটনা আরো দুইবার ঘটতে ঘটতে ঘটেনি। প্রমথ চৌধুরী জীবনের পূর্বার্ধে "বীরবল" নামের আড়ালে থেকে কালেভদ্রে দুই একটি প্রবন্ধ রচনা করতেন কথ্য ভাষায়। একে তো সেকালকার অতিশয় সাধু সাহিত্যিকেরা কথ্যভাষাকে সুপথ্য ব'লে বিবেচনা করতেন না, তার উপরে ন-মাসে ছ-মাসে প্রকাশিত সেই রচনাগুলির ভিতরে প্রভূত মুনসীয়ানা থাকলেও সেগুলিকে মনে করা হ'ত, চুটকি জিনিস বা ফালতো মাল। বীরবল যদি লেখাচ্ছলে কালি ছড়িয়ে সেই পর্যন্ত এগিয়েই থেমে যেতেন তাহলে স্থায়ী সাহিত্যের মজলিসে কল্‌কে পেতেন না নিশ্চয়ই।

সৌভাগ্যক্রমে স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় হঠাৎ তাঁর স্কন্ধে চাপিয়ে দিলেন "সবুজ পত্রে"র ভার। সবুজের সংস্পর্শে এসে প্রৌঢ় প্রমথ চৌধুরীরও চিত্ত হয়ে উঠল শ্যামল। মেতে উঠলেন তিনি এক নূতন অনুপ্রাণনায়, ভূরি পরিমাণ রচনায় রচনায় ছেয়ে দিলেন "সবুজ পত্র"কে। কথ্যভাষার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন বাংলা সাহিত্যের দরবারে, এমন কি নিজের পক্ষে টেনে আনলেন

রবীন্দ্রনাথকেও এবং তিনিও অবলম্বন করলেন কথ্যভাষা। সবাই পেলে প্রমথ চৌধুরীর সম্যক পরিচয়। জানলে তিনি কেবল উচ্চশ্রেণীর শিল্পী ও প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধকার নন, সেই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ কবি ও গল্পলেখকও।

শরৎচন্দ্র সতেরো বৎসর বয়স থেকেই সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেন। গল্পের পর গল্প, উপন্যাসের পর উপন্যাস লিখে যান। তাঁর 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ' ও 'দেবদাস' প্রভৃতি সেই প্রথম যুগেরই রচনা। সে সব রচনা তখনকার মত পাণ্ডুলিপির আকারেই অপ্রকাশিত থাকে। তারপর লেখার পাট তুলে দিয়ে তিনি রেঙ্গুণে গিয়ে করেন কেরাণী-গিরি। প্রায় এক যুগ পর্যন্ত কেটে যায়। এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অখ্যাত ও অনাদৃত হয়ে তিনি হয়তো কেরাণীগিরি ক'রেই কাটিয়ে দিতেন। পরে তাঁর আত্মীয়-বন্ধুরা অপ্রকাশিত ও অপেক্ষাকৃত কাঁচা রচনাগুলি ছাপিয়ে দিলেও শরৎচন্দ্রের নাম এমন অনন্যসাধারণ হ'তে পারত না।

কিন্তু তা হবার নয়। বন্ধুবান্ধবের বিশেষ পীড়াপীড়িতে এবং "যমুনা" সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের নির্বন্ধাতিশয়ে শরৎচন্দ্র আবার এক যুগ পরে লেখনী ধারণ করতে বাধ্য হলেন। সঙ্গে সঙ্গে সার্থক হয়ে উঠল তাঁর পুনরাগমন, তাঁর রচনাগুলি কাজ করলে মন্ত্রশক্তির মত, দিকে দিকে শোনা গেল বহু কণ্ঠের অভিনন্দন। তখন নতুন প্রেরণা লাভ ক'রে মাছি-মারা কেরাণী আবার এসে বসলেন রূপস্রষ্টা শিল্পীর আসনে। বাংলা সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পরে আবার লাভ করলে একজন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিককে। প্রমথ চৌধুরী ও শরৎচন্দ্রের মন ফিরেছে দৈব ঘটনার জন্যে। তা না হ'লে কত মহান দান থেকে বঞ্চিত হ'ত বাংলা সাহিত্য।

"কল্লোলে"র আর এক আড্ডাধারী হচ্ছেন শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণ করছেন বহুকাল, "কল্লোল" সম্পাদক ছাড়া দলের আর সকলের চেয়ে বয়সেও বড়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে এবং নানা সাহিত্য-বৈঠকে আনাগোনা ক'রে তিনি বাংলা দেশের অধিকাংশ প্রখ্যাত সাহিত্যিকের সঙ্গে স্থাপন করেছেন বন্ধুত্বের সম্পর্ক। তাঁর রচনাশক্তিও আছে, কিন্তু

অনুবাদের দিকেই ঝোঁক বেশী। তিনি অনেকগুলি বিদেশী বই তর্জমা করেছেন।

কবি জসীমউদ্দীনের চেহারাখানিও মেঠো এবং সাধারণতঃ রচনাও করেন মেঠো কবিতা। তাঁর এক একটি কবিতা নগরের ইষ্টক-কোটরে বহন ক'রে আনে গ্রাম্য মাটির সোঁদা গন্ধ। নিজের জন্যে তিনি বেছে নিয়েছেন বিশিষ্ট একটি পথ—তার উপরে আছে মুক্ত নীলিমার আশীর্বাদ এবং ছায়াতরুর স্নিগ্ধ প্রসাদ ; তার দুই পাশে আছে দিগন্তে বিলীন তেপান্তর ধানের ক্ষেতের হরিৎ ফসল, আকাশ-নীল সরোবর। সহর-পালানো মন পায় ছুটির আমোদ।

"কল্লোলে"র অধিকাংশ লেখক উপন্যাস, গল্প ও কবিতা রচনার দিকে যতটা দৃষ্টি দিয়েছেন, প্রবন্ধ রচনা ও সমালোচনার দিকে ততটা দেন নি। কেবল গল্প ও পদ্য নিয়ে কোন সাহিত্যই পরিপূর্ণতার দাবি করতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকাররূপেও প্রচুর খ্যাতিলাভ করেছেন।

"কল্লোল" গোষ্ঠীর ভিতরে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের বেলায় এর ব্যতিক্রম দেখি। প্রবন্ধের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং তাঁর অনেক প্রবন্ধই গল্পের মত চিত্তহারী ও কবিতার মত উপভোগ্য। ঐ দলের আর একজন লেখক হচ্ছেন শ্রীঅজিত দত্ত। অদ্যাবধি তাঁর সাহিত্যসেবা অব্যাহত আছে। কিছু লাজুক, শান্তশিষ্ট, সুদর্শন চেহারা। বুদ্ধদেবের বাল্যবন্ধু, অল্পবয়স থেকে একসঙ্গে সাহিত্যচর্চা সুরু করেন তাঁরা দুজনেই। অজিত একাধারে কবি ও প্রবন্ধকার। কিছুদিন আগে "রৈবত" ছদ্মনামে তাঁর রচিত একখানি বই পড়েছি, তার নাম "মনপবনের নাও"। প্রধানতঃ সাহিত্য ও চারুকলা নিয়ে সাতাশটি নিবন্ধের সমষ্টি। দৃষ্টি তাঁর রসিক সমালোচকের। তাঁর সব মতই যে সকলের মনের মতন হবে, এমন আশা কেউ করে না। কিন্তু তিনি যা কিছু দেখেছেন, যা কিছু বলেছেন, মুক্ত দৃষ্টি আর মুক্ত মন নিয়েই দেখেছেন এবং বলেছেন। তাঁর ভাষার ও বক্তব্যের দুই টুকরো নমুনা দিঃ

(১) "তথাকথিত মাইনর লেখকেরা প্রত্যেক দেশের কাব্যসাহিত্যের একটা বিশিষ্ট অংশের রচয়িতা। অন্যান্য সাহিত্যের মত বাঙলা

সাহিত্যের একটা উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ অংশ যে অজ্ঞাতনামা লেখকদের লেখা একথা কে না জানে? লোকসাহিত্য এবং পদাবলী সাহিত্যের অজ্ঞাত ও প্রচ্ছন্ননামা লেখক তো অসংখ্য। এখানে নামজাদা বা মেজর-মাইনরের প্রশ্ন ওঠে না। ভালো-মন্দ লেখার প্রশ্নই সর্বপ্রধান।" ,,,,

(২) "কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের বিশেষ ক'রে নির্জনতা খুঁজে বেড়াতে হয় চোখের দেখা মানুষগুলোকে মনের দেখা দেখবার জন্য। সেই দেখা না দেখলে তাদের নিয়ে সৃষ্টি হয় না, আঁকা যায় না তাদের স্পষ্ট ক'রে.........বাইরের দেখা, বাইরের শোনা, বাইরের পাওয়া না ফুরোলে মনের দেখা মনের শোনা মনের পাওয়া সুরু হয় না।"

তেত্রিশ

রাজারাও [illegible]ণ

বাংলা দেশে এমন সব সাহিত্যিকের অভাব নেই, যাঁদের ভূষণ হচ্ছে রাজা বা মহারাজা উপাধি। বিশেষভাবে কয়েকজনের নাম মনে পড়ে।

নাটোরের রাজবংশ বহুদিন থেকেই রচনাশক্তির জন্যে বিখ্যাত। রাণী ভবানীর পুত্র মহারাজা রামকৃষ্ণ রায় সংগীত রচনায় প্রভূত কৃতিত্ব প্রকাশ ক'রে গিয়েছেন। গায়কদের বৈঠকে আজও শোনা যায় তাঁর রচিত কোন কোন গান। যেমন—

> "মন যদি যায় ভুলে।
> তবে বালির শয্যায় কালীর নাম
> দিও কর্ণমূলে।"

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় ছিলেন উচ্চশ্রেণীর কবি, সন্দর্ভকার ও সম্পাদক। তাঁর পুত্র মহারাজা শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়ও কবি। যোগীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার শ্রীজয়ন্তনাথ রায় রচিত কাব্যপুস্তক "স্বর্ণরেখা" আমি পাঠ করেছি। কবিতাগুলির মধ্যে দক্ষ হাতের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। বাংলা গদ্যসাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। সাহিত্যিকরূপে প্রথম জীবন আরম্ভ ক'রে পরে রাজা বা মহারাজা খেতাব পেয়েছেন তিনজন সুপরিচিত ব্যক্তি— রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। মাত্র ষোলো বৎসর বয়সেই সৌরীন্দ্র-মোহন নাটক ("মুক্তাবলী") রচনা করেছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব "শব্দকল্পদ্রুমে"র জন্যে অক্ষয় খ্যাতি অর্জন করেছেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবেরও ইংরেজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ আছে। বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চন্দ্র মহাতাব কয়েকখানি পুস্তকের লেখক। কাশিম-

বাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীও গ্রন্থকার। সুসঙ্গের রাজা কুমুদচন্দ্রও ছিলেন সাহিত্যিক।

লালগোলার কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় যখন "রাজা" উপাধি লাভ করেননি, তখন থেকেই একান্তভাবে সাহিত্যসেবা ক'রে আসছেন। এই সাহিত্যানুরাগের উৎস কোথায় তা অনুমান করা কঠিন নয়। তাঁর পিতামহ দানবীর মহারাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় অবাঙালী হয়েও বাংলাদেশে এসে মনেপ্রাণে খাঁটি বাঙালী হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি যে বাংলা সাহিত্যের কত বড় বন্ধু ছিলেন, সে কথা এখানে নতুন ক'রে বলবার দরকার নেই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তাঁর স্মরণীয় অবদান আছে। অসংখ্য সাহিত্যিক অলঙ্কৃত করতেন তাঁর আসর। এমন কি সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত কিছুদিনের জন্যে তাঁর আতিথ্য স্বীকার ক'রে রাজবাড়ীতে ব'সে রচনা করেছিলেন "আনন্দমঠে"র কিয়দংশ। এই পরিবেশের মধ্যে সুকুমার বয়স থেকে মানুষ হয়ে ধীরেন্দ্রনারায়ণেরও চিত্তে উপ্ত হয়েছিল সাহিত্যের বীজ।

তারপর তিনি দীর্ঘকালব্যাপী ছাত্রজীবন যাপন করেন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অধীনে এবং তাঁর কাছেই ধীরেন্দ্রনারায়ণের সাহিত্যশিক্ষা আরম্ভ হয়। এমন অসাধারণ সাহিত্যবীরকে উপদেশকরূপে লাভ ক'রেই তিনি বঙ্গবাণীর পরম ভক্ত না হয়ে পারেননি। রামেন্দ্রসুন্দর ও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পরস্পরের অনুরাগী এবং দুজনেই আনাগোনা করতেন দুজনের আলয়ে। সেই সময়ে প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন কিশোর ধীরেন্দ্রনারায়ণ এবং দুই সাহিত্যশিল্পীর কলালাপের ফাঁকে ফাঁকে আবৃত্তি করতেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা। তাঁর তরুণ কণ্ঠে স্বরচিত কবিতার আবৃত্তি শুনে রবীন্দ্রনাথ আনন্দপ্রকাশ করতেন।

সুতরাং বোঝা যায়, সাময়িক খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যে তিনি হঠাৎ সাহিত্যিক হয়ে ওঠেননি। সাহিত্য তাঁর আবাল্য সাধনার বস্তু। দীর্ঘকাল ধ'রে তিনি লেখনী চালনা ক'রে আসছেন। গল্প লিখেছেন, উপন্যাস লিখেছেন, কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করেছেন। একদিন বাড়ীতে ফিরে এসে দেখি, আমার লেখবার টেবিলের উপরে প'ড়ে

রয়েছে একটি হস্তলিখিত কবিতা। পাঠ করে বুঝলুম, ধীরেন্দ্র-নারায়ণ এসেছিলেন, কিন্তু আমার দেখা না পেয়ে সেইখানেই ব'সে কবিতাটি রচনা ক'রে রেখে গিয়েছেন। কিছুকাল আগে তিনি "নীল সাড়ী" নামে একখানি স্বরচিত নাটকও পাঠ ক'রে শুনিয়ে গিয়েছেন। নাটকখানি আমার ভালো লেগেছিল। তাঁর দুইখানি উপন্যাসের নাট্যরূপ রঙ্গমঞ্চের উপরে প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু এই মৌলিক নাটকখানি এখনো পাদপ্রদীপের সামনে স্থাপিত হয়নি।

নাট্যজগতের দিকেও তাঁর আকর্ষণ খুব প্রবল। শুনেছি লালগোলায় তিনি বড় বড় ভূমিকায় সৌখীন অভিনেতারূপে দেখা দিয়েছেন। তাঁর কোন অভিনয় দেখবার সুযোগ আমার হয়নি বটে, কিন্তু কলকাতার বিভিন্ন রঙ্গালয়ের প্রেক্ষাগৃহে নাট্যরসিক দর্শক-রূপে তাঁকে উপস্থিত থাকতে দেখেছি।

ষ্টার থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। ঊনত্রিশ-ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। লক্ষ্য করলুম, একটি সুদর্শন, দীর্ঘদেহ যুবক দূর থেকে ঘন ঘন আমার দিকে তাকিয়ে দেখছেন। তারপর তিনি নিজেই আমার কাছে এসে আলাপ করলেন। পরিচয় পেয়ে জানলুম, তিনি হচ্ছেন লালগোলার কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ। বললেন, "আমি আপনার পরম ভক্ত।" কি গুণে আমি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলুম জানি না, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয়ে উঠল অত্যন্ত নিবিড়। লালগোলা থেকে কলকাতায় এলেই তিনি আমার বাড়ীতে ছুটে আসতেন। দীর্ঘকাল ধ'রে গল্পসল্প চলত—আজও চলে। আমি আজকাল বাড়ীর বাইরে পারতপক্ষে পা বাড়াই না, কিন্তু তিনি আমার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হন যখন তখন এবং অভিযোগ করেন, কেন আমি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করি না?

একদিন সন্ধ্যায় আমাকে নিয়ে তিনি বেড়াতে বেরিয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে পড়লেন। তারপর দুইজনে গাড়ী থেকে নেমে গিয়ে বসলুম গড়ের মাঠের এক বেঞ্চের উপরে। আমি টানতে লাগলুম সিগারেট, তাঁর জন্যে অনুচর নিয়ে এল আলবোলা।

ধীরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, "উঁহু, খালি ধোঁয়া খেয়ে তো পেট ভরে

না দাদা! আপনাকে কিছু নিরেট খাবার খেতে হবে।"

আমি বললুম, "এই গঙ্গার ধারে খাবার কোথায় পাবেন?"

"আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনি আসছি"—ব'লেই তিনি আবার গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। তারপর নিজে চাঙ্গুয়া হোটেলে গিয়ে খাবার কিনে আবার হাসতে হাসতে ফিরে এলেন। সঙ্গে অনুচর ছিল, গাড়ীর চালক ছিল, কিন্তু তবু তিনি খাবার কেনবারভার দিলেন না তাদের হাতে। স্বহস্তে খাবার না কিনে এনে তাঁর তৃপ্তি হ'ল না।

তাঁর বন্ধুপ্রীতি ও আন্তরিকতার আরো কত প্রমাণই যে পেয়েছি! আমার সহধর্মিণী যখন পরলোকে গমন করেন, তখন তিনি শিলং-এ গিয়েছিলেন বায়ু পরিবর্তনের জন্যে। কিন্তু খবর পেয়েই তিনি কলকাতায় ফিরে এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে করুণ স্বরে বললেন, "দাদা, আপনার এই সর্বনাশের কথা শুনে না এসে থাকতে পারলুম না।"

নানা ব্যসনের জন্যে ধনিকদের নাম হয় কুবিখ্যাত। ধীরেন্দ্র-নারায়ণেরও যদি কোন ব্যসন থাকে এবং যদি তাকে ব্যসন বলা যায়, তবে তা হচ্ছে, সাহিত্য ও শিল্প। সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সাহচর্য লাভ করবার জন্যে সর্বদাই তিনি প্রভূত আগ্রহ প্রকাশ ক'রে থাকেন। এবং তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করেন সমকক্ষ, নিরভিমান, অমায়িক সুহৃদের মতই। ভালোবাসা তাঁর সোদরপ্রতিম। কেবল ভালোবাসা নয়, দুঃস্থ সাহিত্যিকদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনলে তৎক্ষণাৎ তিনি হন মুক্তহস্ত। কত সাহিত্যিককে তিনি যে গোপনে অর্থ-সাহায্য করেছেন, এ কথা বাইরে কোন দিন প্রকাশ পায়নি।

জমিদারী প্রথা তুলে দেওয়া হ'ল। এ প্রথা ভালো কি মন্দ, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। কিন্তু এ প্রথা উঠে গেলে দেশে আর কেউ কাশিমবাজারের মণীন্দ্রচন্দ্র ও লালগোলার যোগীন্দ্রনারায়ণের মত দান-শৌণ্ড মহারাজার নাম শুনতে পাবে না। মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ গোপনে যে বিপুল অর্থদান ক'রে গিয়েছেন, কাকপক্ষীকেও তা টের পেতে দেননি। কিন্তু তাঁর যে অন্যান্য দানের হিসাব পাওয়া যায়, তার পরিমাণ হবে প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা!

এমন মহাদাতার পৌত্র হয়ে ধীরেন্দ্রনারায়ণও যে বংশের ধারা বজায় রাখবার চেষ্টা করবেন, সে কথা অনায়াসেই অনুমান করা যায়। সাধারণ সৎকার্যে অকাতরে অর্থব্যয় করবার জন্যে সর্বদাই তিনি প্রস্তুত। বীরভূম জেলার কলেশ্বর নামক স্থানে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় ক'রে প্রকাণ্ড এক শিবমন্দির নির্মাণ ক'রে তিনি নিজের ধর্ম-প্রাণতার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলাদেশের 'বয়েজ স্কাউট'দের জন্যেও দান করেছেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। তাঁর সমগ্র দানের পরিমাণ আমার জানা নেই বটে, তবে এ কথা আমি জানি যে, বহু আশ্রম, বহু প্রতিষ্ঠান ও বহু অভাবগ্রস্ত পরিবারকে দরাজ হাতে সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হননি। আজ তাঁর জমিদারীর অধিকাংশ হয়েছে পাকিস্তানের কুক্ষিগত, কিন্তু এখনো হ'তে পারেননি তিনি হাতভারী।

মনের জোরও তাঁর কম নয়। ইংরেজ আমলে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিলে উপাধিধারী পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণকে যথেষ্ট বিপন্ন হ'তে হ'ত। তিনি কিন্তু নির্ভয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। লবণ আইন সংক্রান্ত সত্যাগ্রহের সময়ে স্বয়ং অগ্রণী হয়ে সর্বপ্রথমে নিষিদ্ধ লবণ ক্রয় করতে বিরত হননি। এজন্যে সরকারপক্ষ থেকে অভিযোগ এসেছিল স্বর্গীয় মহারাজের কাছে। এমন কি তাঁর বন্দুকের লাইসেন্স পর্যন্ত বাতিল ক'রে দেবার প্রস্তাব হয়েছিল। তিনি কিন্তু ভয় পাননি। বহরমপুরের জেলখানায় গিয়ে রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতেন। প্রহরীদের উৎকোচে বশীভূত ক'রে আড়ালে সরিয়ে দিয়ে বন্দীদের মধ্যে করতেন অর্থবিতরণ।

একবার "মিলনী" সমিতি ষ্টিমার-পার্টির আয়োজন করে, ধীরেন্দ্রনারায়ণ তখনও রাজা উপাধি পাননি। রবীন্দ্রনাথকে আসবার জন্যে আমন্ত্রণ করা হয়, তিনি কিন্তু অনিচ্ছুক। তখন ধীরেন্দ্রনারায়ণ তাঁকে ধ'রে আনতে গেলেন এবং তিনিও হাসি-মুখে ধরা দিতে আপত্তি করলেন না। বালক ধীরেন্দ্রনারায়ণ তাঁর কাছ থেকে আদর পেয়েছেন এবং শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ও লালগোলার মহারাজের কাছে ঋণী। এ দানের কথা বাইরের কেউ

জানত না, প্রকাশ পেয়েছে কেবল রবীন্দ্রনাথেরই এক পত্রে: "লালগোলার রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বদান্যতায় আমাদের বিদ্যালয় রক্ষা পাইয়াছে।" কাজেই ধীরেন্দ্রনারায়ণের হস্তে আত্মসমর্পণ ক'রে রবীন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত হলেন ষ্টিমার-পার্টিতে।

ধীরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, "আপনার স্পর্শ পেয়ে আমাদের তরী আজ সোনার তরী হয়ে উঠেছে।"

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, "তুমি সুন্দর কথা বলেছ।"

সেখানে হাজির ছিলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রও। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁরও ফোটো তোলা হ'ল।

শরৎচন্দ্র খুসি হয়ে ধীরেন্দ্রনারায়ণকে বলেছিলেন, "কুমার, আপনার কাছে আমি ঋণী। আমার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল রবীন্দ্রনাথের পাশে ব'সে ফোটো তুলি। আপনারই জন্যে আমার সে ইচ্ছা এতদিনে পূর্ণ হ'ল।"

একবার মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলুম বাংলার হতভাগ্য নবাব সিরাজদ্দৌলার সমাধি দেখবার জন্যে। সেখান থেকে লালগোলা খুব কাছে। ধীরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম।

তখন প্রায় দুপুর বেলা। প্রাসাদের ফটক পেরিয়ে সুদীর্ঘ চবুতর অতিক্রম ক'রে গাড়ী-বারান্দার কাছে এসে দেখি, হাঁটুর উপরে তোলা একখানা ময়লা কাপড় প'রে ধীরেন্দ্রনারায়ণ আদুড় গায়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ভৃত্য তাঁর সর্বাঙ্গে তেল মাখিয়ে দিচ্ছে। প্রথমটা এমন অবাক হয়ে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলেন না—যেন পর্বত এসে উপস্থিত হয়েছে মহম্মদের কাছে।

তারপর আমার রচিত একটি গানের পংক্তি উদ্ধার ক'রে ব'লে উঠলেন, "নয়ন যদিন রইবে বেঁচে তোমার পানেই চাইব গো!" এবং বিপুল আনন্দে সেই এক-গা তেল মাখা অবস্থাতেই দীর্ঘ দুই বাহু বিস্তার ক'রে আমাকে আলিঙ্গন করবার জন্যে ছুটে এলেন। বহু কষ্টে তাঁর সেদিনকার ভালোবাসার অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলুম।

তারপর সে কি যত্নাদর, যার তুলনা হয় না। আধ ঘণ্টা পরেই এল এতরকম খাবার যে, আসনে ব'সে হাত বাড়িয়ে সব পাত্রের নাগাল পাওয়া যায় না।

বৈকালের পরে আমাকে তিনি টেনে নিয়ে গেলেন পাখী শিকার করবার—অর্থাৎ দেখবার জন্যে। তরুশ্যামল লালগোলার উপকণ্ঠ। তৃণহরিৎ প্রান্তর। এখানে ওখানে থই থই করছে জল। সূর্য অস্তাচলে। সন্ধ্যা আসন্ন। শুনেছি 'স্নাইপ' বা কাদাখোঁচা পাখী শিকার করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু সেই প্রায়ান্ধকারেই ধীরেন্দ্রনারায়ণ উপরি-উপরি বন্দুক ছুঁড়ে স্নাইপদের মাটির উপরে পেড়ে ফেললেন, একবারও তাঁর লক্ষ্য ব্যর্থ হ'ল না।

ধীরেন্দ্রনারায়ণের বন্ধুত্বলাভ, আমার জীবনের একটি স্মরণীয় আনন্দ।

চৌত্রিশ

উদয়শঙ্করের আত্মপ্রকাশ

শিষ্ট বাঙালীরা মিষ্ট লাগলেও নৃত্যকে ভদ্র কাজ ব'লে মনে করতেন না। রঙ্গালয়ে "আলিবাবা", "আলাদীন" ও "আবুহোসেন" প্রভৃতি নৃত্যগীতপ্রধান পালার জনপ্রিয়তা দেখে বেশ বোঝা যায়, নাচ দেখতে তাঁরা ভালোবাসতেন। মড অ্যালান ও আনা পাবলোভা প্রভৃতি নর্তকীরা কলকাতায় এসে বাঙালীদের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন প্রভূত অভিনন্দন। ভদ্রসমাজে তরফাওয়ালীদেরও কম কদর ছিল না। কিন্তু শিক্ষিত সমাজের ছেলেমেয়েরা যে নাচবেন বা নাচ শিখবেন, এটা ছিল আগে স্বপ্নেরও অগোচর। যদিও শিশুবয়সে আমরা সকলেই নৃত্য করেছি, কিন্তু তার কারণ হচ্ছে সহজাত প্রবৃত্তি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ প্রবৃত্তিকে আমরা দমন ক'রে ফেলতুম পরম সাবধানে।

তখন মেয়েদের মধ্যে নাচ ছিল পতিতাদের নিজস্ব। থিয়েটারের মধ্যে যে দুই-চারজন পুরুষ নৃত্যচর্চা করতেন, তাঁরা ছিলেন "বখাটে" ব'লে কুবিখ্যাত। রাস্তায় রাস্তায় নিম্নশ্রেণীর পুরুষরা গান গেয়ে নেচে বেড়াত, কিন্তু সে সব ছিল সঙের নাচ। সাত-আট বৎসর বয়সে এই রকম সঙের নাচে আমি সর্বপ্রথমে পুরুষ নাচিয়েকে দেখি। নাচের গানটির প্রথম কলিটি আজও আমার মনে আছে ঃ

"বাংলাদেশের রংলা মুলুক
আমরা এনেছি।"

তখনকার থিয়েটারেও পুরুষদের নাচ ছিল অধিকাংশ স্থলেই সঙের নাচেরই মত। পথে পথে পুরুষদের আর একরকম নাচ দেখা যেত। বাউল নাচ।

মধ্যযুগের বাংলাদেশে পুরুষদের মধ্যে উচ্চাঙ্গের নৃত্য প্রবর্তন ক'রেছিলেন স্বয়ং চৈতন্যদেব। তাঁর জীবনী পাঠ করলেই বুঝতে

বিলম্ব হয় না যে তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ নর্তক। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন পুরুষদের উচ্চশ্রেণীর নৃত্য বোধ করি এদেশে কোনকালেই প্রচলিত ছিল না। গত শতাব্দীতে রামকৃষ্ণদেবও নৃত্য করতেন বটে, কিন্তু তারও মধ্যে ছিল ধর্মভাবের উন্মাদনা।

কিন্তু এদেশে যখন আর কোন শিক্ষিত পুরুষ নাচের নূপুর পরেননি, তখনও আমি সম্ভ্রান্ত সমাজে দুইজন পুরুষের নাচ দেখবার সুযোগ পেয়েছি। প্রথমে নাচতে দেখেছিলুম স্বর্গীয় শিল্পী ও নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সহচর যতীন্দ্রনাথ বসুকে। তারপর দেখেছিলুম রবীন্দ্রনাথকে, "ফাল্গুনী" নাটকের অন্ধ বাউলের ভূমিকায়।

সাতাশ কি আটাশ বৎসর আগেকার কথা। রবীন্দ্রনাথ তখন বাংলা নৃত্যকলাকে জাতে তোলবার চেষ্টা করছেন এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে শান্তিনিকেতনের কোন কোন তরুণী নাচের ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন কোন কোন নাট্যাভিনয়ে। শিক্ষিত সমাজের বাঙালী ছেলেরা তখনও নাচের ডাকে সাড়া দেননি। সাড়া দেবেন কি, সাড়া দিতেও ভয় পেতেন। নিজে নাচা তো দূরের কথা, যবনিকার অন্তরালে থেকে সাহিত্যিক হয়েও শিশির-সম্প্রদায়ের জন্যে আমি কয়েকটি নৃত্য পরিকল্পনা করেছিলুম ব'লে একাধিক পত্রিকার দ্বারা বার বার তীব্র ও নোংরা ভাষায় আক্রান্ত হয়েছিলুম।

এমনি সময়ে একদিন ভারতবিখ্যাত প্রমোদ-পরিবেশক স্বর্গীয় হরেন ঘোষ, একটি চারুদর্শন তরুণ যুবককে নিয়ে আমার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'লেন।

হরেন বললেন, "দাদা, এ'র নাম উদয়শঙ্কর। ইনি য়ুরোপ-আমেরিকায় আনা পাবলোভার নৃত্যসঙ্গী হয়ে নেচে এসেছেন। এখানেও ইনি নাচতে চান, কিন্তু কোথাও পাত্তা পাচ্ছেন না। কি উপায় করা যায় বলুন তো?"

অবাক হয়ে উদয়শঙ্করের দিকে তাকালুম। সুশ্রী মুখ, সুগঠিত দেহ—নাচের পক্ষে আদর্শ চেহারা বটে। আর পাবলোভার বিশ্ব-বিখ্যাত সম্প্রদায়ে যিনি স্থান পেয়েছেন, তাঁর নৃত্যনিপুণতা সম্বন্ধে

কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। কিন্তু বাংলাদেশে পুরুষের নাচ শিক্ষিতদের আসরে জমবে কি?

বললুম, "হরেন, এঁকে একেবারে জনসাধারণের সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করানো সমীচীন হবে না। তোমরা আগে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের কাছে যাও। আমার বিশ্বাস, তিনি কোন একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবেন।"

আমার বিশ্বাস ভ্রান্ত হ'ল না। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার পর স্থির হ'ল, তিনি প্রাচ্য-কলা-সংসদের প্রকাণ্ড হলঘরটি উদয়শঙ্করের নাচের জন্যে ছেড়ে দেবেন এবং নাচের দিনে আমন্ত্রণ করা হবে কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের।

ইতিমধ্যে য়ুরোপের বিভিন্ন পত্রিকায় উদয়শঙ্করের নাচের সমালোচনা পাঠ করে তাঁর সাফল্য সম্বন্ধে আমার মনে আর কোন সন্দেহ রইল না। প্যারিসের La Grifie বলেছেঃ "ছন্দ হচ্ছে এই সুন্দর নর্তকের অঙ্গবিশেষের মত, ছন্দহিল্লোলে তিনি পরিপূর্ণ; তাঁর পিত্তলবর্ণ দেহের সমস্ত মাংসপেশী তাঁরই বশীভূত।" বার্লিনের Tempo বলেছেঃ "এক উপভোগ্য অলৌকিক ব্যাপার! দেবতারা ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন এবং যেসব গতির দ্বারা নিজেদের চিত্তকে ব্যক্ত করেছেন, তার সঙ্গে কেবল ফুল ও দেবযানীর তুলনা চলতে পারে।" ভিয়েনার Neuess Wiener Tageblatt বলেছেঃ "উদয়শঙ্করের মূর্তি হচ্ছে যৌবনের মূর্তি—পাতলা, দেহ হিসাবে নিখুঁত এবং সেই সঙ্গে ভালো ইস্পাতের মত নমনশীল। তাঁর সকল গতিই নমনীয় লীলায় সুন্দর। তাঁর নৃত্যচিত্রগুলি গভীর রেখায় চমৎকার।"

উদয়শঙ্কর কোন সম্প্রদায় নিয়ে কলকাতায় আসেন নি। এমন কি তাঁর প্রধান নৃত্যসঙ্গিনী সিমকীও তখন ছিলেন য়ুরোপে। সুতরাং একক নৃত্য ছাড়া আর কিছু দেখাবার উপায় তাঁর ছিল না। তার উপরেও ছিল আর এক মস্ত অসুবিধা। নাচের সঙ্গে চাই বাজনার সঙ্গত। ঐকতানের ব্যবস্থা হবে কেমন ক'রে?

হাতে সময় নেই, ঐকতানের ব্যবস্থা হ'ল না। কোনরকমে সে অভাব পূরণ করবার জন্যে গ্রেপ্তার ক'রে আনা হ'ল স্বর্গীয় কুমার গোপিকারমণ রায়ের বিদ্যাবতী, কলাবতী ও রূপবতী কন্যা (তিনিও

ছিলেন নৃত্যগীতপটীয়সী) স্বর্গীয়া গৌরী দেবীকে। নাচের সঙ্গে তিনি বাজাবেন পিয়ানো।

১৩৩৭ খৃষ্টাব্দের আষাঢ় মাসের তেইশে তারিখে প্রাচ্য-কলা-সংসদের হলঘরটি বিশিষ্ট ও বিদগ্ধ স্ত্রীপুরুষের জনতায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল। সকলেরই মুখে আগ্রহ ও কৌতূহলের চিহ্ন। তাঁরা থিয়েটারে পুরুষদের সঙের নাচ দেখেছেন, তার সঙ্গে এ নাচের পার্থক্য হবে কি-রকম?

না আছে রঙ্গমঞ্চ, না আছে ঐকতান, না আছে নৃত্যসঙ্গী এবং না আছে আলোকপাতের ব্যবস্থা। কিন্তু একটিমাত্র পিয়ানোর তালে তালে একটিমাত্র শিল্পী সেদিন আসর রাখলেন যে বিচিত্র কৌশলে, সকলেরই কাছে তা ছিল ধারণাতীত। সেইদিনই বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল, নৃত্য হচ্ছে একটি স্বাধীন আর্ট, তা দৃশ্যপট, আলোকপাত বা ঐকতানের মুখাপেক্ষা করে না। রুসীয় ব্যালের দেখাদেখি আজকাল য়ুরোপীয় নৃত্যেও দৃশ্যপট এবং ঐকতান প্রভৃতির বাড়াবাড়ি হয়েছে বটে, কিন্তু রুসীয় নৃত্যনাট্যসম্প্রদায় যাঁরা গঠন করেছিলেন. তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল একাধারে তিনটি আর্টের (নৃত্য, সঙ্গীত ও চিত্র) সম্মিলন দেখানো।

কলকাতায় তখনও কেউ মণিপুরী ও কথাকলি প্রভৃতি নাচ দেখে নি। উত্তর-ভারতীয় পুরুষদের কথক নাচ দেখবার সুযোগ কারুর কারুর হয়েছিল বটে, কিন্তু নানা কারণে তা শিক্ষিত বাঙালীদের আকৃষ্ট করত না। কথক নাচে উচ্চতর পরিকল্পনা ও ভঙ্গি-বৈচিত্র্য নেই, তার মধ্যে যথেষ্ট কাব্যরস ও নাটকীয় ক্রিয়ার অভাব এবং তা আধুনিক যুগের উপযোগীও নয়।

কথক নাচে যা ছিল না, তাই পাওয়া গেল উদয়শঙ্করের নাচে। জটিল তবলার বোলের সঙ্গে প্রাণপণে নূপুরের ধ্বনি মেলাবার জন্যে তিনি গলদঘর্ম হবার চেষ্টা করলেন না, অবলীলাক্রমে ধারাবাহিকভাবে নূপুর-গুঞ্জনের ছন্দে ছন্দে গতিশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা নয়নাভিরাম ভঙ্গির রেখায় রেখায় প্রকাশ ক'রে গেলেন সুপরিকল্পিত নৃত্যনাট্যের কাহিনী। যেমন অপূর্ব তাঁর নমনীয় দেহ, তেমনি আশ্চর্য তাঁর লীলায়িত বাহু—কাঁধ থেকে আঙুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত

বইতে থাকে যেন অপরূপ রূপের তরঙ্গ, এমন বাহু নাচের আসরে আর কখনো দেখা যায় নি।

সেদিন তিনি দেখিয়েছিলেন ইন্দ্র নৃত্য, গন্ধর্ব নৃত্য ও তাণ্ডব নৃত্য প্রভৃতি। সকলের চোখের সামনে তারাও এনে দিলে অভাবিত বিস্ময়। মনে হ'ল যেন অজন্তা ও ইলোরার চিত্র ও ভাস্কর্যের ভিতর থেকে জীবনলাভ ক'রে আত্মপ্রকাশ করছে পৌরাণিক যুগের দেবতাদের মূর্তিগুলি।

উদয়শঙ্কর যখন নৃত্যশিল্পীরূপে এদেশে পদার্পণ করেন নি, তখনই আমি মৎসম্পাদিত "নাচঘর" পত্রিকায় (২৬ বৈশাখ, ১৩৩১) বলেছিলুমঃ "পাশ্চাত্য দেশে গ্রীস, রোম ও মিশরের প্রাচীন মন্দিরাদিতে ক্ষোদিত ভাস্কর্য দেখে পুরাতন নাচের ভঙ্গিগুলিকে আবার বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে। আমাদের দেশেও তো উপাদানের অভাব নেই, তবে সে চেষ্টা হয় না কেন? আমাদের হাতের কাছে কেবল উৎকলের মন্দিরগাত্রের মূর্তিগুলি দেখলেই যে কতরকম চমৎকার নাচের ভঙ্গি পাওয়া যায়, তা আর বলবার নয়। যদি কোন নৃত্যশিক্ষক রঙ্গালয়ে সেই সব ভঙ্গি কাজে লাগাতে পারেন, তবে দুদিনেই তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠবেন। * * * * আসল কথা আমাদের রঙ্গালয়ের নৃত্যশিক্ষকদের শিক্ষাই এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। রঙ্গালয়ে কার্য গ্রহণ করবার আগে তাঁদের উচিত, ভারতের নানা প্রদেশে গিয়ে নানা ভঙ্গির নৃত্যপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করা। প্রাচীন মন্দিরাদির ভাস্কর্য থেকেও সাহায্য গ্রহণ না করলে চলবে না।"

আমাদের কথা পরিণত হয়েছিল অরণ্যে রোদনে। পরে "সীতা" নাট্যাভিনয়ের সময়ে আমরা নিজেরাই ঐ পদ্ধতিতে নৃত্য পরিকল্পনা করবার সুযোগ পাই। আমার রচিত "মঞ্জুল মঞ্জরী নব সাজে" গানের সঙ্গে যে নাচটি ছিল, তা পরিকল্পিত হয় অজন্তা ও ইলোরার চিত্রে ও ভাস্কর্যে লিখিত মূর্তির বিশেষ ভঙ্গিমা অবলম্বন ক'রে। বাংলা নাচে এদিক দিয়ে সেই হয়েছিল প্রথম প্রচেষ্টা।

এই নূতন পদ্ধতিতে আধুনিক ভারতীয় নৃত্য পরিকল্পনার

সময়ে উদয়শঙ্করের সামনে ছিল কার আদর্শ? তিনি বেশ কিছুকাল ধ'রে আনা পাবলোভার নৃত্য-সম্প্রদায়ে কাজ ক'রেছিলেন। পাবলোভা যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন এখানকার প্রাচীন মন্দির-শিল্পের দিকে অত্যন্ত আকৃষ্ট হন। এবং তারই ফলে তাঁর "অজন্তার ফ্রেস্কো" প্রভৃতি ভারতীয় নৃত্যের জন্ম। আমার অনুমান সত্য কি না জানি না, তবে হয়তো পাবলোভারই প্রভাব পড়েছিল উদয়শঙ্করের পরিকল্পনার উপরে।

উদয়শঙ্করের দৃশ্যসঙ্গীত

উদয়শঙ্কর প্রথম যেদিন আমার সঙ্গে আলাপ করতে আসেন সেদিন তাঁর মুখেই শুনেছিলুম, য়ুরোপে থাকতে একাধিক ভারতীয় রাজা-মহারাজা তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, স্বদেশে ফিরে এলে তাঁরা তাঁকে সাহায্য করতে ত্রুটি করবেন না।

কিন্তু কাজে পরিণত হয়নি তাঁদের মুখের কথা। স্বদেশে প্রত্যাগমন ক'রে উদয়শঙ্কর কোন রাজা-মহারাজাকেই লাভ করেননি পৃষ্ঠপোষকরূপে। কিন্তু কাঞ্চনকৌলীন্যগর্বিত খেতাবী ধনিকের পরিবর্তে যে মনস্বী শিল্পাচার্য এই তরুণ শিল্পীর সহায়করূপে এগিয়ে এলেন, তথাকথিত কোন রাজা-মহারাজার সাহায্যই তার চেয়ে ফলদায়ী হ'ত না। প্রাচ্যকলা-সংসদে প্রথম দিন যাঁরা আমন্ত্রিত হয়ে নাচ দেখতে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সাহিত্যে, ললিত-কলায় ও সংস্কৃতির জন্যে বিখ্যাত বহু ব্যক্তি। তাঁরা সকলেই উদয়-শঙ্করের অভাবিত নৃত্য-নৈপুণ্য দেখে যখন একবাক্যে মৌখিক অভিনন্দন দান করলেন, তখনই ভবিষ্যতের জন্যে আমাদের মনে রইল না আর অণুমাত্র সন্দেহ।

বাংলার প্রথম ও প্রধান 'ইম্প্রেসারিও' হরেন ঘোষও তখন ভরসায় বুক বেঁধে মাসখানেক পরে নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে উদয়শঙ্করের নাচ দেখাবার ব্যবস্থা করলেন। সেবারেও উদয়শঙ্কর একা এবং তিনি উচিতমত ঐকতানের সাহায্যও পেলেন না। মিঃ ফ্লাঙ্গোপোলোর নেতৃত্বে যে বিলাতী অর্কেষ্ট্রা বেজেছিল, তা আহত করেছিল ভারতীয় নৃত্যের ছন্দকে। কেবল একটি নাচে শোনা গিয়েছিল শ্রীতিমিরবরণের দেশীয় ঐকতান এবং সেইজন্যেই তার সার্থকতাও হয়েছিল নিখুঁত।

প্রেক্ষাগৃহে দেখলুম বৃহতী জনতা এবং শুনলুম টিকিট না পেয়ে ফিরে গিয়েছেও শত শত লোক। বুঝলুম প্রাচ্যকলা-সংসদে অনুষ্ঠিত অপূর্ব নৃত্য-প্রদর্শনীর খ্যাতি এর মধ্যেই সহরের দিকে

দিকে ছড়িয়ে পড়েছে; নইলে বাংলা দেশের অনভ্যস্ত দর্শকরা একটিমাত্র অপরিচিত পুরুষ-নর্তকের নাচ দেখবার জন্যে কখনোই এমন বিপুল আগ্রহ প্রকাশ করত না।

এবং একাই সকলকে অভিভূত করলেন উদয়শঙ্কর। প্রথমেই তিনি "technique and rhythm of the body-movements"—দেখিয়ে দর্শকদের চমৎকৃত ক'রে দিলেন। সকলে অবাক্ হয়ে দেখলেন, ভালো নাচতে হ'লে দেহের ও মাংসপেশীর উপরে নর্তকের কতখানি প্রভুত্ব থাকা দরকার! তাঁর আঙুলের, বাহুর, গ্রীবার ও কটিদেশের নমনীয়তা অত্যন্ত বিস্ময়কর—না দেখলে বিশ্বাস করাই অসম্ভব। ইচ্ছা করলেই দেহের বিশেষ কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাংস-পেশীর ভিতর দিয়ে তিনি যেন ছন্দের স্রোত প্রবাহিত করতে পারেন, অত্যন্ত অবহেলায়।

তারপর সুরু হ'ল তাঁর নাচ—কখনো ইন্দ্র সেজে, কখনো গন্ধর্ব সেজে, কখনো শিব সেজে। তিনি দেখালেন ছোরা-নাচ ও অসি-নৃত্য। আবার নারী সেজে লাস্যলীলাতেও সকলের মনকে মাতিয়ে তুললেন। সে রকম নাচ বাঙালীর চোখ তার আগে আর কখনো দেখেনি। তারপর জনসাধারণের মধ্যে উদয়শঙ্করকে দেখবার আগ্রহ এতটা বেড়ে উঠল যে, পরে আরো দুইদিন পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে নাচ দেখাবার আয়োজন করতে হ'ল।

তারপরের কথা আর বিস্তৃতভাবে বর্ণনা না করলেও চলবে। কিছুকাল পরে উদয়শঙ্কর যখন সম্প্রদায় গঠন ক'রে রীতিমত প্রস্তুত হয়ে আবার কলকাতায় আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন ভাবীকালের জন্যে ভারতীয় নৃত্যকলার আসরে নির্দিষ্ট হয়ে গেল তাঁর চিরস্থায়ী আসন। তাঁর সম্মান দেখে নৃত্যভীত বাঙালীর ছেলেরা সাহস সঞ্চয় ক'রে দলে দলে যোগ দিতে লাগল নাচের আসরে। উদয়শঙ্কর না থাকলে এটা সম্ভবপর হ'ত না। তিনি আগে পৃথিবী জয় ক'রে দেশে ফিরেছেন ব'লেই বাংলার নৃত্যকলাকে এত সহজে জাতীয় ক'রে তুলতে পেরেছেন।

তাঁর আর্ট ঠুনকো নয়। নাচকে আগে এখানে সাধারণতঃ লঘু বা চটুল ব'লেই মনে করা হ'ত। উদয়শঙ্কর কিন্তু একাধিক

স্মরণীয় নৃত্যনাট্য রচনা ক'রে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন, জীবনের গুরুতর সমস্যাগুলিও নাচের ছন্দের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলা যায় এবং প্রকাশ করা যায় একটা সমগ্র জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা। সে সব আসরে হাল্কা মন নিয়ে হাজির হ'লে দর্শকদেরও হ'তে হবে উপভোগ থেকে বঞ্চিত। তাঁর এই শ্রেণীর কোন কোন নাচে দেখা যায় রুসীয় 'ব্যালে'র অল্পবিস্তর প্রভাব। কিন্তু এটা নিন্দনীয় নয়। আর্টের ক্ষেত্রে এমন লেনদেনের প্রথা চিরকালই প্রচলিত আছে। বাংলা সাহিত্যের সর্বত্রই দেখা যায় য়ুরোপীয় প্রভাব। কিন্তু সেজন্যে বাংলার সাহিত্য হয়ে ওঠেনি য়ুরোপের সাহিত্য। পাশ্চাত্য চিত্রকলার উপরে পড়েছে জাপানী, মিসরীয়—এমন কি অসভ্য কাফ্রীদেরও শিল্পের প্রভাব। তবু পাশ্চাত্য আর্ট হারিয়ে ফেলেনি নিজের জাত।

উদয়শঙ্করের জনপ্রিয়তার মূলে আছে আরো কোন কোন কারণ। তিনি দেশ-বিদেশের নাচের সঙ্গে সুপরিচিত হবার জন্যে ব্যয় করেছেন বহু সময়, বহু পরিশ্রম। নিজে 'ক্লাসিকাল' নৃত্য যে জানেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যাচার্য শঙ্করম নম্বুদিরির কাছে গিয়ে মুদ্রাপ্রধান "কথাকলি" নাচও শিক্ষা করেছেন। য়ুরোপে বাস ক'রে ও রুস-নৃত্যসম্প্রদায়ে যোগ দিয়ে তিনি যে য়ুরোপীয় নাচের বিশেষত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন, এটুকুও অনুমান করা যায় অনায়াসে। কিন্তু কোন বিশেষ পদ্ধতিই তাঁর সক্রিয় মস্তিষ্ক ও স্বকীয় পরিকল্পনাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতে পারেনি। যখনই দরকার মনে করেছেন তখনই তিনি যেখান থেকে খুসি তিল তিল সৌন্দর্য আহরণ ক'রে গ'ড়ে তুলতে চেয়েছেন আপন পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পূর্ণ নূতন এক তিলোত্তমাকে।

নৃত্যপ্রধান চলচ্চিত্র "কল্পনা" দেখিয়ে তিনি তাঁর মুন্সীয়ানার আর এক পরিচয় দিয়েছেন। এই ছবিতে তিনি দেখাতে চেয়েছেন শিল্পীর উদ্ভট কল্পনাবিলাস, ইংরেজীতে যাকে বলে "ফ্যাণ্টাসি"। ও বস্তুটির প্রকৃত অর্থ এদেশের অনেকেই জানে না, তাই ছবিখানির আখ্যানভাগের আসল মর্ম হয়তো অনেকের কাছেই স্পষ্ট হয়ে

ওঠেনি। কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যে ও ললিতকলায় আছে "ফ্যাণ্টাসি"র বহু স্মরণীয় উদাহরণ। "কল্পনা"কে একাধারে "ফ্যাণ্টাসি" ও "ডকুমেণ্টারি" ছবির শ্রেষ্ঠ উদাহরণরূপে গ্রহণ করা যায়, কারণ তার মধ্যে আছে আজব কল্পনার খেলার সঙ্গে ভারতীয় নৃত্যের অজস্র নমুনা। ধরতে গেলে প্রধানতঃ নানা শ্রেণীর নাচ দেখাবার জন্যেই কল্পনাকে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে পটভূমিকার মত। ছবিখানি কেবল এদেশেই নয়, পৃথিবীর নানা দেশের সমালোচকদের কাছ থেকে প্রশস্তি অর্জন করতে পেরেছে।

উদয়শঙ্করকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, চিত্রপরিচালনার অভিজ্ঞতা আপনি কোথা থেকে সঞ্চয় করলেন? উত্তরে তিনি এদেশের অধিকাংশ হাম-বড়া চিত্রপরিচালকের মত ফাঁকা বুলির ঝুলি না ঝেড়ে, নিজের স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের সঙ্গে অম্লানবদনে বলেছিলেন, "চিত্রপরিচালনার কোন অভিজ্ঞতাই আমার ছিল না।"

তবু ছবি হিসাবে কল্পনা এমন উতরে গেল কেন? তথাকথিত বাঙালী পরিচালকদের মত উদয়শঙ্করও পাশ্চাত্য ছবির বাজার থেকে পরিকল্পনা সংগ্রহ করেননি বা ব্যক্তিগত বদখেয়াল মেটাবার জন্যে যা খুশি তাই দেখাতে চাননি। একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনাকে পরিপূর্ণ ক'রে তোলবার জন্যে তিনি স্বাধীনভাবেই মস্তিষ্ক চালনা করেছেন এবং এমন নিপুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন নিজের সহজ বুদ্ধিকে যে কোথাও হয়নি আধিক্যেতা বা ছন্দপাত।

নাচের আসরে তিনি প্রমাণিত করেছেন আর একটি সত্য। এদেশী নৃত্যধুরন্ধররা যখন প্রাচীন বা প্রাদেশিক নানা শ্রেণীর নাচ নিয়ে খুব খানিকটা ধোঁয়াভরা বড় বড় কথার ফানুস ওড়াতে ও তর্কাতর্কি করতে নিযুক্ত ছিলেন, উদয়শঙ্কর তখন মানুষের সত্যকার হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করবার জন্যে লোক-নৃত্যের সাহায্যে রচনা করতে লাগলেন দৃশ্যকাব্যের পর দৃশ্যকাব্য। নাচের ওস্তাদরা যে সব লোকনৃত্যের আভিজাত্য স্বীকার করতে নারাজ, উদয়শঙ্করের নৃত্য-প্রতিভায় সেইগুলিই হয়ে উঠেছে বিদগ্ধজনের উপযোগী, বেগবান, বলিষ্ঠ ও বিচিত্র জীবনের উৎস এবং রূপে, রসে, বর্ণে ও দৃশ্যসঙ্গীতে অনুপম। কে বলতে পারে এই লোকনৃত্যের গতি ও

ছন্দের ভিতর থেকেই আত্মপ্রকাশ করবে না ভবিষ্যতের ভারতীয় প্রধান নৃত্য?

কিন্তু দক্ষিণ ভারতের একাধিক নৃত্যবাচস্পতি বাঙালী উদয়-শঙ্করের প্রতিভাকে স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। শিল্প-সমালোচক শ্রীভেঙ্কটাচলমের মতে, "কথাকলি ও ভারত-নাট্যমের শিল্পীদের কাছে উদয়শঙ্কর হচ্ছেন শিক্ষার্থী ও সৌখীন (নভিস অ্যান্ড এমেচার) মাত্র।"

যিনি বাল্যকাল থেকে একান্তভাবে নৃত্যসাধনা ক'রে আজ অর্ধ-শতাব্দী পার হয়ে এসেছেন এবং যিনি ভারতের এবং য়ুরোপ-আমেরিকার দেশে দেশে লাভ করেছেন অতুলনীয় অভিনন্দন, তিনিই নাকি "শিক্ষার্থী ও সৌখীন"! এর চেয়ে অতিবাদ শোনা যায় না।

কিন্তু কেন? উদয়শঙ্করের আর্ট জটিল, দুর্বোধ ও কষ্টসাধ্য নয় ব'লে? আমরা এতদিন জানতুম, যে আর্ট নিজের কৃত্রিমতা ও জটিলতা গোপন ক'রে সহজ, স্বাভাবিক ও সুবোধ্য হয়ে উঠতে পারে, তাকেই যথার্থভাবে বলা চলে উচ্চশ্রেণীর। প্যাঁচালো কায়দা দেখিয়ে গলদ্‌ঘর্ম হওয়াই প্রকৃত শিল্পীর লক্ষণ নয়। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃত্যগুরুর কাছে উদয়শঙ্কর কথাকলি নৃত্য শিক্ষা করেছেন, কিন্তু কথাকলির অতিরিক্ত মুদ্রাপ্রাধান্যকে আমল দিয়ে নিজের আর্টের বা নাচের সরলতা ক্ষুণ্ণ করতে চান নি। বর্তমান যুগে যিনি মধ্য যুগের ফতোয়া প্রতি পদে মাথা পেতে মেনে নেবেন, তাঁর মনীষা ও সার্থকতা আমি স্বীকার করতে নারাজ।

হরেন ঘোষ ও উদয়শঙ্করের আমন্ত্রণে একটি ঘরোয়া বৈঠকে অতুলনীয়া নর্তকী বালাসরস্বতীর নাচ দেখবার সুযোগ পেয়ে-ছিলুম। সেই জটিল নাচে শ্রীমতীর অপূর্ব কৃতিত্ব দেখে বিস্মিত হলুম। কেবল কি তাই? ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে সেই বহুশ্রমসাধ্য কঠিন ও প্যাঁচালো নাচে তিনি একাই যে শক্তি জাহির করলেন, তা অভাবিত বললেও অত্যুক্তি হবে না।

উদয়শঙ্কর আমার পাশেই বসেছিলেন। তিনি নিজের স্বভাব-সিদ্ধ বিনয় প্রকাশ ক'রে বললেন, "দাদা, চেষ্টা করলেও আমি একা এতক্ষণ ধ'রে এমন কঠিন নাচ নাচতে পারতুম না।"

তিনি যে চেষ্টা করলে পারতেন না, এ কথা বিশ্বাস করি না। কিন্তু তিনি সে চেষ্টা করেন নি ব'লে ভগবানকে ধন্যবাদ দি। কারণ সে চেষ্টায় সফলতা অর্জন করে তিনি প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকলার অন্যতম প্রধান শিল্পী ব'লে পরিচিত হ'লেও যুগান্তকারী প্রতিভাধর স্রষ্টা ব'লে স্বীকৃত এবং সার্বজাগতিক আসরে নেমে এমনভাবে অভিনন্দিত হ'তে পারতেন না।

সহধর্মিণীরূপেও তিনি নির্বাচন করেছেন আর এক অনুপম নৃত্যশিল্পীকে—শ্রীমতী অমলা দেবী। এমন অপূর্ব মিলন দেখা যায় না, রাজযোটকও বলা চলে।

এক নাচের আসরে উদয়শঙ্করকে বলেছিলুম, "অমলা দেবীকে সহনর্তকীরূপে পাবার পর থেকে আপনার সম্প্রদায়ে বিশেষভাবে হাসির আবির্ভাব হয়েছে।"

অমলা দেবী হাসতে হাসতে বললেন, "তাতে কোন দোষ হয়েছে কি?"

আমি বললুম, নিশ্চয়ই নয়! আগেও এ দলের মেয়েরা নাচতেন যথেষ্ট, কিন্তু তাঁদের হাসি ছিল না পর্যাপ্ত।"

নৃত্য যেখানে আনন্দের উচ্ছ্বাস, মন চায় সেখানে হাসির শোভন প্রাচুর্য।

পঁয়ত্রিশ

চন্দ্রাবতী

বেশ কিছুকাল আগেকার কথা। সুকিয়া ষ্ট্রীট অঞ্চলের একটি গলিতে এক সাহিত্যিক বন্ধুর বাড়ীতে ব'সে গল্প করছিলুম। হঠাৎ সামনের বাড়ীতে দেখলুম দুটি সুন্দরী তরুণীকে। বন্ধুর কাছে মেয়ে দুটির পরিচয় জানতে চাইলুম।

বন্ধু বললেন, "বড়টির নাম কঙ্কাবতী, ছোটটির নাম চন্দ্রাবতী। মেয়ে দুটি কেবল রূপসী নয়, বিদুষীও।"

তার কিছুকাল পরে কঙ্কাবতীর দেখা পেলুম "নাট্যমন্দিরে"। তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'ল। দেখলুম, এম-এ পড়তে পড়তে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর জ্ঞানার্জনের স্পৃহা কিছুমাত্র কমে নি। অবসর পেলেই ইংরেজী ও বাংলা নানা শ্রেণীর পুস্তক নিয়ে নিযুক্ত হয়ে থাকেন।

কঙ্কাবতী অল্পদিনের মধ্যেই অভিনেত্রী ও সুগায়িকা ব'লে নাট্যজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত চন্দ্রাবতী থেকে যান লোকের চোখের আড়ালে, তাঁর মধ্যেও যে উপ্ত আছে নাট্যবীজ, কেউ করতে পারে নি এ সন্দেহ। বৃথাই নষ্ট করেছেন তিনি জীবনের কয়েকটি মূল্যবান বৎসর।

রাধা ফিল্ম "দক্ষযজ্ঞ" ছবি তুলেছেন কত বৎসর আগে? ঠিক মনে পড়ছে না, উনিশ-কুড়ি বৎসর হবে হয়তো। আমার উপরে পড়েছিল গান রচনার, চিত্রনাট্য পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধনের এবং নৃত্যে পরিকল্পনার ভার। দৃশ্য-সংস্থাপককেও সাহায্য করেছিলুম অল্পবিস্তর।

চন্দ্রাবতী নির্বাচিত হ'লেন সতীর ভূমিকার জন্যে। স্টুডিয়োয় তাঁর সঙ্গে প্রথম মৌখিক আলাপ হ'ল। বেশ ধীর, স্থির, শান্ত, নম্র মেয়েটি। মহলা দেখে বুঝলুম, তাঁর মধ্যে আছে যথেষ্ট সম্ভাবনা। গানের গলাও ভালো।

মেয়েদের নাচ শেখাতে শুরু করেছি, এমন সময়ে চন্দ্রাবতী বললেন, "হেমেন্দ্রবাবু, সতী কি নাচতে পারেন?"

—"কেন পারবেন না?"

—"তাহ'লে আমিও নাচতে চাই।"

—"বেশ তো, সে ব্যবস্থাও হবে।"

কিন্তু সে যাত্রা চন্দ্রাবতীকেও নাচতে হয় নি, আমাকেও নৃত্য পরিকল্পনা সুরু ক'রেই ক্ষান্ত হ'তে হয়েছিল। কারণ বলি।

তার আগে চন্দ্রাবতী কোন দিন নাচেন নি। কিন্তু সেজন্যে ছিল না আমার কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা। কারণ একাধিক নৃত্যে অনভিজ্ঞা তরুণীকে অল্পদিনের ভিতরেই আমি নাচে পোক্ত (অন্ততঃ কাজ চালাবার উপযোগী) ক'রে তুলতে পেরেছি। কিন্তু গোল বাধল অন্য কারণে।

আমার পরিল্পনা অনুসারে চন্দ্রাবতী নাচ অভ্যাস করলেন দুই কি তিন দিন। তার পরেই বেঁকে ব'সে বললেন, "ও নাচ-টাচ আমার দ্বারা হবে না।"

আমি বললুম, "ব্যাপার কি?"

চন্দ্রাবতী বললেন, "নাচলে যে গায়ে এত ব্যথা হয়, আমি তা জানতুম না। উঃ, আমার সর্বাঙ্গ ফোড়ার মত টাটিয়ে উঠেছে। বাবা, আমার আর নাচ শিখে কাজ নেই।"

চন্দ্রাবতী পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন, আমাকেও দিতে হ'ল অন্য কারণে।

প্রাচীন ভাস্কর্য থেকে আদর্শ সংগ্রহ ক'রে আমি সতীর কবরীর জন্যে করেছিলুম একটি বিশেষ পরিকল্পনা। কিন্তু স্টুডিয়োর বেশকার সে রকম কেশবিন্যাসে অভ্যস্ত ছিল না, সে চেষ্টা ক'রেও শেষটা নিজের অক্ষমতা জানাতে বাধ্য হ'ল। অগত্যা আমাকেই উপস্থিত থাকতে হ'ল সাজঘরে এবং আমার ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে বেশকার অবশেষে বহুক্ষণের পর সেই বিশেষ ধরণের কবরীটি রচনা করতে পারলে। সে ধাঁজে খোঁপা বেঁধে চন্দ্রাবতীকে দেখাচ্ছিল চমৎকার।

ছবি তোলার সময়ে 'সেটে' গিয়ে দেখি, সতীর মাথায় ঘোমটা, আমাদের এত যত্নশ্রমে বাঁধা কবরী অদৃশ্য!

বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "সতীর মাথায় কাপড় কেন?"

স্টুডিয়োর অধ্যক্ষ মুরুব্বির মত বললেন, "হিন্দুর মেয়ে, মাথায় ঘোমটা থাকবে না?"

আমি বললুম, "সতী হচ্ছেন হিমালয়কন্যা, সেখানকার মেয়েরা আজও মাথায় ঘোমটা দেয় না।"

ভদ্রলোক তবু নিজের গোঁ ছাড়তে নারাজ। তাঁর অজ্ঞতা দেখে আমারও মেজাজ গেল বিগড়ে। তৎক্ষণাৎ স্টুডিয়ো ছেড়ে চ'লে এলুম। আর ওদিক মাড়াই নি।

"দক্ষযজ্ঞ" পালাটি অত্যন্ত লোকপ্রিয় হয়ে ছবির মালিকের ঘরে আনলে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা এবং সেই সময় থেকেই চিত্রাভিনেত্রী-রূপে চন্দ্রাবতীর আসন হয়ে গেল সুপ্রতিষ্ঠিত।

কিছুকাল পরে আবার চন্দ্রাবতীর সংস্রবে আসতে হ'ল। এক ভদ্রলোক খুব ফলাও ক'রে নূতন একটি চিত্রপ্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলবেন ব'লে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে প্রকাণ্ড এক বাগান ভাড়া নিয়ে বসলেন, আজ পর্যন্ত আর কোন চিত্র-সম্প্রদায় অত বড় বাগান বা জমির অধিকারী হ'তে পারেন নি। স্টুডিয়ো নির্মাণের কাজও সুরু হয়ে গেল। ছবির জন্যে নির্বাচিত হ'ল মৎপ্রণীত "ঝড়ের যাত্রী" উপন্যাস। চন্দ্রাবতীকে দেওয়া হ'ল নায়িকার ভূমিকা এবং পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন শ্রীহেমচন্দ্র চন্দ্র। একে একে অন্যান্য শিল্পীরাও নির্বাচিত হ'তে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা স্বর্গীয় রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়ও। আমরা প্রায়ই সবাই মিলে সেখানে গিয়ে করতুম প্রভূত জল্পনা-কল্পনা। নিমন্ত্রিতদের এনে ভূরিভোজনের ব্যবস্থাও যে হয় নি, এমন মনে ক'রবেন না। কিন্তু গর্জন হ'ল বিস্তর, বর্ষণ হ'ল সামান্য। মালিক ছিলেন ভিতর-ফোঁপরা, দুদিনেই কাবু হয়ে পড়লেন। নিজস্ব স্টুডিয়ো নির্মাণের কাজ বন্ধ হ'য়ে গেল। শেষ পর্যন্ত অরোরা ফিল্ম স্টুডিয়োতে ছবি তোলা হ'তে লাগল বটে, কিন্তু ছবির কাজ শেষ হবার আগেই মালিক হ'লেন একেবারে ফতুর। সেই অসমাপ্ত ছবিখানি আজও অরোরা ফিল্মের গুদামঘরে বন্দী হয়ে আছে। "অরোরা"র স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় বন্ধুবর অনাদিনাথ

বসু আমাকে ছবিখানার জন্যে একটা ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন, কিন্তু কোন ব্যবস্থাই হয় নি। তাকে আজ আর কেউ কাজে লাগাতেও পারবেন না। কারণ নায়িকার ভূমিকায় চন্দ্রাবতীকে আর নামানো চলবে না, আজকের চন্দ্রাবতীর সঙ্গে আগেকার চন্দ্রাবতীর দৈহিক পার্থক্য আছে যথেষ্ট। অন্যান্য নট-নটীদের সম্বন্ধেও ঐ কথা। কেউ কেউ গিয়েছেন পরলোকে। ছবি শেষ করতে হ'লে প্রেততত্ত্ববিদদের সাহায্যে তাঁদের পরলোক থেকে টেনে আনতে হয়।

প্রসঙ্গক্রমে ব'লে রাখি, "ঝড়ের যাত্রী"র দুর্ভাগ্য ঐখানেই ফুরিয়ে যায় নি। আর একজন প্রয়োজক নূতন নূতন নট-নটীর সাহায্যে আবার ঐ উপন্যাসখানির চিত্ররূপ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যাঁর অর্থানুকূল্যে ছবি তোলবার কথা, কয়েক হাজার টাকা উড়ে যাবার পর তাঁরও মন থেকে ছবি তৈরি করবার উৎসাহ উপে যায় কর্পূরের মত।

তারপর চন্দ্রাবতী দেখা দিয়েছেন ছবির পর ছবিতে, সেগুলির সংখ্যার হিসাব রাখি নি। কখনো নবীনা এবং কখনো প্রবীণার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তাঁর প্রত্যেক ভূমিকা দেখবার অবসর আমার হয়নি বটে, কিন্তু যতগুলি দেখেছি তার উপরে নির্ভর ক'রেই চন্দ্রাবতীর কলানৈপুণ্য সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করতে পেরেছি। তিনি সুন্দরী। কিন্তু কি সাধারণ রঙ্গালয়ে আর কি চিত্রজগতে কেবল দৈহিক সৌন্দর্যকে কোন দিনই অভিনয়ের মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করা হয় নি। সুগঠিত তনু, সুশ্রী চেহারা ও মিষ্ট মুখ নিয়ে বহু তরুণীই পাদপ্রদীপের আলোকে বা ছবির পর্দায় দেখা দিয়েছেন, কিন্তু দর্শকদের চোখ ভুলিয়েও তাঁরা তাদের মনের উপর কিছুমাত্র রেখাপাত করতে পারেন নি। বিশ্ব-বিখ্যাত ফরাসী অভিনেত্রী সারা বার্ণার্ড এবং এ দেশের তারাসুন্দরী ও সুশীলাবালা সুন্দরী ছিলেন না মোটেই। পাশ্চাত্য দেশের খ্যাতনামা চিত্রতারকাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা কুরূপা না হ'লেও সুরূপা নন। তবে অভিনেত্রীরা যদি হন একসঙ্গে রূপসুন্দর ও গুণসুন্দর, তাহ'লে বেশী তাড়াতাড়ি তাঁরা প্রভাব বিস্তার করতে পারেন দর্শকদের হৃদয়ের উপরে। এ শ্রেণীর

অভিনেত্রী সুলভ নন। চন্দ্রাবতী হচ্ছেন এই শ্রেণীর অভিনেত্রী। ভাবের অভিব্যক্তি দেখাবার বিস্ময়কর দক্ষতা অর্জন করেছেন তিনি। দিনে দিনে উন্নত হয়ে উঠেছে তাঁর কলানৈপুণ্য। বাংলা দেশের চিত্রাভিনেত্রীদের মধ্যে তাঁকে অতুলনীয়া বললেও অত্যুক্তি করা হবে না।

আমার নিজস্ব একটি মত আছে। এর সঙ্গে সকলেরই ঐকমত হবে, এমন আশা করি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনয়ের চেয়ে চিত্রাভিনয় উচ্চশ্রেণীর নয় এবং তার প্রধান কারণ হচ্ছে, ছবির অভিনয়ে নেই সেই ধারাবাহিকতা, যার প্রসাদে আর্ট হ'য়ে ওঠে পূর্ণাঙ্গ। রঙ্গালয়ের অভিনয়কলা প্রথমে মুকুলিত হয়ে তারপর ধীরে ধীরে পাপড়ি ছড়িয়ে একটি গোটা ফুল হয়ে ফুটে ওঠে অবশেষে। নিজেদের আর্টের সূচনা থেকে ধারাবাহিকভাবে চরম পরিণতি দেখাবার ভার গ্রহণ করতে হয় মঞ্চাভিনেতাদের, তার মধ্যে আকস্মিকতা বা খাপছাড়া কোন কিছুই থাকতে পারে না।

কিন্তু চিত্রাভিনেতাদের কর্তব্য হচ্ছে অন্যরকম। আদ্য-মধ্য-অন্ত নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না তাঁদের। গোড়াতেই তাঁরা হয়তো করেন শেষদিককার অভিনয়, আবার প্রথম অংশ দেখান হয়তো একেবারে সর্বশেষে এবং সবটাই তাঁদের দেখাতে হয় টুকরো টুকরো ক'রে। হঠাৎ হাসবার বা কাঁদবার বা চলবার-ফেরবার নির্দেশ পেলে তাঁরা হাসেন বা কাঁদেন বা চলেন-ফেরেন। নিজেদের স্বাভাবিক ভাবের আবেগে বা অনুভূতি অনুসারে তাঁরা বেশী কিছু করতে পারেন না। অভিনেতাদের পক্ষে ছবির অভিনয় অনেকটা যেন পরের মুখে ঝাল খাওয়ার মত। তাঁরা যেন পরিচালকের হাতে কলের পুতুল। দর্শকরা ছবির মধ্যে যে ধারাবাহিকতার রস পায়, তার ভালো-মন্দ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে কেবল পরিচালকের ও সম্পাদকের কৃতিত্বের উপরে। চিত্রাভিনয়ের ভুলত্রুটি শিল্পীরা অনায়াসে সুধরে নিতে পারেন, খারাপ অংশ বাতিল ক'রে দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার বা যতবার খুসি ছবি তোলা যায়, নটনটীদের ভুলচুক দর্শকদের চোখে পড়ে না, এ সুবিধা মঞ্চাভিনেতার নেই। এমনি সব নানা কারণে নিছক চিত্রনটরা মঞ্চের উপরে গিয়ে দাঁড়ালে

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদের অত্যন্ত অসহায় ব'লে মনে করেন এবং অনেকেই হয়তো অভিনয়ই করতে পারবেন না।

আমার বিশ্বাস, চন্দ্রাবতী এই শ্রেণীর অভিনেত্রী নন, মঞ্চে নামলেও দিতে পারবেন নিজের গুণের পরিচয়। এবং এই ধারণা পোষণ করতেন অধুনালুপ্ত "নাট্যভারতী"র সুযোগ্য কর্ণধার, বন্ধুবর শ্রীশিশিরকুমার মল্লিকও। শিশিরবাবু একদিন আমাকে একখানি নাটক লেখবার জন্যে অনুরোধ ক'রে বললেন, প্রধান ভূমিকায় তিনি হয়তো চন্দ্রাবতীকে নামাতে পারবেন। শুনে আমি উৎসাহিত হয়ে একখানি গীতিবহুল নাটক রচনা করেছিলুম, নাম তার "চোখের জল।" কিন্তু আমার চিত্রে রূপায়িত উপন্যাসের নায়িকার ভূমিকার মত আমার নাটকের নায়িকার ভূমিকাতেও মঞ্চের উপরে তাঁকে দেখবার সুযোগ আর হ'ল না। "নাট্যভারতী" ভালোভাবেই চলছিল। কিন্তু বাড়ীর মালিক রঙ্গালয়টিকে চিত্রগৃহে পরিণত করবেন ব'লে চলতি "নাট্যভারতী"র অস্তিত্ব হ'ল বিলুপ্ত, সেখানে আর আমার রচিত পালা খোলাও সম্ভব হ'ল না। সেই অনভিনীত নাটকের পাণ্ডুলিপি শিশিরবাবুর কাছেই গচ্ছিত আছে। আমার হয়েছে পণ্ডশ্রম।

ব্যক্তিগত জীবনে চন্দ্রাবতী আমার কন্যার মত। আমার বাড়ীতে এসেছেন বহুবার। তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ ক'রে আনন্দ পেয়েছি, উপভোগ্য তাঁর আচরণ। আগে পূর্ণিমার চাঁদনি রাতে মাঝে মাঝে তিনি আমার কাছে আসতেন, গঙ্গাজলে জ্যোৎস্নার খেলা দেখবার জন্যে। তাঁকে নিয়ে ত্রিতলের ছাদে গিয়ে বসতুম, তিনি খুসি কণ্ঠে বলতেন, "কি চমৎকার জায়গায় আপনার বাড়ী!"

আমি বলতুম, "চন্দ্রা, গান শোনাও।"

চন্দ্রাবতী গাইতেন—

"সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে
ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা।"

তটিনীর কলতানের সঙ্গে চন্দ্রাবতীর কলকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের কাব্যবাণী শুনতে শুনতে তাকিয়ে থাকতুম গঙ্গার বুকে উচ্ছলিত চন্দ্রাবলীর দিকে।

ছত্রিশ

নজরুলের জন্মদিন স্মরণে

স্নেহাস্পদ নজরুল ইসলাম চুয়াম্নো বৎসরে পা দিয়েছেন। কিন্তু বহু বৎসর আগেই রুদ্ধ হয়েছে তাঁর সাহিত্যজীবনের গতি। কবির পক্ষে এর চেয়ে চরম দুর্ভাগ্য আর কিছু নেই। জীবন্ত তরু, কিন্তু ফলন্ত নয়।

আর একটা বড় দুঃখের কথা হচ্ছে এইঃ নজরুলের লেখনী আর কবিতা প্রসব করে না বটে, কিন্তু তিনি যে কবি, এ বোধশক্তি আজও হারিয়ে ফেলেন নি। এবারের জন্মদিনে কোন ভক্ত তাঁর স্বাক্ষর প্রার্থনা করেছিলেন। নজরুল তাঁর খাতায় এই ব'লে নাম সই করেন—"চিরকবি কাজী নজরুল ইসলাম"। এই স্বাক্ষরের আড়ালে আছে যাতনার ইতিহাস।

শিল্পীর পক্ষে এই অবস্থা অত্যন্ত মর্মন্তুদ। অতুলনীয় চিত্র-শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পক্ষাঘাত রোগের আক্রমণে তাঁরও হয়েছিল এই অবস্থা। ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে আচার্য অবনীন্দ্র-নাথ ঠাকুরও সৃষ্টি করার কাজ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে সেটা ছিল অতিশয় পীড়াদায়ক। একদিন তাঁর ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাসভবনে দ্বিতলের প্রশস্ত অলিন্দে ব'সে আছি এবং তিনিও তাঁর কারুকাজ করা আসনে আসীন হয়ে নীরবে রোগযন্ত্রণা সহ্য করছেন। হঠাৎ আমার দিকে কাতর দৃষ্টি তুলে অবনীন্দ্রনাথ মৃদু, ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললেন, "বড় কষ্ট, হেমেন্দ্র। আঁকতে চাই, আঁকতে পারি না; লিখতে চাই, লিখতে পারি না।"

একদিন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। সেই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। তাঁর এবং অন্যান্য সকলেরই অজ্ঞাতসারে কালব্যাধি তখনই তাঁর দেহের মধ্যে শিকড় বিস্তার

করেছিল। ভিতরে ভিতরে কি সর্বনাশের আয়োজন হচ্ছে, তিনি সেটা ঠিক উপলব্ধি করতে না পারলেও, তখনই শুকিয়ে গিয়েছিল তাঁর রচনার উৎস। সেই সময়ে আমি ছিলুম এক পত্রিকার ("দীপালী") সম্পাদক। নিজের কাগজের জন্যে শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে একটি রচনা প্রার্থনা করলুম। আমি নিশ্চিতরূপেই জানতুম, আমার আরজি মঞ্জুর হবে, কারণ তিনি আমাকে যথেষ্ট ভালোবাসতেন। আগেও তাঁর কাছ থেকে লেখা চেয়েছি এবং পেয়েছি। কিন্তু সেবারে আমার প্রার্থনা শুনে অত্যন্ত করুণ স্বরে তিনি বললেন, "ভাই হেমেন্দ্র, বিশ্বাস কর, আমি আর লিখতে পারি না। লিখতে বসলেই মাথার ভিতরে বিষম যাতনা হয়। কলম ছেড়ে উঠে পড়ি।" তাঁর চক্ষের ও কণ্ঠের আর্ত ভাব এখনো আমি ভুলি নি। তারপর সত্য সত্যই শরৎচন্দ্র আর কোন নতুন রচনায় হাত দেন নি।

এখানে ফ্রান্সের অমর ঔপন্যাসিক আলেকজাণ্ডার ডুমার কথাও মনে হয়। শেষ বয়সেও তাঁর মনের মধ্যে রচনার জন্যে প্রেরণার অভাব ছিল না, তিনি রোজ টেবিলের ধারে গিয়ে বসতেন। তাঁর হাতে থাকত কলম এবং সামনে থাকত কাগজ। কেটে যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিন্তু তিনি আর লিখতে পারতেন না। তাঁর তখনকার মনের যাতনা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ কল্পনা করতে পারবে না।

নজরুলের মন বোধ হয় এখন এইরকমই শোকাবিষ্ট হয়েছে। নিজেকে যখন "চিরকবি" ব'লে স্বাক্ষর করছেন, তখন মনে মনে এখনো তিনি নিশ্চয়ই বাস করছেন কাব্য-জগতে। কিন্তু নিজে যা দেখছেন, বা বুঝছেন, ভাষায় তা প্রকাশ করতে পারছেন না। এ যেন মূকের স্বপ্নদর্শন। যা দেখা যায়, তা বলা যায় না। বলতে সাধ হ'লেও বলা যায় না।

পত্রান্তরে নজরুল সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছি। কিন্তু তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে আরো কোন কোন কথা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

নজরুল যখন প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পণ করেন, তখন

এখানে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কবিরা সমুদিত ও সুপরিচিত হয়েছেন। আরো দুই-একজন তখন উদীয়মান অবস্থায়। রবীন্দ্রনাথের লেখনী তখনও অশ্রান্ত। আমাদের কাব্যজগতে সেটা ছিল সুভিক্ষের যুগ। কবিতার কোন অভাবই কেউ অনুভব করে নি।

কিন্তু যুগধর্ম প্রকাশ করতে পারেন, দেশ যে এমন কোন নূতন কবিকে চায়, নজরুলের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই সত্য উপলব্ধি করতে পারলে সকলেই।

এদেশে এমনিই তো হয়ে আসছে বরাবর। যুগে যুগে আমরা পুরাতন ও পরিচিতদের নিয়েই মেতে থাকতে চেয়েছি, অর্বাচীনদের উপরে কোন আস্থা না রেখেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালী গদ্যলেখকরা যে উৎকট ভাষা ব্যবহার করতেন, তা ছিল পুরোমাত্রায় সংস্কৃতের গোলাম। আমরা তারই মধ্যে পেতুম উপভোগের খোরাক, সৌন্দর্যের সন্ধান। হঠাৎ টেকচাঁদ ঠাকুর ও হুতোম আবির্ভূত হয়ে যখন আমাদের ঘরের পানে তাকাতে বললেন, তখন আমরা একটু অবাক হয়েছিলুম বটে, কিন্তু তাঁদের ক'রে রেখেছিলুম কোণঠাসা। সাহিত্যের দরবারে কথ্য ভাষাকে কায়েমী করবার জন্যে পরে দরকার হয়েছিল প্রমথ চৌধুরীর শক্তি ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা। যখন বঙ্কিমচন্দ্র "দুর্গেশনন্দিনী" ও মাইকেল মধুসূদন "মেঘনাদবধ" নিয়ে আসরে প্রবেশ করেন, তখনও কেউ তাঁদের প্রত্যাশা করে নি।

উপরোক্ত যুগান্তকারী লেখকগণের সঙ্গে নজরুলের তুলনা করা চলে না বটে, কিন্তু বহু কবিদের দ্বারা অধ্যুষিত বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি যে এনেছিলেন একটি নূতন সুর, সে কথা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। বিংশ শতাব্দীর তরুণদের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন প্রথম কবি, রবীন্দ্রনাথের যশোমণ্ডলের মধ্যে থেকেও যিনি খুঁজে পেয়েছেন স্বকীয় রচনাভঙ্গি ও দৃষ্টিভঙ্গি।

প্রথম মহাযুদ্ধে নজরুল 'ইউনিফর্ম' প'রে সৈনিকের ব্রত গ্রহণ

করেছিলেন। পরে 'ইউনিফর্ম' খুলে ফেললেও কাব্যজগতেও প্রবেশ করেছিলেন সৈনিকের ব্রত নিয়েই। দুর্গত দেশবাসীদের শাক্তের গান শুনিয়ে তিনি দুদিনেই জাগ্রত ক'রে তুললেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেও গ্রহণ করলেন একটি নাতিক্ষুদ্র অংশ। রাজরোষ তাঁকে ক্ষমা করলে না, তাঁর স্থাননির্দেশ করলে বন্দী-শালায়। কিন্তু তবু দমিত হ'ল না তাঁর বিদ্রোহ।

কিন্তু তাঁর এ বিদ্রোহ কেবল দেশের রক্তশোষক শাসক জাতির বিরুদ্ধে নয়, এ বিদ্রোহ হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিরোধের বিরুদ্ধে, ছুতমার্গগামী সমাজপতিদের বিরুদ্ধে, বৈড়ালব্রতী ভন্ডদলের বিরুদ্ধে—এককথায় সকল শ্রেণীর অনাচারী দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে।

নজরুল যখন সবে কবিতা লিখতে সুরু করেছেন, তখনই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। নিত্য আমাদেরই বৈঠক ছিল তাঁর হাঁফ ছাড়বার জায়গা। সেই সময়েই তাঁর গুটিকয় কবিতা প'ড়ে তাঁকে ভালো কবি ব'লে চিনতে পেরেছিলুম। তারপরই তিনি আমাকে রীতিমত বিস্মিত ক'রে তুললেন।

সাপ্তাহিক "বিজলী" পত্রিকা আমার কাছে আসত নিয়মিতরূপে, তার জন্যে আমি রচনা করেছি উপন্যাস, কবিতা ও গান প্রভৃতি। হঠাৎ এক সংখ্যার "বিজলী"তে দেখলুম, নজরুলের রচিত দীর্ঘ এক কবিতা, নাম "বিদ্রোহী"। দীর্ঘ কবিতা আমাকে সহজে আকৃষ্ট করে না। কিন্তু কৌতূহলী হয়ে সে কবিতাটি পাঠ করলুম। দীর্ঘতার জন্যে কোনখানেই তা একঘেয়ে লাগল না, সাগ্রহে প'ড়ে ফেললুম সমগ্র কবিতাটি। একেবারে অভিভূত হয়ে গেলুম। তার মধ্যে পাওয়া গেল অভিনব স্টাইল, ভাব, ছন্দ, সুর ও বর্ণনা-ভঙ্গি। এক সবল পুরুষের দৃপ্ত কণ্ঠস্বর। বুঝলুম, নজরুল আর উদীয়মান নন, সম্যকরূপে সমুদিত। দেশের লোকরাও তাই বুঝলে। সেই এক কবিতাই তাঁকে যশস্বী ক'রে তুললে সর্বত্র। সবাই বলতে লাগল তাঁকে "বিদ্রোহী কবি"।

কিন্তু নজরুল কেবল শক্তির দীপক নয়, শুনিয়েছেন অনেক সুকুমার প্রেমের গানও। কখনো ধ্রুপদ ধরেন, কখনো ধরেন ঠুংরী।

কখনো তূরী-ভেরী, কখনো বেণু-বীণা। বাজিয়েছেন পাখোয়াজ, বাজিয়েছেন তবলাও। তিনি একজন গোটা কবি।

নজরুলের মুখেই শুনেছি, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক যে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন, বাল্যকালে তিনিও সেখানে পাঠ করতেন। কিন্তু তিনি বোধ হয় বিদ্যালয়ে বেশী বিদ্যালাভ করেন নি, নিজেকে শিক্ষিত ও মানুষ ক'রে তুলেছেন বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের বাইরে বৃহৎ বিচিত্র পৃথিবীর রাজপথে গিয়ে। একসময়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে তিনি নাকি মফঃস্বলের কোন চায়ের না রুটির দোকানে "বয়" বা ছোকরার কাজ করতেও বাকি রাখেন নি। পাশ্চাত্য দেশে শোনা যায়, প্রথম জীবনে চাকরের কাজ ক'রে পরে কীর্তিমান হয়েছেন অনেক কবি, অনেক লেখক। কিন্তু চায়ের বা রুটির দোকানের ছোকরা পরে দেশপ্রসিদ্ধ কবি হয়ে দাঁড়িয়েছেন, বাংলা দেশে এমন দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আছে ব'লে জানি না।

আগে আমার বাড়ীতে নিয়মিতভাবে গানের বৈঠক বসত। তার উদ্বোধন করেন নজরুলই। এক একদিন তিনি আমার কাছে আসতেন, আর বাড়ী ফেরবার নাম পর্যন্ত মুখে আনতেন না। একদিন যেত, দু' দিন যেত, তিন দিন যেত, নজরুল নিজের স্ত্রী-পুত্রের কথা বেবাক ভুলে আমার কাছে প'ড়ে আছেন গান আর হারমোনিয়াম আর পান আর চায়ের পেয়ালা নিয়ে। স্নান, আহার, নিদ্রা সব আমার সঙ্গেই। আমার বাড়ীর পরিবেশ হয়ে উঠত গানে গানে গানময়। অক্লান্ত ধারাবাহিক গানের স্রোত। ঠুংরী, গজল, রবীন্দ্রনাথের গান, অতুলপ্রসাদের গান, মেঠো কবির গান, নিজের গান।

তখনকার নজরুলকে স্মরণ ক'রে কিছুদিন আগে এই কবিতাটি রচনা করেছিলুমঃ—

"নজরুল ভাই, রোজই বাজে
মনের মাঝে স্মৃতির সুর,
সেই অতীতের তোমার স্মৃতি!
—আজকে থেকে অনেক দূর।
যৌবনেরি শ্যামল স্মৃতি

এই জীবনে অমূল্য।
বন্ধু, তাহার বিনিময়ে
চাইনা আমি কোহিনূর।

দরাজ প্রাণের কবি তুমি,
হস্তে ছিল রুদ্রবীণ,
আকাশ-বাতাস উঠত দুলে
বক্ষে তোমার রাত্রি-দিন।
যেথায় যেতে ছড়িয়ে যেতে
মুক্ত প্রাণের হাস্যকে,
আপন ক'রে নিতে তাকেও,
তোমার কাছে যে অচিন।

দিনের পরে দিন গিয়েছে,
রাতের পরে আবার রাত,
চাঁদের আলোয় ভাসত যখন
আমার বাড়ীর খোলা ছাত,
তাকিয়ে গঙ্গা নদীর প্যানে
গানের পরে ধরতে গান—
মুগ্ধ হয়ে নিতাম টেনে
আমার কোলে তোমার হাত।

হায় দুনিয়ায় যে দিন ফুরায়,
যায় না পাওয়া আর তাকে।
বসন্ত আর গাইবে নাকো,
উঠলে আঁধি বৈশাখে।
তাইতো ঘরে একলা ব'সে
বাজাই স্মৃতির গ্রামোফোন—
আবার কাছে আসে তখন
দূর অতীতে যে থাকে।

নজরুলের কাছ থেকে বরাবর আমি অগ্রজের মত শ্রদ্ধালাভ ক'রে এসেছি। তিনি আমাকে ভালোবাসতেন। আমার ছোট ছেলে প্রদ্যোত (ডাকনাম গাবলু) কবে অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিল। তার খাতায় তিনি এই শ্লোকটি লিখে দিয়েছিলেন ঃ—

"তোমার বাবার বাবা হও তুমি
কবি-খ্যাতিতে যশে,
তব পিতা সম হও নিরুপম
আনন্দ-ঘন রসে।
স্নেহের গাবলু! অপূর্ণ যাহা
রহিল মোদের মাঝে,
তোমার বীণার তন্ত্রীতে যেন
পূর্ণ হয়ে তা বাজে।
শুভার্থী—কাজীকা"

নজরুলের অনেক কথা প্রবন্ধান্তরে বলেছি, এখানে পুনরুল্লেখের দরকার নেই। যখন আমার বাড়ীর বৈঠকের কথা বলব, তখন অন্যান্য নামী গাইয়েদের সঙ্গে মাঝে মাঝে নজরুলেরও দেখা পাওয়া যাবে।

সাঁইত্রিশ

ঘরোয়া গানের সভা

নিজের স্মৃতি-মঞ্জুষার সঞ্চয়ই আমার অবলম্বন। কাজেই মাঝে মাঝে নিজের কথা না ব'লেও উপায় নেই। এবারেও নিজের প্রসঙ্গ নিয়েই লেখা সুরু করব।

আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব রাধিকানাথ রায় নিজেকে পণ্ডিতজন মনে না করলেও ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যে ছিলেন লব্ধপ্রবেশ। তাঁর রচনাশক্তিও ছিল। কখনো প্রকাশ করতেন না বটে, কিন্তু দার্শনিক প্রবন্ধ রচনা করতেন এবং সেগুলি সুলিখিত। তাঁর খুব একটি ভালো অভ্যাস ছিল। তিনি ধার ক'রে বই পড়তেন না, কিনে পড়তেন। ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখকগণের গ্রন্থাবলী ছিল তাঁর সংগ্রহশালায়। সাহিত্য সাধনার প্রেরণা লাভ করেছি আমি আমার পিতৃদেবের কাছ থেকেই।

পিতৃদেবই আমার মনে বপন করেছেন সঙ্গীতের বীজ। তিনি নিজে যন্ত্রসঙ্গীতে ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। অনেকরকম বাজনা বাজাতে পারতেন—বিশেষ ক'রে ফ্লুট ও এসরাজ বাদনে তাঁর নাম-ডাক ছিল যথেষ্ট। এখনো চোখের সামনে দেখি, বাবা এসরাজ বাজাচ্ছেন, আর তাঁর দুই পাশে দাঁড়িয়ে আমার দুই ভগ্নী সমস্বরে গান গাইছে। এ ছিল প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আমার জ্যেষ্ঠ-তাতপুত্র স্বর্গত সতীশচন্দ্র রায় ছিলেন গতযুগের একজন বিখ্যাত গায়ক। গ্রামোফোনের রেকর্ডেও তাঁর কয়েকটি গান তোলা আছে। সতীশদাদাকে নিয়ে বাবা প্রায়ই গান-বাজনার আয়োজন করতেন এবং নিজে বাজাতেন কোনদিন তবলা ও কোনদিন এসরাজ। গভীর রাত্রি পর্যন্ত গান-বাজনা চলত এবং আসরে থাকত না তিল-ধারণের ঠাঁই। সেইসঙ্গে মাঝে মাঝে অন্যান্য গায়করাও আসরের

শোভাবর্ধন করতেন। বাল্যকাল থেকে এই পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়ে আমারও মনের ভিতরে গেঁথে গিয়েছিল গানের শিকড়।

আমার বয়স যখন বছর পনেরো, তখন গ্রামোফোনের মাধ্যমে স্বর্গীয় গায়ক লালচাঁদ বড়ালের নাম ফিরছে বাংলার ঘরে-বাইরে লোকের মুখে মুখে। তাঁর বসতবাড়ী ছিল প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটে। একদিন সাহস সঞ্চয় ক'রে তাঁর কাছে গিয়ে ধরনা দিলুম। সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতলে উঠে দেখলুম, একটি ঘরের দরজার সামনে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। সৌম্য মুখ, দোহারা চেহারা, সাজ-পোশাক বেশ ফিটফাট।

তিনি সুধোলেন, "কি দরকার বাবা?"

বললুম, "আজ্ঞে, আপনার কাছে গান শিখতে চাই।"

লালচাঁদবাবু স্মিতমুখে জানালেন, তিনি গুরুগিরি করেন না।

তারপর গেলুম তখনকার আর একজন প্রথম শ্রেণীর গায়ক স্বর্গীয় মহিম মুখোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি স্বর্গীয় রাধিকা গোস্বামীর অন্যতম প্রধান শিষ্য। তাঁর গানের গলাও ছিল সুমধুর। তিনি আগে শুনতে চাইলেন আমার কণ্ঠস্বর। তারপর শুনে বললেন, "বেশ, আমি তোমাকে গান শেখাব।"

ব্রজদুলাল ষ্ট্রীটের একখানা ছোট বাড়ীতে ছিল মহিমবাবুর সঙ্গীতবিদ্যালয়। রাধিকা গোস্বামীও মাঝে মাঝে সেখানে এসে দুই-চারদিন থেকে যেতেন। গান শিখতে আসত সেখানে আরো কয়েকজন ছাত্র। তাদের সঙ্গে আমারও কিছুদিন কেটে গেল সেইখানেই।

কিন্তু বেশীদিন নয়। গান নিয়ে মেতে থাকতে থাকতেই আমার মনের মধ্যে প্রবলতর হয়ে উঠল সাহিত্যের নেশা। তানপুরা তুলে রেখে কাগজ, কলম ও দোয়াত নিয়েই আমার কেটে যেতে লাগল সারাক্ষণ। হাতমক্স করতে করতে আর গলা সাধবার সময় পেতুম না।

নিজে গায়ক হলুম না বটে, কিন্তু সঙ্গীতকে ভুলতে পারলুম না। ভালো গান শোনবার লোভে নানা আসরে গিয়ে হাজিরা দিতে লাগলুম। তখনকার দিনে জলসার ছড়াছড়ি ছিল না। রঙ্গালয়ে শোনা যেত নিম্নতর শ্রেণীর গান এবং রঙ্গালয়ের বাইরে ঘরোয়া

গানের সভা বসাতেন ধনী ব্যক্তিগণ বা সম্পন্ন গৃহস্থরা। আজ রঙ্গালয়ে গানের পাট প্রায় তুলে দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু চারিদিকেই দেখা যায় গানের অতি বাড়াবাড়ি। গ্রামোফোন আছে, সিনেমা আছে, রেডিও আছে, আর আছে বড় বড় সঙ্গীত-সম্মিলন। গান হয়ে উঠেছে সর্বসাধারণের সম্পত্তি। ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল। আগে কড়ি ফেলতেন ধনীরা এবং তেল মাখতে পেতেন কেবল তাঁরাই, সমজদার ব'লে যাঁদের আমন্ত্রণ করা হ'ত। এমন কথাও মাঝে মাঝে মনে হয়, একালে গানের আধিক্য হয়েছে যতটা, ততটা হয় নি গুণের আধিক্য। আজ স্বল্প জলেও পুঁটি মাছরা সাঁতার কাটতে পারে পরমানন্দে, কিন্তু সেকালকার গুণীদের বৈঠকে স্বল্পবিদ্যার খাতির ছিল না।

শ্রীনির্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাসভবনে তাঁর খুল্লতাত ব্যাচাবাবু মাঝে মাঝে যে মাইফেলের আয়োজন করতেন, অনায়াসেই এখনকার সঙ্গীত-সম্মিলনীর সঙ্গে তার তুলনা করা যায়। কেবল কলকাতার বড় বড় গাইয়ে নন, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পীরা আমন্ত্রিত হয়ে সেখানে যোগদান করতে আসতেন। আরো বড় বড় আসর ছিল। সঙ্গীতের প্রতি প্রভূত অনুরাগ থাকলেও একালের অধিকাংশ ব্যক্তিই সাধারণ সঙ্গীত-সম্মিলনে আসন গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ ভালো আসনগুলি এমনি অগ্নিমূল্য যে মধ্যবিত্তদের চিত্তে আগ্রহ থাকলেও বিত্তে কুলায় না। কিন্তু সেকালে সুরসিকরা ট্যাঁক গড়ের মাঠ হ'লেও বড় বড় ঘরোয়া আসরে গিয়ে আসীন হ'তে পারতেন অনায়াসেই। এবং সঙ্গীতসুধার সঙ্গে সঙ্গেই থাকত কিছু কিছু 'অধিকন্তু'। অর্থাৎ বিনামূল্যে পানের খিলি ও সিগারেট প্রভৃতি। আগেকার ধনীদের দস্তুরমত দিল ছিল। এখনকার ধনীরা একলসেঁড়ে. নিজের নিজের ফূর্তি নিয়েই মশগুল, পাঁচজনের সঙ্গে মিলে-মিশে উৎসব করার কথা তাঁদের মনেও জাগে না।

আগেকার বদান্যতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সাহিত্যগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন "বিচিত্রা বৈঠক"। সুপ্রশস্ত আসর—বৃহতী জনতারও স্থান সংকুলান হ'ত।

সেখানে থিয়েটার হ'ত, যাত্রা হ'ত, নাচ হ'ত, দেশী-বিদেশী গুণীর গান হ'ত এবং সেই সঙ্গে হ'ত কবিতা বা নাটক বা গল্প বা প্রবন্ধ পাঠ ও বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা। বৈঠকের নিজস্ব ও প্রকাণ্ড পুস্তকাগারে যে সব মহার্ঘ্য গ্রন্থ রক্ষিত ছিল, কলকাতার কোন বিখ্যাত লাইব্রেরীতেও তা পাওয়া যেত না। সভ্যরা ইচ্ছা করলেই যে কোন বই বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারতেন। 'বিচিত্রা'র সভ্য-শ্রেণী-ভুক্ত ছিলেন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি—একাধারে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র। তাঁরা ইচ্ছা করলেই মুক্তহস্তে প্রচুর টাকা চাঁদা দিতে পারতেন। আবার সভ্যদের মধ্যে আমার মত এমন অনেক লোকও ছিলেন, যাঁদের ধনগৌরব উল্লেখ্য নয় আদৌ। যিনি রাজাসনে ব'সে লক্ষ লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখেন এবং যাঁরা স্বপ্ন দেখেন ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে, তাঁদের উভয়েরই সামনে ছিল 'বিচিত্রা'র দ্বার উন্মুক্ত। তাঁরা উভয়েই লাভ করতেন সেখানে সমান অধিকার, সমান ব্যবহার, সমান আতিথেয়তা। এবং তাঁদের কারুকেই ব্যয় করতে হ'ত না একটিমাত্র সোনার টাকা বা রুপোর টাকা বা কাণাকড়ি। 'বিচিত্রা'র বহু সভ্যই আজও ইহলোকে বিদ্যমান। কিন্তু অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের আয়োজন ক'রে তাঁদের চিত্তরঞ্জন করতে পারেন, এমন কোন্ ব্যক্তিই আজ বাংলাদেশে বর্তমান নেই। এখন যাঁদের দেখছি তাঁদেরও অনেকেই ব'সে আছেন টাকার পাহাড়ের টঙে। সোনাদানার ভার বইতে পারে তো গর্দ্দভরাও, কিন্তু ললিত কলার আসরে রাসভ-সঙ্গীতের স্থান কোথায়?

গেলবারে সুকবি শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়ের কথা বলেছি। তাঁর শ্বশুর-বাড়ী শান্তিপুরে। একদিন তাঁর সঙ্গে আমরা দল বেঁধে সেখানে গিয়ে হাজির হলুম। শান্তিপুর হচ্ছে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। চৈতন্যদেবের পবিত্র পায়ের ধুলো বুকে নিয়ে শান্তিপুর পরিণত হয়েছে বৈষ্ণবদের তীর্থক্ষেত্রে। এখানে আছে তাঁর অনেক অবদান। কিন্তু সে সব কিছুর জন্যে আমরা আকৃষ্ট হইনি শান্তিপুরের দিকে। আমরা বেরিয়ে পড়েছিলুম কলকাতার বাইরে গিয়ে খানিকটা হাঁপ ছাড়বার জন্যে। রাণাঘাট থেকে পদব্রজে চূর্ণি নদীর খেয়া-ঘাটের দিকে চল্লুম। চন্দ্রপুলকিত রজনী। পথের দুইধারে বনে

বনে আলোছায়ার মিলনলীলা। চারিদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে সুর-সংযোগ করছে গানের পাখীরা। এক জায়গায় বনের আড়ালে বেজে উঠল কার বাঁশের বাঁশী। সেই নিরালায় জ্যোৎস্নার বন্যায় মুরলী-মূর্চ্ছনায় আমারও মন হয়ে উঠল সঙ্গীতময়। বাঁশীর তান তেমন মিষ্ট আর কখনো লাগে নি—বোধ করি এ স্থান-কালের গুণে। ঠিক সময়ে ঠিক সুরটি যদি প্রাণের তন্ত্রীতে এসে লাগে, তবে তা আর ভোলা যায় না।

কিন্তু সে যাত্রা আমাদের শান্তিপুরে যাওয়া সার্থক হয়েছিল আর একটি বিশেষ কারণে। শুনলুম বিখ্যাত হারমোনিয়াম বাদক (এখন স্বর্গীয়) শ্যামলাল ক্ষেত্রীর শিষ্য বীণবাবু (ভদ্রলোকের ডাক-নামটিই কেবল মনে আছে) শান্তিপুরেই বাস করেন। সন্ধ্যাবেলায় আমরা দল বেঁধে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। আমাদের দলে ছিলেন "অর্চ্চনা"র সহকারী সম্পাদক স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস চন্দ্র, প্রসিদ্ধ গল্পলেখক ও অ্যাডভোকেট এবং "অর্চ্চনা"র সম্পাদক শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, কবি শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়, সাহিত্যিক শ্রীঅমরেন্দ্র-নাথ রায় এবং আরো কেউ কেউ, সকলের নাম স্মরণে আসছে না।

কেউ ভালো হারমোনিয়াম বাজান, এটা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক কথা নয়। বড় বড় ওস্তাদরা সুনজরে দেখেন নি হারমোনিয়াম যন্ত্রটাকে। এদেশে তার আভিজাত্যও নেই, এক শতাব্দী আগেও এখানে হারমোনিয়ামের চলন ছিল না। শুনেছি এখানে তার আবির্ভাব হয় রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগ্রহে। অথচ রবীন্দ্রনাথ নিজেই পরে গানের বৈঠকে হারমোনিয়াম বর্জন করেছিলেন। আর সত্য কথা বলতে কি, এখানে হারমোনিয়ামের অবস্থা হয়ে উঠেছে বেওয়ারিস মালের মত। যে পায় তাকে নিয়ে যখন-তখন অপটু হাতে টানা-হেঁচড়া করে ব'লে পাড়ার লোকের কাছে অনেক সময়ে যন্ত্রটা হয়ে ওঠে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক।

কিন্তু যথার্থ গুণীর হাতে পড়লে ঐ যন্ত্রই যে কি মন্ত্রশক্তি প্রকাশ করতে পারে, সেদিন বীণবাবুর বাজনা শুনেই তা প্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছিলুম। নামেও বীণবাবু, তাঁর হাতের

ছোঁয়ায় হারমোনিয়ামের ভিতর থেকেও জেগে উঠল যেন কোন্ নতুন বাজনা। ছন্দে ছন্দে ইন্দ্রজালের ব্যঞ্জনা। আমাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

পরে বীণবাবুর সঙ্গে কলকাতাতেও দেখা হয়েছিল। তাঁর গুরু শ্যামলালবাবুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলুম। তিনিও আমাকে হ্যারিসন রোডে শ্যামলালবাবুর বাসায় নিয়ে গেলেন। অত্যন্ত অমায়িক প্রিয়দর্শন ভদ্রলোক, চারুকলাকে অবলম্বন ক'রে বিবাহ করতে ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর আস্তানায় এসে ভারতের সর্বশ্রেণীর খ্যাতিমান সঙ্গীতশিল্পীরা জটলা করতেন। শ্যামলালবাবুকে দেখলুম বটে, কিন্তু তাঁর বাজনা শোনবার সুযোগ আর সেদিন হ'ল না, পরেও হয় নি।

স্বর্গীয় বন্ধুবর নরেন্দ্রনাথ বসুর বাসভবনে আমাদের একটি ঘরোয়া সঙ্গীতসভা ছিল। সেখানে উচ্চশ্রেণীর গানবাজনার আয়োজন হ'ত প্রতি শনিবারেই। বাংলার বাইরে থেকেও সেরা সেরা গুণীজনকে আমন্ত্রণ ক'রে আনা হ'ত। একদিন এসেছিলেন এক অতুলনীয় শিল্পী, তাঁর নাম সোনে কি সনি বাবু, ঠিক মনে করতে পারছি না, তিনি গয়ানিবাসী ভারতবিখ্যাত হারমোনিয়াম বাদক স্বর্গীয় হনুমানপ্রসাদের পুত্র। তিনিও যা বাজালেন নামেই তা হারমোনিয়াম, কিন্তু শোনালে এমন বেণুবীণার কাকলী যে, মন আমাদের ভেসে গেল সুরের সুরধুনীর উচ্ছলিত ধারায় ধারায়। তারপর কেটে গিয়েছে কত বৎসর, কিন্তু আজও সেই অমূর্ত সুরের মায়া খেলা ক'রে বেড়ায় আমার মনের পরতে পরতে।

সাধারণ হারমোনিয়াম যে শিল্পীর সাধনায় একেবারেই অসাধারণ হয়ে ওঠে, আর একদিন তার প্রমাণ পেয়েছিলুম স্বর্গীয় সঙ্গীতাচার্য করমতুল্লা খাঁয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র রফিক খাঁয়ের বাজনা শুনে। তাও হচ্ছে অরূপ অপরূপ সুরবাহার।

বছর চারেক আগে সেরাইকেলায় গিয়ে আবার রফিক খাঁয়ের দেখা পেয়েছিলুম। তিনি তখন সেরাইকেলার রাজাসাহেবের বৈতনিক শিল্পী। সেবারে তাঁর একক বাজনা শোনবার সুযোগ পাই নি, অন্যান্য যন্ত্রীর সঙ্গে তিনি হারমোনিয়াম বাজালেন ছউ

নৃত্যের তালে তালে। ঐকতানের মধ্যে শিল্পীর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আবিষ্কার করা দুষ্কর ব্যাপার।

এই বারে আমার নিজের বাড়ীর গানের বৈঠকের কথা বলব। সেখানেও আপনারা দেখতে পাবেন আধুনিক যুগের বহু যশস্বী সংগীতশিল্পীকে।

আটত্রিশ

কুমার শচীন্দ্র দেব-বর্মণ

আমার ঘরোয়া বৈঠকের শোভাবর্ধন করেছেন বাংলাদেশের বহু কীর্তিমান গায়কই। তাঁদের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তি হচ্ছেন স্বর্গীয় ওস্তাদ জমীরুদ্দীন খাঁ, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে ও শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রভৃতি। তাঁদের কথা নিয়ে আগেই বিশেষভাবে আলোচনা করেছি ভিন্ন গ্রন্থে বা ভিন্ন প্রবন্ধে। প্রথমোক্ত দুই শিল্পী আমার বাড়ীতে এসে যে কতবার সুরস্বর্গ সৃষ্টি করেছেন, তার আর সংখ্যা হয় না। একবার সবচেয়ে দীর্ঘ গানের মাইফেল চালিয়েছিলেন জমীরুদ্দীন খাঁ সাহেব। হারমোনিয়াম নিয়ে বসলেন এক দোলপূর্ণিমার দিন দুপুরে; তারপর রাত দুপুর ছাড়িয়েও চলল তাঁর গানের অবিরাম স্রোত। একাই বারো ঘণ্টারও বেশী গান গেয়েও তিনি শ্রান্ত হয়ে পড়েন নি। জমীরুদ্দীন ছিলেন বিস্ময়কর গায়ক এবং তাঁর গানের ভাণ্ডারও ছিল অফুরন্ত। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, অত্যন্ত মদ্যপানের ফলে প্রৌঢ় বয়সেই ফুরিয়ে যায় তাঁর পৃথিবীর মেয়াদ। তাঁর পুত্র বালিও একসঙ্গে পিতার দোষ ও গুণ দুয়েরই অধিকারী হয়েছিলেন। গাইতেন চমৎকার গান এবং করতেন অতিরিক্ত সুরাপান। তাঁকেও কাঁচা বয়সেই করতে হয়েছিল মহাপ্রস্থান। গায়ক সমাজে মৈজুদ্দীন খাঁ ছিলেন ঐন্দ্রজালিকের মত। এমন আশ্চর্য ছিল তাঁর অশিক্ষিতপটুত্ব, ভারতের যে কোন প্রথম শ্রেণীর ওস্তাদের সঙ্গে তিনি পাল্লা দিতে পারতেন। তিনি ছিলেন শ্রুতিধর। একবার মাত্র শ্রবণ করলেই বড় বড় রাগ-রাগিণীকে নিজের ক'রে নিতে পারতেন। কিন্তু সুরার স্রোতে সাঁতার দিয়ে তিনিও অকালে ভেসে গিয়েছিলেন পরলোকে। নট ও গায়ক—বিশেষ ক'রে এই দুই শ্রেণীর শিল্পীর সামনেই সুরা খুলে দেয় সর্বনাশের পথ। শিল্পীর আর্টকেও করে অবনত এবং শিল্পীর

দেহকেও করে অপহৃত। অথচ রঙ্গালয়ে এবং গায়ক সমাজেই দেখা যায় সুরার অধিকতর প্রভাব।

আধুনিক বাংলাদেশের একজন অতুলনীয় গায়ক হচ্ছেন শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। প্রায় চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে ফুটবল খেলার মাঠে প্রায়ই দেখতুম একটি গেরুয়াধারী ক্রীড়াকৌতুকপ্রিয় উৎসাহী তরুণকে—মাথায় তাঁর দীর্ঘকেশ, চক্ষে তাঁর বুদ্ধির দীপ্তি। তখন তাঁর নামধাম জানতুম না, কিন্তু জনতার ভিতর থেকে আলাদা ক'রে মনের পটে লিখে রেখেছিলুম তাঁর মুখচ্ছবি। বহুকাল পরে এক গানের আসরে আবার তাঁর দেখা পেলুম গায়করূপে। তখন তিনি বয়সে অধিকতর পরিণত বটে এবং তাঁর পরণেও নেই আর গেরুয়া, কিন্তু কিছু পরিবর্তিত হ'লেও সেই পূর্বদৃষ্টমূর্তি। তাঁর গানে আর গলার কাজে মন হ'ল মুগ্ধ। নাম শুনলুম, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়।

তারপর ভীষ্মদেবের কণ্ঠে শুনেছি অনেক গান। তাঁর সঙ্গে পরিচয়ও হয়েছে। জেনেছি তিনি কেবল গীতিকার নন, একজন ভালো সুরকারও। যথাযথভাবে সুর সংযোগ ক'রে আমার কয়েকটি গানকে তিনি সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছেন। এবং সেই গানগুলি তিনি যখন কারুর গলায় তুলে দিতেন, আমিও তখন মাঝে মাঝে হাজির থাকবার লোভ সামলাতে পারতুম না। আর, কোন লোকের সঙ্গে তিনি একদিন আমার বাড়ীতেও পদার্পণ করেছিলেন। কিন্তু সে ছিল অপরাহ্নকাল, গান শোনবার সময় নয়। তিনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন, আর একদিন এসে গান শুনিয়ে যাবেন।

কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তার কিছুকাল পরেই গৃহাশ্রম এবং সঙ্গীতসাধনা ত্যাগ ক'রে ভীষ্মদেব প্রস্থান করলেন পণ্ডিচেরিতে। সুরসৃষ্টিতে ভীষ্মদেবের শক্তিমত্তা দেখে তাঁর কাছ থেকে অনেক আশাই ক'রেছিলুম। কিন্তু আমাদের সে আশায় ছাই দিয়ে তিনি অবলম্বন করলেন মৌনব্রত। ফুল ফুটতে ফুটতে হঠাৎ পণ ক'রে বসল—আর আমি ফুটব না। তার ফলে আখেরে তাঁর কি লাভ হ'ল জানি না, কিন্তু বাংলাদেশ বঞ্চিত হ'ল এক উদীয়মান সঙ্গীত-শিল্পীর পূর্ণতাপ্রাপ্ত অবদান থেকে। শিল্পীর সাধনা হচ্ছে

শিল্পের মধ্য দিয়েই, শিল্পকে ত্যাগ ক'রে নয়। এদেশেই বিশেষ ক'রে একথা খাটে। সঙ্গীতের মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ ক'রে গিয়েছেন সাধক রামপ্রসাদ। কীর্তন হচ্ছে বাংলাদেশের নিজস্ব সঙ্গীত-পদ্ধতি। চৈতন্যদেব ঐহিক সব-কিছুই ছাড়তে পেরেছিলেন, কিন্তু ছাড়তে পারেন নি কীর্তনকে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধন-মার্গেও সঙ্গীত করেছিল বিশেষ সহযোগিতা। ভারতবর্ষ সঙ্গীতের ভিতর দিয়েই লাভ করে পরমার্থ।

ভীষ্মদেব আবার অরবিন্দ-আশ্রম ছেড়ে গৃহাশ্রমে প্রত্যাগত হয়েছেন। কিন্তু তিনি যে সঙ্গীতজগতে পুনরাগমন করেছেন, এমন সংবাদ পাইনি।

আধুনিক গায়কদের মধ্যে কুমার শ্রীশচীন্দ্র দেব-বর্মণের পসার হয়েছে যথেষ্ট। তিনি আগে ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের শিষ্য, তারপর তালিম নেন ভীষ্মদেবের কাছে। ত্রিপুরার রাজবংশে তাঁর জন্ম, কিন্তু আলস্য চর্চা না ক'রে তিনি সঙ্গীতকেই করেছেন জীবনের সাধনা।

আজকাল রেকর্ড, রেডিও ও সিনেমার প্রসাদে অরসিকদের জনতার মাঝখানে এরণ্ডরাও মহামহীরুহের অভিনন্দন আদায় ক'রে নিতে পারছে। যেখানে সম্মানিত হন না সুশিক্ষিত প্রাচীন সঙ্গীত-কুশলীরা, সেখানে যশের মাল্য প'রে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কুড়োতে দেখি এই সব আনাড়ী অর্বাচীনদের। মাত্র একটি কারণেই তাঁরা পারানি না দিয়েও নদী পার হবার সুযোগ পান এবং সে কারণটি হচ্ছে, তাঁদের গলা তৈরি না হ'লেও শুনতে মধুর। আগেও এ শ্রেণীর গাইয়ের অভাব ছিল না। কিন্তু যেমন মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত, কচি ও কাঁচা মিষ্ট গলার জোরে তাঁরা বড় জোর বসবার জায়গা পেতেন আমুদে ছোকরাদের আড্ডাখানায়। বড় বড় সার্বজনীন আসরে কলকে পাবার জো ছিল না তাঁদের। কিন্তু এখন সে সব জায়গাতেও তাঁদের দেখা পাওয়া যায়।

শচীন্দ্রদেব ঐ শ্রেণীর গায়ক নন। গান ও কণ্ঠস্বর নিয়ে প্রভূত অনুশীলন করেছেন ব'লেই সাধনমার্গে তিনি নিশ্চিত পদে অগ্রসর হ'তে পেরেছেন। বড় দরদী তাঁর কণ্ঠস্বর, একটু ভাঙা

ভাঙা—কিন্তু তাইতেই বেড়ে ওঠে যেন তার মাধুর্য। উপরন্তু তাঁর আছে নিজস্ব গাইবার ভঙ্গি, গান শুনলেই গায়ককে চেনা যায়।

যতদূর মনে পড়ে, প্রায় ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসর আগে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে'র সঙ্গে সর্বপ্রথম তিনি আমার বাড়ীতে পদার্পণ করেন। একজন উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতশিল্পী ব'লে বাজারে আজ তাঁর প্রচুর খাতির, কিন্তু সেদিন তাঁর এতটা খ্যাতি ছিল না। তখন তিনি ছিলেন শিক্ষার্থী, কিন্তু শচীন্দ্রদেবের গান শুনেই আমার বুঝতে বিলম্ব হয় নি যে, ভবিষ্যৎ তাঁর সমুজ্জ্বল।

আমি ভালোবাসতুম তাঁর কণ্ঠে সুরের খেলা এবং তিনি ভালোবাসতেন আমার রচিত গানের কথা। স্বাভাবিকভাবে দু'জনেই আকৃষ্ট হলুম দু'জনের দিকে। দেখতে দেখতে সুদৃঢ় হয়ে উঠল আমাদের বন্ধুত্ববন্ধন। তারপর থেকে আমন্ত্রণে বা বিনা আমন্ত্রণেই আমার বাড়ীতে হ'তে লাগল তাঁর ঘন ঘন আবির্ভাব। এবং কিছুদিন তাঁকে দেখতে না পেলে আমিও গিয়ে উপস্থিত হতুম তাঁর কাছে।

আমার বাড়ীতে প্রায়ই বসত তাঁর গানের আসর। অন্যান্য গায়করাও থাকতেন। শচীন্দ্রদেবকে দেখলেই—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় —আমার চিত্ত পিপাসিত হয়ে উঠত গীতসুধার তরে। তিনিও সঙ্গীত ধরতেন তদ্‌গত-চিত্তে এবং নৃত্য করতে থাকত শ্রোতাদেরও চিত্তশিখী। গানে গানে সুরের টানে মন চ'লে যেত অরূপসায়রে রূপের সন্ধানে। গান অমূর্ত আর্ট বটে, কিন্তু তার ভিতরেও কি মূর্তি খুঁজে পাওয়া যায় না?

"এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর।"

গায়কের কণ্ঠ যখন সুরে সুরে এই কথাগুলি নিয়ে খেলা করে, তখন কি ঝরঝর বাদল ধারায় অভিষিক্ত নির্জন পল্লীপ্রকৃতির মাঝখানে শূন্য কোন ঘরে কান্তহীন শয্যার উপরে একাকিনী ব'সে থাকতে দেখি না এক বিরহিণী নারীকে? শিল্পীর সঙ্গীতে অরূপই হয় রূপায়িত।

সুরকাররূপেও শচীন্দ্রদেব অল্প শক্তির পরিচয় দেননি। তাঁর অধিকাংশ বাংলা সঙ্গীতে সুরসংযোগ করেছেন তিনি নিজেই।

গানের কথাকে ক্ষুণ্ণ না ক'রেও সুরকে ফুটিয়ে তোলবার নিপুণতা আছে তাঁর অসাধারণ।

"বুলবুলিকে তাড়িয়ে দিলে
ফুলবাগানের নতুন মালী"

এবং

"আজকে আমার একতারাতে,
একটি যে নাম বাজিয়ে চলি
কাজলকালো বাদল-রাতে"—

আমার এই দুটি গানে সুরসংযোগ ক'রে শচীন্দ্রদেব যেদিন আমাকে শুনিয়ে গেলেন, সেদিন তাঁর এই নূতন শক্তির পরিচয় পেয়ে আমি বিস্মিত হয়েছিলুম।

তারপর—

"ও কালো মেঘ, বলতে পারো
কোন্ দেশেতে থাকো?"

আমার এই গানটিতে সুর দিয়ে শচীন্দ্রদেব যখন হিন্দুস্থান রেকর্ডের মাধ্যমে নিজেই গেয়ে শোনালেন, তখন শ্রোতাদের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন প্রচুর সাধুবাদ। সুরের ও গাওয়ার গুণে গানটিই কেবল অতিশয় লোকপ্রিয় হয়নি, শচীন্দ্রদেবেরও নাম ফিরতে লাগল সঙ্গীতরসিকদের মুখে মুখে।

আধুনিক কাব্যগীতিতে সুরসংযোগ করবার পদ্ধতিটি শচীন্দ্রদেব দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্তে আনতে পেরেছেন। আগে বাঁধা সুরের কাঠামোর উপরে যে কোন গানকে বসিয়ে দেওয়া হ'ত। রামপ্রসাদী সুর হচ্ছে এরকম কিন্তু তা সংযোগ করা হয় রামপ্রসাদের যে কোন গানের কথার সঙ্গে এবং সে সব গান ভক্তিরসপ্রধান ব'লে শুনতে বেখাপ্পা হয় না। কিন্তু সাধারণ প্রেমের গানে সে সুর কেবল অচল হবে না, হবে রীতিমত হাস্যকর। ওস্তাদদের আমি গম্ভীর বাঁধা-সুর বসিয়ে গম্ভীরভাবে এমনি অনেক হাস্যকর গান গাইতে শুনেছি। উচ্চতর সঙ্গীতের সেকেলে আসরে কথার দৈন্যকে আমলে না এনে সুরের প্রাধান্য দেখেই সবাই ধন্য ধন্য রব ক'রে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই শ্রেণীর একটি হিন্দী গান উদাহরণরূপে উদ্ধার

করেছেন,—"কারি কারি কমরিয়া গুরুজি মোকো মোল দে—অর্থাৎ কালো কালো কম্বল গুরুজি আমাকে কিনে দে।" এমনি সব কাব্যগন্ধহীন রাবিসের সঙ্গেও ভালো ভালো সুর জুড়ে শ্রোতাদের শ্রবণবিবরে নিক্ষেপ করা হয় এবং কেউ আপত্তি তো করেই না, বরং তারিফ ক'রে নিজের রসিকতার প্রমাণ দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

উচ্চতর মনীষার জন্যে ভারতবর্ষে বাঙালীর একটা সুনাম আছে। তাই পূর্বোক্ত পদ্ধতির বিরুদ্ধে সর্বপ্রথমে বিদ্রোহ প্রকাশ করলেন বঙ্গদেশীয় সঙ্গীতশিল্পিগণ। রবীন্দ্রনাথ বললেন, "সুরের সঙ্গে কথার মিলন কেউ রোধ করতে পারবে না। ওরা পরস্পরকে চায়, সেই চাওয়ার মধ্যে যে প্রবল শক্তি আছে, সেই শক্তিতেই সৃষ্টির প্রবর্তনা।" তিনি নিজে অগ্রনেতা হয়ে সুকৌশলে মিলিয়ে দিলেন কথাকে সুরের এবং সুরকে কথার সঙ্গে। এই বিভাগে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ আরো কারুর কারুর দানকেও অসামান্য বলা চলে। এঁদের চেষ্টাতেই ভারতীয় সঙ্গীতে 'কাব্যগীতি' নামে নূতন সম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই ঐতিহ্যের অনুসরণ ক'রেই পরে স্বর্গত সুরসাগর হিমাংশু দত্ত, নজরুল ইসলাম ও শচীন্দ্রদেব প্রভৃতি সুরকারগণ বাংলা গানের আসরকে জমিয়ে তুলেছেন।

অতি-আধুনিক যুগের গায়কদের মধ্যে সর্বপ্রথমে নাম করতে হয় কুমার শচীন্দ্রদেবেরই। সঙ্গীতবিদ শ্রীদীলিপকুমার রায় লিখেছেনঃ "বাংলা গানের গড়ন আগের চেয়ে উঁচুতে উঠেছে—সঙ্গে সঙ্গে সুরবিহার কণ্ঠকৃতিত্বেও নানা স্থলেই অভাবনীয় রং-বাহারের দীপ্তিঝিলিক দেয় থেকে থেকে। একথা সব চেয়ে বেশী মনে হয় কুমার শচীন্দ্র দেববর্মণের কলকণ্ঠে কোনো কোনো বাংলা গান শুনতে শুনতে।"

কিন্তু একটা কথা ভেবে আশঙ্কা হচ্ছে। শচীন্দ্রদেবও পড়েছেন সিনেমার প্রেমে। আজ কিছুকাল যাবৎ দক্ষিণ ভারতীয় চিত্রশালার সঙ্কীর্ণ পরিবেশের মধ্যে কালযাপন করছেন, সিনেমাওয়ালাদের জন্যে যোগান দিচ্ছেন ফরমাজী মাল। সিনেমা ফেরি করে হেটো মাল এবং সঙ্গীতকলা নয় হেটো জিনিস। সিনেমার কবলে পড়লে দুর্গত হয় চারুকলা।

ঊনচল্লিশ

ঘরোয়া বৈঠকের শিল্পিগণ

এই প্রবন্ধমালায় মাঝে মাঝে এমন কারুর কারুর কথাও কিছু কিছু বলতে হচ্ছে, যাঁরা আর ইহলোকে বাস করেন না। কিন্তু এত অল্পদিন আগেই তাঁরা দেহত্যাগ করেছেন যে, মন যেন তাঁদের অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করতে রাজি হয় না। কোন মানুষই এই মানসিক দুর্বলতাকে পরিহার করতে পারে না। প্রিয়জনের মৃত্যুর পরেও কিছুদিন ধ'রে মনে হয়, যেন তাঁরা আমাদের সামনে না থাকলেও কাছাকাছি কোথাও বিদ্যমান আছেন, হয়তো এখনি তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হ'তে পারে। এমন সন্দেহ যুক্তিহীন হ'লেও স্বাভাবিক। এবং তা গভীর শোকের মধ্যেও করে কতকটা সান্ত্বনার সঞ্চার।

কিছুদিন আগে সুরসাগর হিমাংশু দত্তের মৃত্যুসংবাদ পেয়েছি, কিন্তু এখনো মনে হয় না তিনি পৃথিবী থেকে মহাপ্রস্থান করেছেন। চোখের সামনে না থাকলেও যেন তিনি শহরেরই কোন একান্তে ব'সে এখনো নূতন নূতন গানে করছেন নূতন নূতন সুরসংযোগ।

আকারে ছোটখাটো, শান্তশিষ্ট, মৃদুভাষী, সুদর্শন মানুষটি! তরুণ বয়সেই প্রবীণ শিল্পীর মত সুরসৃষ্টি করবার ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। তাঁকে মনে হ'লেই আমার স্মরণ হয় রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দৌহিত্র, সঙ্গীতকলাবিশারদ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের কথা। যৌবনসীমা পার হ'তে না হ'তেই তিনিও ধরাধাম ত্যাগ করেছেন, জনসাধারণের কাছে সুপরিচিত হবার আগেই। তবে বাংলা রঙ্গালয়ে যাঁরা "মুক্তার মুক্তি", "বসন্তলীলা" ও "সীতা" প্রভৃতি নাটক-নাটিকার গান শুনেছেন, তাঁরা সুরকার গুরুদাসের কিছু কিছু পরিচয় পেয়েছেন।

আমার রচিত উপন্যাসকে যখন কালী ফিল্মস "তরুণী" নামক চিত্রে রূপায়িত করে, তখন তার কয়েকটি গানে সুর-সংযোজনার ভার নেন হিমাংশু দত্ত। সেই সময়ে কালী ফিল্মের স্টুডিয়োতেই হিমাংশু দত্তের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তাঁর সুর দেবার শক্তি ও শিল্পীসুলভ সংলাপ আমাকে আকৃষ্ট করে। দুদিন পরেই বুঝতে পারলুম, দেশী গান সম্বন্ধে সুপণ্ডিত হয়েও তিনি গোঁড়া ওস্তাদদের মত ছুতমার্গের ধার ধারতেন না, স্বীকার করতেন আধুনিক যুগধর্ম। দরকার হ'লে উচ্চশ্রেণীর কলাবিদের মত পাশ্চাত্য সঙ্গীতের কোন কোন বিশেষত্বকে একেবারে ঘরোয়া জিনিস ক'রে নিতে পারতেন। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের মত তিনিও য়ুরোপীয় সঙ্গীতে লব্ধপ্রবেশ ছিলেন কিনা বলতে পারি না, তবে বিলাতী সুরের সঙ্গে তিনি যে সুপরিচিত ছিলেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

মাঝে মাঝে তিনি আমার বাড়ীতে এসেছেন এবং আমার অনুরোধে গানও গেয়েছেন কিন্তু মৃদুকণ্ঠে। আমার রচিত আর একখানি চিত্রনাট্যের (শ্রীরাধা) গানেও তিনি চমৎকার সুর দিয়েছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর একজন স্থায়ী সুরকারের দরকার হয়, আমি কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁরই নাম বলি। তাঁরা উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা ক'রে তাঁকে নিয়ে যান।

কিছুদিন পরে হিমাংশু দত্ত এসে বললেন, "হেমেন্দ্রবাবু, আমি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছেড়ে দিয়েছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনিবনাও হ'ল না বুঝি?"

তিনি বললেন, "না, তা নয়। বাংলা আর হিন্দী ছবির রাশি রাশি গানে খুব তাড়াতাড়ি সুর দেবার ভার পড়ত আমার উপরে। যেমন তেমন ভাবে তাড়াহুড়ো ক'রে সুর দিয়ে আমি আনন্দ পাই না। কাজেই আমার পোষালো না।"

খাঁটি শিল্পীর উক্তি—সচরাচর যা শোনা যায় না। আর্টের মস্ত শত্রু হচ্ছে, ব্যস্ততা। কিন্তু এদেশের সাধারণ রঙ্গালয়ে এবং চলচ্চিত্রশালায় ও-যুক্তি খাটে না। মার্কামারা পেশাদার না হ'লে কোন শিল্পীই সেখানে তিষ্ঠোতে পারে না। দরকার হ'লে সেখানে

দুই-এক-দিনের মধ্যেই তিন-চারটে নাচ বা গানের কাজ সেরে ফেলতে হয়। থিয়েটার বা সিনেমার কাজ যেমন তেমন ক'রে চ'লে যায় বটে, কিন্তু শিল্পী বোঝেন, তাঁর কাজ হ'ল নিম্নশ্রেণীর। পেশার খাতিরে পেটের দায়ে সাধারণ শিল্পীরা এ বিষয় নিয়ে উচ্চবাচ্য করেন না, কিন্তু হিমাংশু দত্ত ছিলেন অসাধারণ শিল্পী।

নজরুল ইসলামের বেলায় দেখেছি এর ব্যত্যয়। তিনি যে অসাধারণ শিল্পী সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু তাঁর মনে গানের কথার সঙ্গে সুর আসত জোয়ারের মত। কতদিন দেখেছি, রীতিমত জনতা ও হরেক রকম বেসুরো গোলমালের মধ্যে অম্লানবদনে ব'সে তিনি রচনা ক'রে যাচ্ছেন গানের পর গান। দেখে অবাক্ হতুম, কারণ আমি নিজে তা পারি না। নির্জন জায়গা না পেলে আমার কলমই সরে না!

আর কেবলই কি গান? সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত অনায়াসে সুর রচনা করতেন নজরুল। প্রথম প্রথম মনে করতুম, চলতি সব বাঁধা সুরের সঙ্গেই তিনি নিজের গানের কথাগুলি গেঁথে নিতেন। এমন বিশ্বাসের কারণও ছিল।

একদিন মেগাফোন রেকর্ডের কার্যালয়ে ব'সে আছি, একজন তরুণী মুসলমান গায়িকার কণ্ঠ-পরীক্ষা হচ্ছে। তিনি একটি উর্দু গান গাইলেন, শুনে সচকিত হয়ে উঠলুম। সে গানের সুরের সঙ্গে নজরুলের "মোর ঘুমঘোরে এলে প্রিয়তম" নামে বিখ্যাত গানটির সুর অবিকল মিলে গেল। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম, উর্দু গানটি নূতন নয়। বোঝা গেল, নিজের গানের সঙ্গে নজরুল উর্দু গানটির সুর হুবহু চালিয়ে দিয়েছেন। এ কাজ তিনি কেবল একলাই করেননি, বাংলাদেশের আরো বহু বিখ্যাত গীতিকারই উর্দু বা হিন্দী গানের সুর ধার ক'রে বাংলা গান শুনিয়েছেন। এমন কি রবীন্দ্রনাথেরও প্রথম দিকের কোন কোন গানে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতে পারে।

গোড়ার দিকে নজরুলও হয়তো তাই করতেন। কিন্তু তারপর নিয়মিতভাবে সঙ্গীত অনুশীলনের ফলে তাঁর কণ্ঠ হয়েছিল স্বাধীন সুরের প্রস্রবণের মত। তখন তিনি আর পরের ধনে

পোদ্দারি করতেন না, নিজেই করতেন সুরসৃষ্টি। হাতে নাতে আমি তার প্রমাণ পেয়েছি। শ্রীমন্মথনাথ রায়ের 'কারাগার' নাটকের জন্যে আমি দশটি গান রচনা করেছিলুম, একটি গানে সুর দি আমি নিজেই। বাকি নয়টি গানে সুর দেবার ভার নিলেন নজরুল। যখন তিনি সুর দিতেন, আমি ব'সে থাকতুম তাঁর পাশে। নানা শ্রেণীর গান ছিল—গম্ভীর, চটুল, প্রেমের, হাসির। চাল আর ছন্দও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কোন চলতি বাঁধা সুর কিছুতেই আমার বিভিন্ন গানের কথার সঙ্গে খাপ খেত না। কিন্তু নজরুল আমার গানের কথাগুলি প'ড়ে নিয়ে প্রত্যেক গানের ভাব, চাল ও ছন্দ অনুসারে এত সহজে ঠিক লাগসৈ সুর বসিয়ে যেতে লাগলেন যে, বিস্মিত না হয়ে পারলুম না। গানের সুর শুনে অভিভূত হ'ত দর্শকরা।

"পায়ে পায়ে বাজে লোহার শিকল,
তালে তালে তার আমরা গাই—
শিকলের গান—শিকলের গান,
শিকলের গান শোনাব ভাই!"

এই জাতীয় ভাবোদ্দীপক গানটিতে নজরুলের দেওয়া অপূর্ব সুর রঙ্গমঞ্চের উপরে যে উদ্দীপক ভাব সৃষ্টি করত, তা এখনো আমার মনে আছে। কিন্তু প্রথম কয়েক রাত্রির পরে আমার ঐ গানে ইংরেজ গভর্নমেণ্ট রাজদ্রোহের গন্ধ আবিষ্কার করেন এবং তা নিষিদ্ধ হয়।

কাব্যকার, গীতিকার ও সুরকার নজরুল সাধারণ মানুষ হিসাবে চঞ্চলতায় ও দুরন্তপনায় ছিলেন অদ্বিতীয়! আর কোন কবিকে তাঁর মত মন খুলে হো হো ক'রে অট্টহাস্য করতে শুনিনি। প্রায় প্রৌঢ় বয়সেও তিনি ছিলেন বিষম দামাল। আমার বাড়ীতে শেষ যেদিন তাঁর গানের সভা বসে, সে দিনের কথা স্মরণ হচ্ছে। অনেক রাত্রে গান বন্ধ হ'ল। তাঁর সঙ্গে সেদিন ছিলেন আমার আর এক গায়ক বন্ধু শ্রীজ্ঞান দত্ত (এখন তিনি দক্ষিণ ভারতে চলচ্চিত্র জগতের সুরকার)।

নজরুল বললেন, "হেমেনদা, রাত হয়েছে, আজ এইখানেই আমার আহার আর শয়ন। জ্ঞানও থাকবে।"

এ রকম প্রস্তাব নতুন নয়। তাঁদের দু'জনের জন্যে ত্রিতলের শয়নগৃহ ছেড়ে দিয়ে আমি নেমে এলুম দোতলায়।

গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল আচমকা। ত্রিতলে থেকে থেকে দুড়ুম দুড়ুম ক'রে শব্দ হচ্ছে আর সারা বাড়ী কেঁপে কেঁপে উঠছে।

তাড়াতাড়ি উপরে ছুটে গিয়ে শয়নগৃহের দরজায় ধাক্কা মারতে মারতে বললুম, "ওহে কাজী, কাজী! ব্যাপার কি? তোমরা দু'জনে কি মারামারি করছ?" নজরুল দরজা খুলে দিয়ে হো হো ক'রে হেসে উঠলেন।

না, মারামারি নয়। নজরুল ও জ্ঞান কেউ কারুকে খাটে শুয়ে ঘুমোতে দিতে রাজি নন। একজন খাটে উঠলেই আর একজন তাঁকে ধাক্কা মেরে ঘরের মেঝের উপরে ফেলে দেন। বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে চলছে এই কাণ্ড।

মার্গসঙ্গীতের অন্তর্গত হলেও টপ্পাকে বনেদী গান ব'লে মনে করা হয় না, কারণ বয়স তার বেশী নয়। কিন্তু বাংলাদেশের জনসাধারণের ধাতের সঙ্গে ধ্রুপদ ও খেয়ালের চেয়ে টপ্পা বেশী খাপ খায় ব'লে একসময়ে এখানে টপ্পার চলন হয়েছিল যথেষ্ট। বাংলায় টপ্পার গান বেঁধে কীর্তিমান হয়েছেন অনেকেই এবং তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু। তাঁর কোন কোন গান সুরকে ত্যাগ ক'রে কেবল কথার জন্যে সাহিত্যেও স্থায়ী আসন লাভ করেছে। নটনাট্যকার গিরিশচন্দ্র প্রমুখ লেখকরাও নিধুবাবুর প্রভাব এড়াতে পারেননি। আমাদের বাল্যকালেও নিধুবাবুর টপ্পা শুনতুম যেখানে সেখানে। কিন্তু আমাদের অতি আধুনিক কবিরা টপ্পার গান রচনা করেন না এবং অতি-আধুনিক গায়করাও বিশেষ ঝোঁক দেন না টপ্পার দিকে। আমি কিন্তু টপ্পা ভালোবাসি, তাই কিছু কিছু টপ্পার গান বেঁধেছি এবং সেগুলি গায়কপ্রবর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দের কণ্ঠে আশ্রয়লাভ করেছে। টপ্পা হচ্ছে ঠুংরীর অগ্রদূত, ওর দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

অনেক দিন পরে আমাদের আসরে এসে নিধুবাবুর টপ্পা শুনিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীকালী পাঠক। আধুনিক গায়কদের মধ্যে

তাঁকে টপ্পার অন্যতম প্রধান ভাণ্ডারী বলা চলে। বেশ মিষ্ট গলা তাঁর। গ্রামোফোন ও রেডিয়োর মাধ্যমে তাঁর গান সুপরিচিত হয়েছে। তাঁর জন্যেও আমি গান রচনা করেছি। সম্প্রতি এক আধুনিক যাত্রার আসরে তাঁর অন্য শ্রেণীর গানও শুনে এসেছি। গুণী লোক।

আমার বাড়ীর আসরে এসে আসীন হয়েছেন আরো অনেক সুগায়ক, সকলের পরিচয় দেবার জায়গা হবে না। শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আর দেখা হয় না, তাঁর নামও শুনি না। মাঝে মাঝে তিনি এসে রবীন্দ্রনাথের গান শুনিয়ে যেতেন, তাঁর সুকণ্ঠে রবীন্দ্রগীতি ভালো লাগত। শ্রীবিজয়লাল মুখোপাধ্যায় এবং কে. মল্লিক গ্রামোফোনের রেকর্ডে গান গেয়ে একসময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরাও আমার আমন্ত্রণ রক্ষা করেছেন। শ্রীজ্ঞান দত্ত ও শ্রীধীরেন দাস তো প্রায়ই দেখা দিতেন। উদীয়মান অবস্থায় অকালমৃত হরিপদ বসু, শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী ও শ্রীঅনুপম ঘটকও আমার বাড়ীতে পদার্পণ করেছেন। আরো অনেকে আসতেন, কিন্তু নামের ফর্দ আর বাড়িয়ে কাজ নেই।

আজ ভাঙা হাটে একলা ব'সে সে সব দিনের কথা স্বপ্ন ব'লে মনে হয়। এখনো মাঝে মাঝে কেউ কেউ দেখা দিয়ে যান বটে, কিন্তু ভাঙা আসর আর জমে না।

শেষ